

# মাছের কাঁটা পথের কাঁটা

---

নারায়ণ সান্যাল



মাছের কাঁটা।  
পাখির কাঁটা ॥

স্বাধীনতা



বাণীশিল্প কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ    মার্চ ১৯৬২

প্রকাশক

উৎপল হালদার

বাণীশিল্প

১১৩ই, কেশব সেন স্ট্রীট

কলিকাতা-৯

মুদ্রক

নিশিকান্ত হাটই

ভূবার প্রিটিং ওয়ার্কস্

২৬ বিধান সরণী,

কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ

প্রণবেশ মাইতি





“মৈত্রেয়ী তখন একমুহূর্তে বলে উঠলেন, ‘যেনাহং নামতা শ্রাম কিমহং তেন্-কুৰ্য্যাম্।’ যার দ্বারা আমি অমৃত হব না, তা নিয়ে আমি কী করব।... উপনিষদে সমস্ত পুরুষ ঋষিদের জ্ঞানগম্ভীর বাণীর মধ্যে একটিমাত্র জী-কণ্ঠের এই একটি মাত্র ব্যাকুল বাক্য ধ্বনিত হয়ে উঠেছে এবং সে ধ্বনি বিলীন হয়ে যায়নি—সেই ধ্বনি তাঁদের মেঘমল্ল শাস্ত্র স্বরের নাকথানে অপূর্ব একটি অশ্রুপূর্ণ মাধুৰ্য জাগ্রত করে রেখেছে। মাহুষের মধ্যে যে পুরুষ আছে উপনিষদে নানা দিকে নানা ভাবে আমরা তারই সাক্ষাৎ পেয়েছিলুম, এমন সময়ে হঠাৎ এক প্রান্তে দেখা গেল মাহুষের মধ্যে যে নারী রয়েছেন তিনিও সৌন্দর্য বিকীর্ণ করে .”

হঠাৎ রবীন্দ্র রচনাবলীটা বন্ধ করে বাসু-সাহেব তাঁর একক শ্রোতার দিকে তাকিয়ে দেখেন। দেখেন, রানী দেবী তাঁর হুইল-চেয়ারে ক্লান্ত হয়ে বসে আছেন। চোখ দুটি বোজা।

—ঘুম পাচ্ছে?—প্রশ্ন করলেন বাসু-সাহেব।

চমকে উঠে রানী দেবী বললেন, না, শুনিছি, পড় ভূমি—

—ভাল লাগছে না, নয়?

স্নান হাসলেন রানী দেবী। মাথাটা নেড়ে সত্যিকথা স্বীকার করলেন।

—তবে থাক! এস কিছু গান শোনা যাক। বল, কী বাজাব?

উঠে গেলেন উনি রেডিওগ্রামের দিকে।

—গান থাক। ভূমি এখানে এসে বস তো। কয়েকটা কথা বলার ছিল।

সন্দিগ্ধ চোখে বাসু-সাহেব তাকিয়ে দেখলেন একবার জীর দিকে। এসে বসলেন তাঁর পরিত্যক্ত চেয়ারে : বল?

—দেখ, আমাদের যা গেছে তা আর কোনদিন ফিরবে না। অম্মি না হয় পলু হয়ে পড়েছি, ভূমি তো হওনি! ভূমি কেন এভাবে জীবনটাকে বয়বাদ করছ?

বাস্থ-সাহেব নিরন্তর স্তম্ভভাৱে বসে থাকেন। পাইপটা পৰ্বন্ত জালেন না। একটা দম নিয়ে মিসেস বাস্থ বলেন, তুমি আবার প্র্যাকটিস্ শুরু কর।

হঠাৎ কৃত্রিম হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন পি. কে. বাস্থ। পাইপটা ধরাতে ধরাতে বলেন, এই কথা! আমি ভাবছি, না জানি কোন সিরিয়াস প্রসঙ্গ তুলবে তুমি।

মিসেস বাস্থ জবাব দিলেন না। বাস্থ মুখ তুলে তাঁর দিকে চাইলেন, বললেন, কি হল আবার?

—আমি সিরিয়াসলিই কথাটা আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। তোমার যদি আপত্তি থাকে, তবে থাক—হুইল-চেয়ারের চাকাটার পাক মারতে যান। বাস্থ হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলেন তাঁকে। বলেন, কী বলছ রাণু! তা কি হয়?

—কেন হবে না? মাইথনে সোদিন মিঠুর সঙ্গে যদি তার মা-ও মারা যেত তাহলে তুমি এমন করতে পারতে? এমন সংসার-ভ্যাগী সন্ন্যাসীর মত না, না, আমাকে বলতে দাও, প্লীজ! আমি সেন্টিমেন্টাল কথা বলব না, প্র্যাকটিকাল কথাই বলব।

বাস্থ পাইপটা কামড়ে ধরে বলেন, বেশ বল।

—আমি কী বলব? এবার তো তোমার বলার কথা। কেন প্র্যাকটিস্ ছেড়ে দেবে তুমি?

—কী হবে প্র্যাকটিস্ করে, রাণু? টাকা আমাদের যা আছে, হুজনের হুটো জীবন কেটে যাবে। নাম-ডাক? ও নিয়ে কোন মোহ আমার নেই। তা-ছাড়া এই অবস্থায় তোমাকে একলা বাড়িতে ফেলে রেখে আমি কোন্ কাছারি করতে পারি?

—না, টাকার জন্তে নয়। নাম-ডাকও নয়—কিন্তু তোমার শির-দাঁড়াটা যে ভাঙেনি এটা আমাকে বুঝে নিতে দাও!...তুমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছ, পল্লু হয়ে যাচ্ছ। তোমার কি বিশ্বাস চোখের উপর এটা প্রতিনিয়ত দেখেও আমি মনে শাস্তি পেতে পারি?

এবার আর রসিকতা করলেন না বাস্থ-সাহেব। বললেন, কথাটা যখন তুললে রাণু, তখন খোলাখুলিই বলি। কথাটা আমিও ভেবেছি। তুমি ঠিকই বলেছ। আমাদের সামনে দীর্ঘ জীবন পড়ে রয়েছে। ‘নেগেশান’ দিয়ে অত বড় ফির্কট ভরিয়ে দেওয়া যায় না। আমাদের বাঁচতে হবে। এভাবে নয়—বই পড়ে, গান শুনে, দাবা খেলে—যানে জীবনকে অস্বীকার করে নয়। কাজের মাধ্যমেই আমরা অতীতকে তুলতে পারব—‘আমরা’ যানে আমি আর তুমি!

কিন্তু সে জীবন-সঙ্গীতে ঐকতান চাই। রেজনেল হওয়া চাই। তুমি গাইবে আমি গুনবে, আমি বাজাব তুমি গুনবে—তা নয়! পারবে?

—তুমি আমাকে শিখিয়ে দাও! তুমি তো জান আমার কতটুকু শক্তি।

—জানি! কিন্তু তোমার মনের কতখানি জোর তাও আমি জানি! বেশ সেই পথেই চিন্তা করি। দু-চারদিন পরে তোমাকে জানাব। কিছু একটা পথ খুঁজে বার করতেই হবে।

—নিশ্চয়ই খুঁজে পাব আমরা।

ব্যারিস্টার পি. কে. বাসুকে যারা চেনেন না তাঁদের জন্য কিছু পূর্বকথন দরকার। এখন ওঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। এককালে দুর্ধর্ষ প্র্যাকটিস ছিল ওঁর। কলকাতার বারে সবচেয়ে নামকরা ক্রিমিনাল ল-ইয়ার। কোর্ট, বার এ্যাসোসিয়েশান, ক্লাব, টেনিস, এই নিয়ে ছিল তাঁর জীবন। সহধর্মিণী রানী বাসুও স্বনামধন্য। গানের আসরে সৌখীন গাইয়ে হিসাবে তাঁর ছোটো-ছুটিও অন্ত ছিল না। রেডিওতে রবীন্দ্র সঙ্গীত মাসে পাঁচ-সাতখানা তাঁকে গাইতেই হত। এ্যাপয়েন্টমেন্টে ঠাসা থাকত কর্তা-গির্নীর দিনপঞ্জিকা।

তারপর একদিন। একটি খণ্ডমুহুর্তে একেবারে বদলে গেল সব। মাইথনে বেড়াতে গিয়েছিলেন ওঁরা। কর্তা-গির্নি আর ওঁদের দশ বছরের একমাত্র মেয়ে স্বর্ণ বা মিঠু। পথ-দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মিঠু শেষ হয়ে গেল। বাসু-সাহেব বৈঠে ক্ষিবে এলেন প্রায় অকৃত, আর তিনমাস পরে যখন মিসেস বাসু হাসপাতাল থেকে বের হয়ে এলেন তখন জানা গেল, তাঁর মেরুদণ্ডের একটি বক্রী কোণক্রমে জোড়া তালি দিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি আর কোনদিন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারবেন না। সন্তানের জননী হতে পারবেন না।

প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়েছিলেন বাসু-সাহেব। জীকে সাহচর্য দেওয়াই হল এর পর থেকে তাঁর দৈনন্দিন কাজ। অদ্ভুত আমূদে লোক—প্রথম পরিচয়ে কেউ বুঝতেই পারত না—ওঁর জীবনের অন্তরালে লুকিয়ে আছে এতবড় একটা ট্রাজেডি। পঙ্ক-জীকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন এখানে-ওখানে। রানী দেবীকেও হঠাৎ দেখলে বোঝা যায় না তিনি উত্থানশক্তি-রহিত—কিন্তু তাঁর মুখখানা বিষাদ মাখানো। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও না কি ধান ভানে। এই ধূসর প্রতিভাশালী ক্রিমিনাল ল-ইয়ারটিও নাকি তেমনি বেড়াতে গিয়েও তাঁর পেশাগত কাজে জড়িয়ে পড়েছিলেন দু-একবার। আগরওয়ালা ইণ্ডাস্ট্রিজের মালিক মনুংকতন আগরওয়ালের মৃত্যু-রহস্যের কথা হয়তো কেউ কেউ শুনে থাকবেন। সেখানে ঐ খুনের মামলায় স্বজাতি চট্টোপাধ্যায় আর কৌশিক



মিত্র নামে দুজন জড়িয়ে পড়েছিল। বাসু-সাহেব তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে ঐ দুজনকেই সে মামলা থেকে উদ্ধার করে আনেন। এসব খবর একদিন খবরের কাগজে কলাও হয়ে বার হয়েছিল তা হয়তো আপনাদের নজরে পড়েছে। তারপরেও আরেকটি খুনের কিনারা তিনি করেছিলেন দার্জিলিঙের এক হোটেলে। হোটেলটার নাম ‘সু রিপোজ্’—সুখ খোলা হয়েছিল। বস্তুত ঐ হোটেল খোলার উদ্বোধনের দিনেই অগ্নীভিক্রম ঘটনাটি ঘটে। হোটেলের মালিক ঐ সূজাতাই—সূজাতা চট্টোপাধ্যায় নয়, সূজাতা মিত্র। ইতিমধ্যে কৌশিক মিত্রকে সে বিয়ে করেছে। সূজাতার বাবা নাকি কী একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন। সেসব এঞ্জিনিয়ারিং থটমট ব্যাপার! আমার ঠিক মনে নেই; মোটকথা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সেই আবিষ্কারের পেটেন্টটা বেচে সূজাতা লাখ-দুড়েক টাকা পায়। সেই টাকাতেই হোটেল-বিজনেস শুরু করেছিল ওরা—স্বামী-স্ত্রী। বাসু-সাহেব আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে হোটেলের উদ্বোধনের দিন ওখানে যান। হোটেলে থাকতেই ঐ খুনের কিনারা করেন। তদেচ্ছ, সেই ঘটনাটার উপর ভিত্তি করে একটি গল্পের বইও লেখা হয়েছে—তার নাম “সোনার কাঁটা।”

যাক্ ওসব অবাস্তব কথা। যে কথা বলছিলাম। স্বামী-স্ত্রীর ঐ কথোপকথনের পর থেকেই বাসু-সাহেব ভাবছিলেন কী করে নতুনভাবে বাঁচার ব্যবস্থা করা যায়। উত্থানশক্তিরহিতা স্ত্রীকে জড়িয়ে কেমন করে কর্তব্যসম্বল হয়ে পড়া যায়। ঠিক এমনই সময়ে একদিন তাঁদের বাড়িতে এসে দেখা করল কৌশিক আর সূজাতা। বাসু-সাহেবের নিউ আলিপুরের বাড়িতে। বাসু-সাহেব ওদের আপ্যায়ন করে বসালেন। সূজাতা আর কৌশিক দুজনেই তাঁর অত্যন্ত স্নেহভাজন। খুশিরাল হয়ে ওঠেন প্রোঢ় ভদ্রলোক। বলেন, খুব খুশি হয়েছি তোমরা দেখা করতে আসায়। কবে এসেছ দার্জিলিঙ থেকে? হোটেল কেমন চলছে?

সে কথার জবাব না দিয়ে সূজাতা বলে, রাণু-মামীমা কোথায়?

বাসু-সাহেব আসলে বিপুল ঘোষ, আই. এ. এস.-এর মামাস্বত্বর। সেই সূত্রে সকলে তাঁকে ‘মামু’ বলে ডাকত। বিপুল ঘোষ ছিলেন ডি. এম। যে জেলা-সদরে কৌশিক আর সূজাতার সঙ্গে তাঁর আলাপ সেখানকার অফিসার্স ক্লাবে বাসু-সাহেব হয়ে পড়েছিলেন সার্বজনীন মামু। সেই স্ববাদেই কৌশিক-সূজাতা তাঁকে ‘বাসুমামা’ বলে ডাকে।

বাসু-সাহেব বলেন, আছে ভিতরে। খবর পাঠাচ্ছি, কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব পাইনি। হোটেল রিপোজ্, কেমন চলছে? এবার গ্রীষ্মকালে ওখানে

গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসব ভাবছি। এবার কিন্তু পেস্ট হিসাবে নয়, রেগুলার বোর্ডার হিসাবে।

কৌশিক বললে, আমরা হুঁষিত বাহুমামু। আমাদের হোটেলে আপনার ঠাই হবে না। অন্ত কোনও হোটেল বুক করুন।

হো হো করে হেসে ওঠেন পি. কে. বাহু। বলেন, ওরে বাবা! এত রাগ! পরগা দিয়ে থাকব বলায়? একেবারে—‘ঠাই হবে না?’

কৌশিক বললে, আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। শুধু সেজ্ঞা নয়। হোটেলটা আমরা বিক্রি করে দিয়েছি।

—বিক্রি করে দিয়েছ! সে কি গো! কেন?

—চলছিল না। পুজোর সময় কিছুদিন, আর গরমের সময় কয়েক সপ্তাহ—বাস! বাকি সাত-আট মাস তাঁরোর কাকের মত হাপিতোস করে বসে থাক। সবচেয়ে হরিবু শীতকালের কটা মাস। দেড় বছর চালালাম—এস্টারিশমেন্ট খরচই ওঠে না। তাই সুযোগমত একটা অফার পাওয়া মাত্র লক্-স্টক-ব্যারেল বেচে দিলাম।

—বেশ করেছ! তুমি হলে পাশ করা এঞ্জিনীয়ার। হোটেল-বিজনেস কি তোমার পোষায়? তা নতুন কি বিজনেস ধরেছ?

—বরিনি কিছু। সব বেচে-বুচে বাড়া-হাত-পা হয়ে ক’লকাতায় চলে এসেছি।

—উঠেছ কোথায়?

—হোটেলে। একটা বাসা খুঁজছি। আর একটা বিজনেস। লাখ দেড়েক টাকা ক্যাপিটাল আছে। তাই সজ্জাতা বললে, চল বাহুমামার কাছে থেকে একটু লীগ্যাল এ্যাডভাইস নিয়ে আনি।

বাহু-দাহেব সজ্জাতাঃ দিকে ফিরে বলেন, তোমাদের বাহুমামু চেয়ার অফ কমার্স-এর কেউ নন সজ্জাতা। এখানে আমি কী পরামর্শ দেব? খুন-জখম বাহাজানি ব’দ কখনও করে ফেল তখন বাহুমামুর কাছে এস। পরামর্শ দেব।

সজ্জাতা মাথা নেড়ে বললে, উহঁ! খুন-জখম বাহাজানি যদি কখনও করে বসি তবে আর যার কাছেই যাই, আপনার কাছে আসব না। ভরা ডুবি হবে তাহলে!

—কেন, কেন? এভাবে আমার বদনাম করার মানে?

—বদনাম নয়, বাহুমামু—আপনিই বলেছিলেন একদিন যে, যখন গ্র্যাকটিস্ ব্রেন্ডেন তখন সত্যিকারের অপরাধীর কেস নাকি আপনি নিতেন না!

—কয়েকট।

কৌশিক অবাক হয়ে বলে, নিতেন না! কেন?

চুপচুপ ধরাতে ধরাতে বাসু-সাহেব বলেন, ওটাই ছিল আমার প্রকেশনাল এম্বিল। বার এজাহার শুনে বুঝতাম সে নিরাপরাধ, তার কেসই আমি নিতাম। বাকি মনে হত সত্যিকারের অপরাধী তাকে বলতাম—হয় ‘নিমুটি প্লীড’ করে সাজা নেও, নয় অন্ত কোনও উকিলের কাছে যাও।

কৌশিক বলে, সেবেছে! সব উকিল যদি তাই বলে তবে অপরাধীগুলো ডিফেন্ড পাবে কোথায়?

—পাবে না।

—কিন্তু পিনাল কোড তো বলছে যে, অপরাধীরও ডিফেন্ড পাবার অধিকার আছে। যে অপরাধীর আর্থিক সঙ্গতি নেই তাকে তো সরকারী খরচে ডিফেন্ড পাইয়ে দেওয়া হয়।

—তুমি ভুল করছ কৌশিক। পিনাল কোড একথা বলছে না যে, অপরাধীরও ডিফেন্ড পাওয়ার অধিকার আছে, বলছে অভিযুক্তের আছে, আশ্রয়ী আছে। ‘অভিযুক্ত আশ্রয়ী’ আর ‘অপরাধী’ শব্দ দুটোর অর্থ পৃথক। কিন্তু এসব আইনের কচকচি বন্ধ কর। দাঁড়াও, তোমাদের রাষ্ট্র মামীমাকে আগে খবরটা দিই।

বাসু-সাহেব চেবিলের তলায় একটা ইলেকট্রিক বেল টিপলেন। এগে হাজির হল একটা বছর দশ-বাথোর চটপটে ছোকরা।

—এই বিশেষ! এঁদের চিনিস?

বিশু কৌশিক আর সজ্জাতাকে এক নজর দেখে নিয়ে বলেন, হাঁ। সিনেমা করেন।

সজ্জাতা হেসে ওঠে। বাসু-সাহেব বলেন, দূর গরু! না, এঁরা সিনেমা করেন না। ভুই ভিতরে গিয়ে তোর মা-কে বলে আয়, দার্জিলিঙ থেকে সজ্জাতা আর কৌশিক এসেছে।

সায় গিয়ে বিশু ভিতর দিকে চলে যাচ্ছিল। বাসু-সাহেব তাকে ক্রিয়ার ভাকেন—এই বিশেষ, দাঁড়া! কী বলবি?

—বলব কি, যে দার্জিলিঙ থেকে সজ্জাতা আর কৌশিক এসেছে।

—তাই বলবি! বেটাচ্ছেলে! কী শেখাচ্ছি এতদিন ধরে?

—তাই তো বললেন আপনি!

—আমি বললাম বলে ভুইও বলবি? না! ভুই গিয়ে বলবি দার্জিলিঙ থেকে সজ্জাতা দেবী আর কৌশিকবাবু এসেছেন। বুঝেছিস?

—আজ্ঞে আচ্ছা।—এক ছুটে চলে যাব ভিতরে।

কৌশিক প্রশ্ন করে, নিউ-রিক্রুট ?

—সব আমদানি। তবে ইন্টেলিজেন্ট খুব—

স্বজাতা বলে, তাহলে আপনি ও বিষয়ে কোনও পরামর্শ দেবেন না ? ঐ আমাদের নতুন ব্যবসা কী জাতীয় হবে সেই প্রশ্নে ?

—কে বলেছে দেব না ? ক্রিমিনাল ল-ইয়ার হিসাবে আমার বলার কিছু নেই, কিন্তু তোমাদের মামু-হিসাবে পরামর্শ দিতে দোষ কি ? বল, কিসের বিজ্ঞেন্স করতে চাও তোমরা ? কৌশিক তো শিবপুরের বি. ই। ঠিকাদারী পোষাবে ?

কৌশিক মাথা নেড়ে বললে, না ! আমরা যৌথভাবে আপনার দ্বারস্থ হয়েছি। এমন একটা পথের নির্দেশ দিন যাতে আমরা দৃষ্টনেই ব্যবসায়ের খাটতে পারি। ঠিকাদারী ব্যবসায়ের প্রায় হাওণ্ড পার্সেন্ট কাজই টেকনিকাল—তাছাড়া ও ঠিকাদারী আমার পোষাবেও না।

বাসু-সাহেব বিচিত্র হেসে বললেন, তবে কী পোষাবে ? গোয়েন্দাগিরি ?

একটু বক্রোক্তি ছিল কথাটার ভিতর। কৌশিক, সাময়িক ভাবে, ঘটনাচক্রেই বলতে পারি, স্বজাতার বাড়ি গোয়েন্দাগিরি করতে, গিয়েছিল। এই সূত্রেই স্বজাতার সঙ্গে তার পরিচয়, প্রণয় ও পরে পরিণয়। কৌশিক কিন্তু রসিকতার ধার দিয়েও গেল না। বললে, কথাটা আপনি মন্দ বলেননি। বক্সীমশায়ের তিরোধানের পর কলকাতা শহরে নামকরা প্রাইভেট গোয়েন্দা আর কেউ নেই। কিন্তু আছে, কম্পিটিটার কেউ নেই।

স্বজাতা লুকুক্ষিত করে বলে, বক্সী মশাই মানে ?

—বোমকেশ বক্সী ! নাম শোননি ?

—ও ! বোমকেশ বক্সী ! তুমি কি তাঁর শূন্য আসনে বলতে চাও নাকি ? কৌশিক উদ্বেগে যুক্তকর কপালে ছোঁয়ালো। বললে, আমি তো পাগল নই। বোমকেশ বক্সী ছিলেন দুর্লভ প্রতিভা। তাঁর মত গোয়েন্দা আর হবে না ; কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর কেউ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না, এটাই বা কি কথা ?

—কিন্তু আমার লেখানে ভূমিকা কি ?—জানতে চায় স্বজাতা।

—যুগ পাল্টে গেছে স্বজাতা। বোমকেশবাবু বে-যুগের মানুষ তখনও ‘উইমেন্স লিব,’ কথাটার জয় হয়নি। এখন যদি আমি ঐ জাতের একটা প্রাইভেট ডিটেক্টিভ এজেন্সি খুলে বলি তাহলে তুমি আমি সমান পার্টনার হিসাবে কাজ করতে পারি। বাসুমামু কি বলেন ?

—তোমাদের ব্যাপার তোমরা বলবে, আমি কি বলব ?

স্বজ্ঞাতা ছদ্ম-অভিমান করে বললে, বা রে ! গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিচ্ছেন ?

—মোটাই নয় ! তোমরা যদি চাও—তলা থেকে ঐ মইটা আমিই ধরে থাকতে রাজী আছি !

স্বজ্ঞাতা আর কৌশিক পরস্পরের দিকে তাকায় । বলে, কি রকম ?

বাহু-সাহেব গম্ভীর হয়ে বলেন, জ্যাক্স এ্যাপার্ট, কয়েকটা কথা তোমাদের বলে নিতে চাই বাণু এসে পড়ার আগে । বাণু কিছুদিন থেকে আমাকে খোঁচাচ্ছে আমি যেন আবার প্র্যাক্টিস শুরু করি । আমি রাজী হইনি—ওর কথা ভেবেই । তোমরা যদি সিরিয়াসলি এই প্রস্তাবটা গ্রহণযোগ্য বিবেচনা কর তাহলে আমার প্রস্তাবটা হচ্ছে এই রকম : আমার বাড়িটা দোতলা । ইংরাজি 'U' অক্ষরের মত । এক তলায় দুটো উইং । পূবদিকের উইং-এ হবে আমার ল'অফিস আর লাইব্রারী । মাঝখানের অংশটা আমাদের রেসিডেন্স । পশ্চিমদিকের উইংটা হবে তোমাদের প্রাইভেট ডিটেক্টিভ এজেন্সির অফিস । একতলা কম্প্লিট । এবার এস দোতলায় । উপর তলায় তিনখানি ঘর । তোমাদের ফ্ল্যাট । গোটা বাড়িটা হচ্ছে আমাদের দুজনের রেসিডেন্স-কাম-অফিস । তোমাদের কাছে যারা কেস নিয়ে আসবে তাদের লীগ্যাল এ্যাডভাইস নিতেই হবে । তাদের তোমরা পাঠিয়ে দেবে ইস্টার্ন-উইং-এ, আমার অফিসে । আবার আমার কাছে যারা কৌজলারী মামলায় পরামর্শ করতে আসবে তাদের হামেশাই দরকার হবে একজন প্রাইভেট গোয়েন্দার সাহায্য—আমার টেকনিকের জ্ঞান । ঐ জুনিয়র ব্রীক্ সাজিয়ে দেবে আর কোর্টে দাঁড়িয়ে কথার মারপ্যাচে আর লীগ্যাল রেকর্ডেন্স দিয়ে কর্তব্য শেষ করার পাত্র আমি নই । কলে আমরা হতে পারব পরস্পরের পরিপূরক ।

কৌশিক বলে ওঠে, গ্র্যাণ্ড আইডিয়া ।

—স্বজ্ঞাতা বলে, কিন্তু একটা সর্ত আছে ! আপনি এখনই বলছিলেন, এবার গ্রীষ্মকালে আপনি হোটেল রিপোজে যাবার কথা চিন্তা করছিলেন—আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে নয়, রেগুলার বোর্ডার হিসাবে । আমার যদি এ বাড়ির দোতলায় থাকি তবে ভাড়া দিয়ে থাকব ।

বাহু-সাহেব বলেন, রাজী আছি ! তবে সর্ত একটা কেন হবে ? অনেকগুলি সর্ত হবে ।

—যেমন ?

—ধর—আমি তোমাদের কেস দিলে তোমরা কমিশন চার্জ দেবে । তোমরা আমাকে কেস পাঠালে আমি কমিশন দেব । এসব তো গেল

বিজ্ঞানের ডিটেলস। দ্বিতীয় স্তৰ হচ্ছে—ইসেল হবে একটা। স্বজাতা তার ইনচার্জ। তৃতীয়ত দুটি অফিসের জন্য একটি মাত্র রিসেপ্শান কাউন্টার—এই সেন্ট্রাল রুম-এ দুটি প্রতিষ্ঠানের কন্সাইণ্ড রিসেপ্শানিস্ট একজনই হবেন—তিনি তোমাদের রাণু-মামীমা!—ঐ যে নাম করতে করতেই এসে গেছেন উনি।

স্বজাতা উঠে আসে তাঁকে প্রণাম করতে। রানী বলেন, থাক, থাক।

কৌশিক বলে, থাক নয়, মামীমা—আজকে প্রণাম করতে দিতেই হবে। আপনার পায়ের ধূলোর বিশেষ প্রয়োজন আমাদের নতুন বিজ্ঞান-এর উদ্বোধন দিনে।

—আবার উদ্বোধন! কিসের বিজ্ঞানস্ তোমাদের?

—শুধু আমাদের নয়, আপনাদেরও। আপনি আর মায়ুও আমাদের পার্টনার।

রানী দেবী আকাশ থেকে পড়েন। বাসু তখন মিটিমিটি হাসছেন।

স্বজাতাই পরিকল্পনাটা মাডঘরে পেশ করে। রানী উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। বলেন, এ খুব ভাল হবে। এই নির্বাক্ত পুরীতে তাহলে কথা বলার লোক পাব এবার থেকে! এস স্বজাতা, তোমাকে ইসেলের চার্জ বুঝিয়ে দিই!

স্বজাতা বলে, সে কি মামীমা, শুভস্র নীভ্রম্ মানে এই মুহূর্ত থেকেই নয়! আমরা আজকালের মধ্যেই চলে আসব। একটা কাজ কিন্তু এখনও বাকি আছে। আমাদের প্রাইভেট ডিটেক্টিভ ফার্মটার একটা নামকরণ করতে হবে। মামীমা আপনিই নাম দিন।

রানী দেবী আঁতকে ওঠার ভঙ্গি করেন। বলেন, ওরে বাবা! ও আমার কর্ম নয়। তোমরা বরং তোমাদের মামাকে ধর।

—বেশ আপনিই নাম দিন—স্বজাতা ঘুরে বসে বাসু-সাহেবের মুখোমুখী।

বাসু পাইপটা ধরাচ্ছিলেন। বলেন—উ? নাম দিতে হবে? বেশ দিচ্ছি। তোমাদের প্রাইভেট ডিটেক্টিভ এজেন্সির নাম হবে—‘স্কোশলী’!

স্বজাতা এবং কৌশিক দুজনেই লাকিয়ে ওঠে—গ্র্যাণ্ড নাম!

—উহু-হু! তোমরা নামের ব্যাপ্তিগত অর্থটা না বুকেই লাকাচ্ছ মনে হচ্ছে!

—ব্যাপ্তিগত অর্থ! মানে?

—লেডিঙ্ক-ফার্স্ট আইনে প্রথমেই স্বজাতার ‘স্ব’, তার পিছনে পিছনে ষথারীতি অল্পগামী কৌশিকের-‘কৌ’! বাকি ‘শলী’টা হচ্ছে ‘খলু পাদপূরণে’! সমস্ত কথাটার একটা ব্যঙ্গনা দিতে!

দুই

মাসখানেক পরের কথা।

এই একমাসে নিউ আলিপুরের ও-রকের বাড়িটার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এতদিন অধিকাংশ ঘরই তালাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। মিলেস্ বাস্কর প্রতিবিধি শুধুমাত্র একতলাতেই সীমিত। দোতলাটা ভাড়া দেবার কথা হয়েছে মাঝে মাঝে—কিন্তু অজানা উটকো লোক এসে বামেলা না বাধার মাঝার উপর বসে—এ জগুই এতদিন দোতলাটা ভাড়া দেওয়া হয়নি। অর্ধেক প্রয়োজন, তো আর ওঁদের নেই। প্রথম জীবনে মাসে দশ-বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত রোজগার করেছেন বাস্ক-সাহেব।

বাড়ির পূর্বদিকের অংশে দুখানি ঘর। পিছনের ঘরটা হচ্ছে লাইব্রারী, সামনেটা দুটি অংশে বিভক্ত। সামনের দিকটা ল-অফিস—ভিতরে বাস্ক-সাহেবের চেয়ার। একজন সত্ৰ-পাশ উকিল প্রছোত নাথ, জুনিয়ার হিসাবে কাজ শিখতে এসেছে। এছাড়া দ্বিতীয় কর্মী নেই। বাস্ক-সাহেব বলেন, অনেকদিন পর শুরু করছি তো—প্রথমেই কতকগুলো লোককে চাকরি দেব না। প্র্যাক্টিস্ যেমন যেমন জমবে, অফিসে লোকও বাড়াব।

পশ্চিমদিকের অংশটাতেও দুখানি ঘর। ‘স্কোশলী’ও কোনও বাড়তি লোক নেয়নি। স্জাতা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া একটা পোর্টের টাইপ-রাইটায়ে ধীরে ধীরে টাইপ করে। কৌশিক প্রথম মাসে একটাও বিজনেস্ পায়নি। কিভাবে বিজ্ঞাপন দেবে তাই শুধু ভাবছে। বাস্ক-সাহেব একটা কেস্ পাঠিয়েছিলেন—ডাইভোর্স্ কেস্। মেয়েটির অভিযোগ তার স্বামী অলংচরিত্র। তাই কৌশিককে কদিন তার পিছনে ছোট্টাছুটি করতে হচ্ছে। খারাপ পাড়ার।

ভারপূর একদিন। শুক্রবার বারই এপ্রিল। বাস্ক-সাহেব নিজের ঘরে বসে একটা আইনের বই পড়ছিলেন। হঠাৎ ইন্টারকমটা বেজে উঠল। স্নইচটা টিপে বাস্ক-সাহেব বলেন, কী ব্যাপার, ব্রেকফাস্ট রেডি?

—না। তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে চাইছেন। মিষ্টার জীবন-কুমার বিশ্বাস। প্রয়োজন বলছেন, আইনবাচীত পরামর্শ। পাঠিয়ে দেব?

কইটা স্লিরিয়ে রেখে বাস্ক-সাহেব বলেন, দাও।

সকাল সাড়ে আটটা। আকস আজ ছুট, শুভ ক্লাহডে। প্রভোত আসবে না আজ। কাছারী বন্ধ। একটু পরে বিত্ত পথ, দেখিয়ে একজন ভ্রমলোককে নিয়ে এল। ভ্রমলোক খোলা-দরজার সামনে একটু দাঁড়িয়ে পড়লেন—দেখলেন, ব্যারিস্টার বাসু সামনের দিকে তাকিয়ে স্বস্তি হয়ে বসে আছেন। ভ্রমলোক কাশলেন। বাসু-সাহেব এবার ওঁর দিকে ফিরে বললেন, আসুন। বসুন ঐ সোফাটায়।

আগন্তুক ভ্রমলোক জানতেন না বাসু-সাহেবের টেকনিক। মানব-চরিত্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল পি. কে. বাসু জানেন উকিলের সাক্ষাৎমাত্র লোকে একটা আবরণ টেনে দেয় তার মনের উপর। ঠিক যে মুহূর্তে সে উকিলের দিকে চোখে-চোখ তুলে তাকায় তখনই সেই পর্দাটা সে টেনে দেয়—ঠিক তার আগের মুহূর্তটাতেই সে সব চেয়ে দুর্বল—যখন সে ছদ্মবেশ ধারণ করতে চাইছে। তাই বাসু-সাহেবের চেয়ারে ওঁর সামনেই টাঙানো আছে, একটা আয়না, আর প্রবেশ পথের উপর ফেলা আছে একটা জোঁরালো আলো। আগন্তুক ধ্যানস্থ ব্যারিস্টার সাহেবকে দেখে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না—তিনি সামনের দিকে তাকিয়ে আয়নার ভিতর দিগ্নে ওকেই লক্ষ্য করছিলেন। ঘরে ঢুকে পরে হয়তো সে এটা লক্ষ্য করে—কিন্তু ততক্ষণে প্রথম প্রবেশ-মুহূর্তটি অতিক্রান্ত।

—বলুন, কী ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি ?

আগন্তুক ধূতি-পাঞ্জাবি পরা—বেশবাসে আভিজাত্য নেই কিছু। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। চোখে চশমা, বোলা গৌফ, হাতে একটি ফোলিও ব্যাগ।

ব্যাগটা পাশে রেখে জীবনবাবু বসলেন সোফাটায়। হাত দুটো জোড় করে নমস্কার করলেন। বললেন, তার আগে শ্রাব, একটা কথা জানতে চাই। আপনাকে কত ফি দিতে হবে। আমি 'মধ্যবিত্ত ছাঁ-গোবা' মাহুষ, বিপদে পড়ে এসেছি। আপনার নাম আমি অনেক শুনেছি; কিন্তু আপনাকে উপযুক্ত মর্যাদা দেবার আর্থিক ক্ষমতা আমার নেই।

—কি করেন আপনি ?

—আমি শ্রাব বোয়াই-এর কাপাডিয়া এ্যাণ্ড কাপাডিয়া কোম্পানির ক্যাশিয়ার। কুলে চারশ পঁচাত্তর টাকা মাইনে পাই, আর ফ্রি কোয়ার্টার্স। ব্যবসায়ের কাজেই কলকাতা এসেছি—মানে মালিকের নির্দেশে। আমি আজ দশ বছর কলকাতা ছাড়া—পথ-ঘাটও ভাল চিনি না। এখানে এসেই বিপদে পড়ে গেছি। আত্মীয় বন্ধ কেউ নেই যে পরামর্শ করি। আপনার নাম জানা ছিল। টেলিকোন পাইড থুঁজে ঠিকানা দেখে চলে এসেছি।



—তাহলে আগে একটা টেলিফোন কবলেই পারতেন ?

—টেলিফোনে ও সব কথা বলতে চাই না স্ত্রার।

—কী আশ্চর্য! টেলিফোনে তো শুধু এ্যাপয়েন্টমেন্ট করতেন। যাক সে কথা, আপনার বিপদটা কী জাতীয় ?

—স্ত্রার, আপনার ফি-এর কথাটা—

—ফি-এর অর্কটা নির্ভর করবে আপনার কেস-এর উপর। তবে কেসটা শোনার জ্ঞা আমি কিছু চার্জ করব না। আপনি বিস্তারিত বলে যান। ফি-এর কথা অরু ভাববেন না, প্রয়োজন হলে আপনাকে পরামর্শও দেব, ফি চার্জ করব না।—বলুন—

—আপনি আমাকে বাচালেন স্ত্রার। তাহলে খুলেই বলি সব কথা।

জীবন বিশ্বাস মাড়োয়ারী মণ্ডদাগরী অফিসের কোশায়ার। কাপাডিয়া এ্যাণ্ড কাপাডিয়া একটি কোটিপতি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। মালিকের নির্দেশে জীবনবাবু কলকাতায় এসেছেন দিন-দাতেক আগে। একা নয়, সঙ্গে আছেন মানোজার সুপ্রিয় দাশগুপ্ত। মানোজারের নতুন চাকরি, এম. এ. পাশ। চাকরি নতুন হলেও বড় কর্তার প্রিয় পাত্র। ওঁরা এসে উঠেছেন পার্ক হোটেলে—

বাসু-সাহেব একে থামিয়ে দিয়ে বলেন, ঐ সুপ্রিয় কত টাকা মাইনে পায় ?

—কাটাকুটি করে পে-প্যাকেট পায় এগারো শো টাকার, লোন নেওয়া আছে বলে বেশ কিছু কাটা যায়।

—বুঝলাম। পার্ক হোটেলে দৈনিক কত খরচ পড়ছে আপনাদের ?

জীবনবাবু ক্রমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে বললেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন স্ত্রার। খুলেই বলি। আমরা ঠিক কোম্পানির কাজে আসিনি—এসেছি আমাদের বড় কর্তা মোহনস্বরূপ কাপাডিয়ার ব্যক্তিগত কাজে—যাবতীয় খরচ তাঁরই। বড় কর্তার সাদার্ন এ্যাবিলিটিতে একটা বাড়ি আছে। সেটা বিক্রির ব্যাপারে। বিক্রি হল সাড়ে ছয় লাখ টাকায়। প্রজেক্ট ডীডে কিছু লেখা হল সাড়ে চার। দুই লাখ হচ্ছে কালো টাকা। এটা আমরা নগদ নিয়েছি। টাকাটা ব্যাংকে রাখা চলবে না, ব্যাংক ড্রাফট করানো চলবে না। বড় কর্তার নির্দেশ আছে ওটা নগদে বড়বাজারে একজনকে কাছে জমা দিয়ে হস্তি করিয়ে নিয়ে যেতে হবে। নগদ দু' লাখ টাকা হয়তো দু-একদিন হোটেলে লুকিয়ে রাখতে হতে পারে। তাই বড় কর্তা আমাদের দুজনকে কোন খানদানী বড় হোটেলেই উঠতে বলেছিলেন। দিন চার পাঁচের তো ব্যাপার—

—বুঝলাম। তারপর? লেনদেন হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ স্ত্রী; কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি, সুপ্রিয়বাবু, মতি গতি সন্দেহজনক লাগছে আমার কাছে। উনি টাকাটা নগদেই বোঝাই নিয়ে যেতে চাইছেন। কারণ বলছেন, যার কাছ থেকে ছুটি করানোর কথা তিনি এখন কলকাতায় নেই—

—এ কথাটা সত্যি? আপনি খোঁজ নিয়ে দেখেছেন?

—হ্যাঁ স্ত্রী। সত্যি।

—তাহলে আপনার বড় কর্তার সঙ্গে ট্রাংক লাইনে কথাবার্তা বলে নির্দেশ নিন না।

—ঐখানেই তো হয়েছে মুশকিল স্ত্রী। বড় কর্তা বোঝাইয়ে নেই—এমন কি ভারতবর্ষেই নেই। উনি এখন আছেন ব্যাঙ্কে। আর সবচেয়ে ঝামে হয়েছে এই যে, বড় কর্তা এই সম্পত্তিটা বেচে দিচ্ছেন গোপনে—মানে পরিবারের লোকেরাও জানে না। ঠিক জী পর্থস্ত না।

—জী পর্থস্ত না? আপনি সেটা কেমন করে জানলেন?

হাললেন জীবনবাবু। বললেন, ও আপনি শুনতে চাইবেন না স্ত্রী—  
মেয়েছেলে ঘটিত ব্যাপার। টাকাটা উনি ঠিক রক্ষিতাকে দিচ্ছেন। মানে ওড়াচ্ছেন!

—বেশ তো, তাঁর টাকা তিনি ওড়াচ্ছেন—তাতে আপনার আমার কি?

—না, তা তো বটেই। আমার আশঙ্কা হচ্ছে ঐ দু'লাখ টাকা নগদে নিয়ে যাবার সময় যদি ভালমন্দ কিছু হয়ে যায়, তবে আমি ফैसे যাব না তো?

বাস্তব-সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, দায়িত্বটা আপনার বড়কর্তা কার উপর দিয়েছেন?

—ম্যানেজারের উপর স্ত্রী। আমি তো কেশিয়ার মাত্র। পাওয়ার অফ এ্যাটর্নি দেওয়া আছে ম্যানেজারকে। দলিলে, বসিদি সইও করেছেন তিনি—  
আমি শুধু সঙ্গে আছি। উনিই আমার উপরওয়াল—

—তবে আর কি? আপনার ভয়টা কি?

জীবনবাবু ইতস্তত করে বললেন, এর মধ্যে স্ত্রী আরও একটা ব্যাপার হয়েছে। ম্যানেজার-সাহেব আমাকে ট্রেনের টিকিট কাটতে পাঠিয়েছিলেন। বোম্বে মেলে একটা ফার্স্ট ক্লাস ক্যুপেতে দুখানা টিকিট আমি কেটে এনেছি—  
কিন্তু টিকিট কাটা হয়েছে মিস্টার এ্যাণ্ড মিসেস দাসগুপ্তের নামে।

—তাতে কি? মিসেস দাসগুপ্তাও ঐ ট্রেনে যাচ্ছেন বুঝি? আর আপনার টিকিট হয়েছে কি পাশের কামরায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, মিসেল দাসগুপ্তা বর্তমানে বোম্বাইতে আছেন।

—তার মানে ? আপনি আপনার ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করেননি এমন করার অর্থটা কি ?

—করেছিলাম। উনি বললেন, মিস্টার এ্যাণ্ড মিসেস্ না বললে ক্যুপে পাওয়া যাবে না। তাই উনি তিনখানা টিকিট কাটতে বলেছেন। ট্রেন ছাড়ার সময় আমি বসবো পাশের কামরায়। ক্যুপের একটা সীট ফাঁকা থাকবে। তারপর আমি চলে আসব ক্যুপেতে।

বাস্-সাহেব জবাব দিলেন না। কি যেন ভাবছেন তিনি। জীবনবাবু বলেন, ইতিমধ্যে আরও এক ব্যাপার হয়েছে স্ত্রীর। আমাদের হোটেলে শর ঘরেই একজন মহিলা এসে উঠেছেন। তিনি ম্যানেজারের সঙ্গে মাঝে মধ্যে গুজগুজ ফুসফুস করছেন। তিনি কে তা আমি জানি না। প্রথমে এ্যাণ্ড ক'হলাম তিনি বুঝি বাঙালী। কিন্তু ম্যানেজার-সাহেব বললেন, ওঁর নাম জীবনু ডিকুজা এবং জানালেন তিনিও নাকি ঐ একই ট্রেনে বোম্বাই যাচ্ছেন।

—ইন্টারেস্টিং কেস ! ঐ একই ক্যুপেতে ?

হঠাৎ লজ্জা পেলেন জীবনবাবু। মুখটা নিচু করে বললেন, সেটা আমি জিজ্ঞাসা করিনি স্ত্রীর। হাজার হোক উনি আমার উপরওয়াল। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে কেমন যেন রহস্যময় মনে হচ্ছে। এক নম্বর—কেন উনি এভাবে অতগুলো নগ্ন টাকা ট্রেনে করে নিয়ে যাচ্ছেন, দু নম্বর—কেন আমাকে পাশের ঘরে পাচার করলেন, তিন নম্বর—ঐ অচেনা মেয়েটা যদি সত্যিই ওঁর সঙ্গে এক ক্যুপেতে—সঙ্কোচে মাঝখানেই থেমে গেলেন জীবনবাবু।

—বুঝলাম। তা আপনি কি করতে চান ?

—সেই পরামর্শই তো করতে এসেছি আপনার সঙ্গে।

—কবে আপনাদের রওনা হবার কথা ?

—আজ রাত্রে সাড়ে সাতটার বন্ধে মেল-এ।

—টাকাটা বর্তমানে কোথায় আছে ? হোটেলে আপনাদের ঘরে ?

—হোটেলেরই ; তবে আমাদের ঘরে নয়। হোটেলে সেক-ডিপজিট জন্টে।

—টাকাটা কি একশ' টাকার নোটে ?

—আজ্ঞে না। দশ টাকার নোটে। দু' স্ফটিক বোঝাই।

—ঠিক আছে। আপনি এক কাজ করুন—আমাকে যা যা বললেন তা একটা বিবৃতির আকারে লিখে ফেলুন। সেটা আমাকে দিয়ে যান।

যাতে প্রমাণ হবে কোনও দুর্ঘটনা ঘটার পর আপনি বানিয়ে কিছু বলছেন না।

জীবনবাবু গৌল হয়ে বসে কী ভাবতে থাকেন।

—কী ভাবছেন বলুন তো?

—ভাবছিলাম কি স্ত্রীর, আপনি যা বলেছেন তা খুবই ভাল—কিন্তু একটা মুশকিল আছে। ধরুন যদি ভালমন্ড কিছু হয়েই যায় তখন আপনি হবেন আমার পক্ষের উকিল। সে ক্ষেত্রে তো আপনি নিজেই সাক্ষী দিতে পারবেন না। তার চেয়ে এক কাজ করি না কেন? আমি এখন হোটেলের ফিরে যাই। সব কথা একটা বিবৃতির আকারে লিখে ফেলি। তারপর পোস্ট-অফিস থেকে রেজিষ্ট্রি ডাকে আপনাকে পাঠাই। সীল মোহর করে। আমি ভাল করে দেখে দেব যাতে পোস্ট-অফিসে তারিখের ছাপটা খামের উপর পড়ে। সে ক্ষেত্রে আপনি সীলটা ভাঙবেন না। চিঠিটাও পড়বেন না। ভালমন্ড কিছু ঘটলে সীল-মোহর করা খামটাই আপনি প্রমাণ হিসাবে দাখিল করবেন।

বাসু-সাহেব বুঝতে পারেন এই কেশিয়ার একটি গুরুত্ব ব্যক্তি। বললেন, কিন্তু পোস্ট-অফিস তো আজ বন্ধ। গুড-ফ্রাইডের ছুটি।

—জি. পি. ও. তে রেজিস্ট্রেশন খোলা। সে আপনাকে ভাবতে হবে না।

—ঠিক আছে। তাই করুন।

—আপনি আমাকে বাঁচালেন স্ত্রীর।

বাসু-সাহেব তাঁর ডায়েরিতে ঔদের নাম, ধাম, পার্ক হোটেলের রুম নম্বর, রেলওয়ে টিকিট তিনটির নম্বর এবং বোম্বাইয়ের ঠিকানা লিখে নিলেন। জীবনবাবু প্রসন্ন করেন, আপনাকে কি দেব স্ত্রীর?

—কিছু দিতে হবে না আপনাকে। এবার আসুন আপনি।

জীবনবাবু যেন এই জবাবই আশা করছিলেন। নমস্কার করে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেলেন তিনি। জীবনবাবু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া মাত্র বাসু-সাহেব ইন্টারকমে সকলকে ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে। পূর্বাংশ, পশ্চিমাংশ এবং মধ্যমাংশের রিসেল্পশান কাউন্টারের মধ্যে ইন্টারকম ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। পাঁচ মিনিটের ভিতরেই বাসু-সাহেবের ঘরে এলে বললেন মিসেস বাসু, কৌশিক, আর স্নজাতা। বাসু-সাহেব বললেন, তোমাদের পরামর্শ চাইছি, বল আমার কি করা উচিত। ওয়ান ইজটু টোয়েন্টি বেশিওতে একটা বাজি ধরার সুযোগ এলোছে আমার সামনে। পাঁচশ' টাকা ঢালতে হবে—পেলে পাব দশহাজার, না পেলে পাঁচশ' টাকাই বরবাদ হবে! এখন তোমরা বল, আমার কি করা উচিত।

কৌশিক বললে, ওয়ান হুজ-টু টোয়েন্ট ! নিন্টন বাজ ধরবেন !

সুজাতা বলে, আগে বলুন জেতার চান্স কত পার্সেন্ট ?

রানী বললেন, করছ ওকালতি, এর মধ্যে বাজি ধরাধারির কি আছে ?

বাসু-সাহেব নিরুপায় ভাবে শ্রাগ করলেন শুধু ।

ওদের পীড়াপীড়িতে খুলে বলতে হল সব কথা । শেষে বললেন, আমার অভিজ্ঞতা বলছে—ব্যাপারটা ঘোরাগোলা । ঈশান কোণে যে ছোট্ট কালো স্পটটা দেখা যাচ্ছে ওটা কালবৈশাখী হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট । খুন, তহবিল তছরূপ, রাহাজানি, ডাকাতি যা হোক একটা কিছু হবে । কেসটা তাহলে অনিবার্যভাবে আসবে আমার কাছে । দু-লাখ টাকা ইনভেস্টমেন্ট হলে পাঁচ পার্সেন্ট হিসাবে আমার কমিশন হবে দশ হাজার টাকা । কিন্তু এখনই আমাকে সেই আশায় শ'পাঁচেক টাকা ইনভেস্ট করতে হয় । আমার প্রাণ : করব ?

কৌশিক আবার বললে, আলবৎ !

সুজাতা বলে, এটা গাছে-কাঁঠাল-গোঁফে-তেল হচ্ছে না কি ?

বাসু-সাহেব বললেন, আর বাণু ? তোমার মত ?

রানী বললেন, আমার মতে সুজাতা একটু বেশী আশাবাদী । গাছে কাঁঠাল নজরে পড়ছে না আমার ! বরং বলতে পার 'ট্যাকে-বিচি, গোঁফে তেল !'

—সেটা আবার কি ?

—ভূমি কাঁঠালের বিচি পকেটে নিয়ে ঘুরছ । পুঁতলেই গাছ হবে, গাছ হলেই কাঁঠাল, পাকলেই পেড়ে খেতে হবে—তাই গোঁফে তেল দিতে শুরু করছ !

হৌ-হৌ করে হেসে ওঠে সবাই । মায় বাসু-সাহেব পর্বস্ত ।

শেষ পর্বস্ত কিন্তু বাসু-সাহেবকে রোখা গেল না । ঊর দূর বিশ্বাস, হয় জীবনব্যব, না হয় ঐ সুপ্রিয়-ডিক্রুজা টাকাটা হাতাবার তালে আছে । এখন থেকে ব্যবস্থা করলে এ দুর্ঘটনা এড়ানো চলতে পারে । কৌশিককে উনি বললেন, ভূমি এখনই একটা স্মার্টকেস নিয়ে পার্ক হোটেলে চলে যাও । ওরা আছে রুম নম্বর 39-এ । তার কাছাকাছি একটা ঘর একদিনের জন্ত ভাড়া নিও । ঘরটা নেওয়ার আগে দেখে নিও ওখান থেকে রুম 39 নজরে আসে কি না । তারপর সারাদিন ঐ কেশিন্দার-ম্যানেজারের উপর নজর রাখ । কে কখন বেরিয়ে যাচ্ছে, ঢুকছে, কোনও বাইরের ভিজিটার্স আসছে কিনা, কোথায় লাগ করছে ইত্যাদি ।

কৌশিক বলে, আর কিছ ?

—হ্যাঁ। এছাড়া তুমি বসে মেল-এ একখানা ফার্স্ট ক্লাস টিকিট কাট।  
রিজার্ভেশান যদি না পাও তাহলেও টিকিট কাটবে। সুপ্রিয় যে কথা জীকন  
বিবালকে বলেছে তা যদি সত্য হয় তাহলে একটা বার্ব শেব মুহুর্তে খালি  
পাবেই। যদি নাও পাও তবে কণ্ডাকটর গার্ড-এর সঙ্গে ম্যানেজ করে নিও।  
শেব পর্বত দরকার হলে প্যাসেজে বসেই যেতে হবে। মোটকথা ঐ বগীতে  
তোমাকে বোম্বাই যেতে হবে।

—বুঝলাম। বোম্বাই গেলাম। তারপর ?

—ঐ ম্যানেজার আর কেশিয়ার নিরাপদে তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলেই  
তোমার ছুটি। ফিরে আসবে। কিন্তু তার আগে সহযাত্রী হিসাবে ওদের  
দু-জনের সঙ্গেই বসে। পার আলাপ জমাবে।

—আর কিছ নির্দেশ ?

—আছে। প্রথম কথা, পার্ক হোটেলে যখন উঠবে তখন তোমার ছদ্মবেশ  
ধাকবে। ট্রেনে স্বাভাবিক চেহারা। বাতে গুয়া দুজন বুঝতে না পারে  
যে, ওদের ট্রেনের সহযাত্রী ভত্রলোক ঐ পার্ক-হোটেলেরই বোর্ডার ছিল।  
দ্বিতীয় কথা, ট্রেন ছাড়ার আগে তুমি স্বজাতার সঙ্গে কথা বলবে না।

—স্বজাতা! স্বজাতাকে কোথায় পাব!

বাহু-সাহেব এবার স্বজাতার দিকে ফিরে বলেন, তুমি স্বজাতা, সন্ধ্যা  
সাড়ে ছটার সময় একটা ট্যান্সি নিয়ে হাওড়া স্টেশানে চলে যাবে। সঙ্গে নেবে  
শুধু একটা লেডিজ হাত-বাগ। স্টেশানে পৌঁছে একটা প্রাইটকর্ষ টিকিট  
কাটবে। বসে মেল নয়-নম্বর প্রাইটকর্ষ থেকে রাত সাড়ে সাতটার সময় ছাড়ে।  
কিন্তু সেটাকে বেদবাক্য বলে ধরে নিও না। কানখাড়া করে শুনে নিও  
বোঝক বলছে কিনা : কৃপা কর তুমিই ত্রি-আপ বোম্বাই মেল নও নম্বরকে  
বললে—

স্বজাতা বাধা দিয়ে বলে, আপনি কি আমাকে বাচ্চা খুঁকিটি পেয়েছেন ?

—না। সব সম্ভাবনাই ভেবে দেখছি আমি। মোটকথা ফার্স্ট ক্লাস  
রিজার্ভেশান চার্টে দেখবে 3542 এবং 3543 টিকিটধারী মিস্টার এ্যাণ্ড মিসেস  
দাসগুপ্তের ক্যুপে কোন্ বগীতে আছে। ঐ ক্যুপেতে গিয়ে গ্যাট হয়ে বসে  
ধাকবে। কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখবে।

—আর কণ্ডাকটর গার্ড যখন আমার রিজার্ভেশান টিকিট দেখতে  
চাইবে ?

—তখন বলবে, তুমি মিসেস দাসগুপ্তা। তোমার কর্তা টিকিট আর

মালগুজ নিয়ে গিছনের ট্যান্ডিতে আসছেন। ট্রেন ছাড়া পূর্বত এই অজুহাতে কাক্সায় বসে থাকবে। তারপর বাধ্য হয়ে নেবে গড়ে কর্তাকে খুঁজবার অভিনয় করবে। এনি কোশেন ?

—কখন যদি এই সুপ্রিয় দাসগুপ্ত একটি মহিলাকে নিয়ে এসে কণ্ডাক্টার গার্ডকে তাদের বিজ্ঞপ্তি দেখায় ?

—তা তো দেখাবেই। তবু তুমি সীট ছাড়বে না। কণ্ডাক্টারকে বলবে—যাতে ভীড় জমে যায়।...অমন করে আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন সুজাতা ? এ জাতীয় কাজ তো তোমরা হামেশাই অহেতুক করে থাক, আজ প্রয়োজনে পারবে না ?

—কী করে থাকি ?

—অবুজের মত অহেতুক চেষ্টামেচি ! আবদেবে স্ত্রী স্ত্রী গলায় বলা—‘আগে আমার মিস্টার আসুন, না হলে আমি সীট ছাড়ব না।’

সুজাতা হেসে ফেলে। বলে, আপনার উদ্দেশ্যটা কি বলুন তো ?

—ভীড় জমানো। যাতে আশপাশের কামরার প্যাসেঞ্জার কোতুলী হয়ে ব্যাপারটা দেখতে আসে। অন্তত কণ্ডাক্টার গার্ড যাতে এই তথাকথিত স্ট্রিঙ্গস্ দাসগুপ্তকে অনেকক্ষণ ধরে দেখে। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে ডব্লিউতে এই কণ্ডাক্টার গার্ড বা অন্য কোন সহযাত্রী সহজেই মেয়েটিকে সনাক্ত করতে পারবে।

হানী বলেন, আর আমার কাজ ? কদায় তেল বলিয়ে দেব ?

—তেল ?

—ভ্যারেণ্ডা ভাজতে ?

—না ! তুমি হচ্ছে আমাদের কন্ট্রোলরুম। কৌশিক প্রতি দু’ তিন ঘণ্টা অন্তর রিপোর্ট দেবে। তুমি সেই রিপোর্ট সময়-চিহ্ন দিয়ে নোট করে যাবে। আমাদের তিনজনকে গাইড করবে ওর রিপোর্ট অসুযায়ী।

## তিন

হানী দেবীর সমস্ত দিনটাই কর্মব্যস্ত গেল। কৌশিক পর পর চার পাঁচ বার কোন করেছে। বেলা দশটায় প্রথমবার—পার্ক হোটেল থেকে। খবর : ও একচল্লিশ নম্বর ঘরে উঠেছে। ওখান থেকে উনচল্লিশ নম্বর ঘর নজর রাখা যাচ্ছে। সেটাতে দুজন বোর্ডার আছেন। ডবল-বেড রুম। হোটেল রেজিস্টারে দেখেছে তাঁদের নাম—স্বীকৃতকুমার বিশ্বাস আর সুপ্রিয় দাসগুপ্ত।

মায়ী ঠিকানা—কাপাডিয়া এ্যাণ্ড কাপাডিয়া কোম্পানি, বোম্বাই। জীবনবাবু খাবয়নী। দোহারা চেহারা, গোক আছে। তিনি ঘর ছেড়ে দু-তিনবার বর হয়েছেন। সুপ্রিয় একবার মাত্র বার হয়েছিল। বারান্দায় বেরিয়ে এসেই দাবার ঘরে ঢুকে যায়। সে যে ঘরে আছে তার আরও প্রমাণ আছে। দারুণ জীবনবাবু বতবাইই বার হচ্ছেন ঘরে তালি দিয়ে বাচ্ছেন না। কিরে এসে নকু করছেন। ভিতর থেকে কেউ দরজা খুলে দিচ্ছে।

রানী দেবী রিপোর্টটা বিশ্ব হাতে পাঠিয়ে দিলেন বাসু-সাহেবকে। বাসু টা পড়ে তৎক্ষণাত্ ফোন করলেন পার্ক হোটেলের একচমিশ নম্বর ঘরে—টা বারোয়।

কৌশিক ফোন ধরতেই বললেন, তোমার রিপোর্ট পেয়েছি। শোন, বার জীবন ঘর ছেড়ে বার হলেই তুমি উনচমিশে ফোন কর। সাড়া দিলেই লবে, তুমি জীবন বিশ্বাসকে খুঁজছ। জাচারালি লোকটা বলবে, তিনি যে নেই। সঙ্গে সঙ্গে তুমি প্রসন্ন করবে, আপনি কি সুপ্রিয়বাবু? সে উত্তর লগুয়ামাত্র লাইন কেটে দেবে। রিপোর্ট ব্যাক রেজান্ট।

কৌশিক দ্বিতীয়বার ফোন করল দশটা কুড়িতে। বলল, জীবন লগুয়া শটায় ঘর ছেড়ে বার হতেই ও ফোন করে। উনচমিশ নম্বরে কেউ সেটা যে। কৌশিক প্রশ্ন করে, ‘জীবনবাবু আছেন?’ লোকটা জবাবে প্রতিশ্রদ্ধ করে, ‘আপনি কে?’ কৌশিক বলে, ‘আপনি কি সুপ্রিয়বাবু?’ লোকটা যেন শন-আটকে-বাওয়া-রেকর্ড—বলে, ‘আপনি কে?’ সব শুনে বাসু-সাহেব বলেন, ঠিক আছে। জীবন ঘরে ফিরলেই আমাকে ফোনে জানিও।

গারোটায় সময় কৌশিক জানালো সুপ্রিয় দাদুগুপ্তকে এখনও দেখা য়নি; এবং জীবন বিশ্বাস ঘরে ফিরেছে। বাসু তখন নিভেই ফোন করলেন উনচমিশ নম্বর ঘরে। ফোন ধরল সুপ্রিয়। বাসু বললেন, ‘জীবনবাবু আছেন?’

লোকটা বলল, আপনি কে?

বাসু বললেন, আমি যেই হই না মশাই, তাতে আপনার কি? জীবনবাবু থাকেন ডেকে দিন, না থাকেন—বলুন, নেই।

একটু নীরবতার পর বাসু শুনলেন, হ্যালো, জীবনকুমার বিশ্বাস বলছি।

—আমি পি. কে. বাসু। কোন ধরেছিল কে বলুন তো। দু-দু’ বার—

জীবন ঠেকে শেষ করতে দিল না। বললে, বুঝতেই তো পারছেন।

হুঁ, কেন ফোন করছিলেন?

—বেজিস্টি করে দিয়েছেন?



—হ্যা, এই মাত্র ।

—হুঁ-লাখ টাকা ব্যাক মানির কথাটাও লিখেছেন নাকি ?

—না । শুধু লিখেছি অনেক টাকা নগদে নিয়ে যাচ্ছি ।

—ঠিক আছে ।—লাইন কেটে দিলেন বাহু ।

এরপর কৌশিকের কোন এল বিকেল চারটের । সে টিকিট পেয়েছে ঘটনাচক্রে রিজার্ভেশনও । সুপ্রিয় আর একবারও ঘর ছেড়ে বাইর হয়নি এমনকি লাঞ্চ খেতেও নয় । বোধহয় লোকটা অসুস্থ । না হলে অস্বাভাবিক আহার করতে একবার বার হত । অথচ সে যে ঘরে আছে এটা নিঃসন্দেহ । এ-ছাড়া আর একটা খবরও পাওয়া গেছে । আটত্রিশ নম্বর ঘরে দিন তিনেক আগে একজন ভ্রম্যহীনা তাঁর অসুস্থ ভাইকে নিয়ে নারি উঠেছিলেন । হোটেল রেজিস্টার অস্থায়ী তাঁদের নাম মিষ্টার এবং মিসেস নির্লভা—ভাই বোন । ভাইটি নাকি বিকৃতমস্তিষ্ক । ইন্টারেস্টিং কেস রাঁচি থেকে ভাইকে নিয়ে উনি এ হোটলে উঠেছিলেন । আজ সন্ধ্যা ছয়টার চলে গেছেন । পাগল ভাইকে নিয়ে এই কদিন একটা গাড়িতে বারে , বারেই বার হতেন চিকিৎসা করানোর ব্যাপারে । ভাইটো কেমন বেন জড়সড় ঐ বন্ধ-ধরা । চেষ্টামেচি গুণগোল করত না । দিবারাত্র পড়ে পড়ে ঘুমাতো পঞ্চবটী ওকে দিয়েছে ক্রম-সাবিধের বেহারা হরিমোহন । সে পাগলটাকে দেখেছে । হুঁ-একবার তাকে ধরে গাড়ি পর্বন্ত পৌঁছেও দিয়ে এসেছে লোকটা ঘুমাতো । ঘুমাতোই ইটিত । চোখ খুলে বড় একটা তাকাতোই না । এত খবর ও জানাচ্ছে এজন্য যে, মিসিং-লিফ মিস্ ডিক্কার সঙ্গে ঐ ডি নিল্ভার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে ।

সন্ধ্যা ছয়টার সময় সে ফোন করে জানালো—পাশের ঘরের দুই-বাসিন রওনা হলেন । সঙ্গে দুটো বেডিং, চারটে স্মটকেস । দুটো স্মটকেস হোটেলের সেক ডিপজিট লকার থেকে এইমাত্র ডেলিভারি নেওয়া হল সুপ্রিয়কে ও এক নজর মাত্র লেখেছে । লোকটা ঘর থেকে বেশ তাড়াহুড়ু করেই হঠাৎ বেরিয়ে এল । কৌশিকও ঘর ছেড়ে বের হয়ে এসেছিল কিন্তু ভাল করে তাকে সনাক্ত করার আগেই লোকটা গিয়ে বসল ট্যান্ডিতে তবু এক নজর সে তাকে বা দেখেছে দরকার হলে সনাক্ত- করতে পারবে লম্বা একহারা, বড় ফর্সা । গৌর-দাড়ি কামানো, বড় বড় জুলুকি । কৌশিক টেলিফোনে জানালো যে, সে-ও রওনা হচ্ছে । হাওড়া স্টেশনের কার্ট রা ওয়েটিংরুমে গিয়ে সে ছদ্মবেশ পালটাবে ।

স্বভাভাও হাতব্যাগ নিয়ে রওনা হয়ে গেল সন্ধ্যা ছুঁটা নাগাদ ।

খেটে সময় থাকতে স্বজাতা স্টেশনে পৌঁছেছে। জি-আপ বোম্বাই-মেল নম্বর প্লাটফর্ম থেকেই ছাড়ছে। প্লাটফর্ম টিকিট কিনে স্টেশনে ঢুকে লে র্ডেশান চার্টটা দেখল। 7852 বগীতে সি-চিহ্নিত ক্যাপে-কামবায় মিস্টার মিসেস দাসগুপ্তার আসন সংরক্ষিত। স্বজাতা গটগটিয়ে যেই কামবায় ত বাবে কণ্ডাক্টার গার্ড রাখল : আপনার টিকিটটা প্রীজ ?

অত্যন্ত সপ্রতিভ-ভঙ্গিতে ও বললে, আমার নাম মিসেস অঞ্জলি দাসগুপ্তা। ট আমার স্বামীর কাছে আছে, উনি পিহনে আসছেন। আমাদের ট নম্বর হচ্ছে 3542 এবং 3543। দেখুন তো সি-কম্পার্টমেন্ট কি ? কণ্ডাক্টার-গার্ড তাঁর হাতে চার্ট দেখে বললেন, হ্যাঁ, সি-কম্পার্টমেন্ট। বহন।

স্বজাতা উঠল বগীতে। সি-কম্পার্টমেন্ট ছোট ক্যাপে। দরজা বন্ধ ছিল। ঝুলতেই দেখে ভিতরে বসে আছেন এক ভদ্রলোক। একা। বছর চল্লিশ, স্মার্ট-পরা। ওকে দেখেই বললেন, মিসেস দাসগুপ্তা নিশ্চয় ?

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে তো ঠিক—

—না, আমিও আপনাকে চিনি না। ক্যাপেটা মিস্টার এ্যাও মিসেস গুপ্তার নামে রিজার্ভ করা তো—

—ও! তা আপনার কোন্ কম্পার্টমেন্ট ?

—এখনও জানি না। আপনি ততক্ষণ আমার ব্যাগটা দেখুন, আমি কন্ডাক্টার গার্ডকে জিজ্ঞাসা করে আসি।—ব্যাগটা রেখেই নেমে গেলেন লোক। ব্যাগটা হচ্ছে BOAC-এর এয়ার ব্যাগ। সেটা বাঁধা ছিল ঝালার ধারে। জানালার কাচটা বন্ধ। স্বজাতা ব্যাগটা সরিয়ে দিল কের মাঝ বরাবর। জানালার ধারে গিয়ে বসল। কাচটা নামিয়ে দিল। তে দেখল সাতটা পনের হয়েছিল।

ঠিক তখনই কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে এক ভদ্রলোক এসে হাজির। জিশেক বয়স। স্বন্দর একহারা চেহারা। গৌর-দাড়ি কামানো। জুলফি। নিঃসন্দেহে সুপ্রিয় দাসগুপ্ত। স্বজাতাকে এক নজর দেখে য বললেন, ঐ ব্যাগটা আপনার ?

স্বজাতা বললে, না। ঐ ভদ্রলোক রেখে গেছেন।—হাত বাড়িয়ে প্লাটফর্মে গানো স্মার্টপরা ভদ্রলোককে সে দেখিয়ে দেয়। ভদ্রলোক এক প্যাকেট গ্রহণ কিনছিলেন। আগন্তুক যুগ বাড়িয়ে ভদ্রলোককে একনজর দেখে লন। তারপর স্বজাতার দিকে ফিরে বললেন, আপনার রিজার্ভেশান খায় ?

—এই ক্যুপেতেই। আপনার ?

ভ্রমলোক ইতিমধ্যে বাকটা পেতে কেলছেন। কুলি তার উপর বেড়িংটা রাখছে। তার হাত থেকে মালপত্র নিয়ে ঘরটা সাজাতে সাজাতে ভ্রমলোক বললেন, আপনি ভুল করেছেন। কাণ্ডাকটার গার্ডকে টিকিটটা দেখান, উনি আপনার কামরা দেখিয়ে দেবেন।

—উনিই আমার টিকিট দেখে বললেন, এই ক্যুপে।

কুলি পরমা চাইল। ভ্রমলোক সেকথা কানে ভুললেন না। স্জাতাকে বললেন, কই দেখি আপনার টিকিট ?

—আপনাকে টিকিট দেখাতে দাব কোন দ্বখে ?

এই সময় দ্বার পথে এসে দাঁড়লেন একজন প্রোট ভ্রমলোক। স্জাতার বুকে অসুবিধা হল না,—উনি জীবন বিশ্বাস। ঝোলা গোঁফেই তাঁর পরিচয়। প্রোট ভ্রমলোক বললেন, কি হল স্তার ?

—কণ্ডাকটার গার্ডকে ডাকুন তো। এ ভ্রমহিলা অহেতুক কামেলা করছেন।

জীবনবাবুও বুভাঙ্কটা শুনে স্জাতাকে বোকাতে চাইলেন সে ভুল করছে। স্জাতা কোন পাতাই দিল না। অগত্যা ওঁরা ডেকে নিয়ে এলেন কণ্ডাকটার গার্ডকে।

—কি হল আবার আপনার ?—দ্বারপথে এসে দাঁড়ায় কণ্ডাকটার গার্ড।

সুপ্রিয় বললে, এ ভ্রমহিলার কোন ঘরে রিজার্ভেশন আছে দেখে দিন তো ?

—কই দিন তো আপনার টিকিট ?—কণ্ডাকটার গার্ড হাত বাড়ায়।

—বললাম না তখন, আমি মিসেস দালগুপ্তা ? টিকিট আমার স্বামীর কাছে আছে। আমাদের টিকিট নম্বর 3542 এবং 3543।

কণ্ডাকটার গার্ড আবার তার চার্ট মেলাতে থাকে। সুপ্রিয় বাধা দিয়ে বলে, ওটা দেখতে হবে না। এই দেখুন, টিকিট নম্বর 3542 এবং 3543।

কণ্ডাকটার গার্ড ফ্যালফ্যাল করে দুজনের দিকে তাকায়।

—এঁকে নামিয়ে দিন !—কঠিন কণ্ঠে সুপ্রিয় বলে।

—আপনি কইগুলি নেমে আসুন—কণ্ডাকটার গার্ড স্জাতাকে অহরোধ করে।

—ইয়ার্কি নাকি ! আগে আমার স্বামী আসুন, তার আগে আমি নামব না।

—কী আশ্চর্য ! আপনার কাছে টিকিট নেই—

—কে বলল টিকিট নেই? টিকিট আমার বামীর কাছে আছে। উনি আহ্নন আগে—

—আমিও তো তাই বলছি, তিনি স্বতঃক্ৰম না আসেন—

—বাধা দিয়ে স্বজ্ঞাতা বলে, বেশ তো, ঠেকে জিজ্ঞাসা করুন না, মিসেস দাসগুপ্তা কোথায়? ঐ গুপো ড্রলোক কি মিসেস দাসগুপ্তা? ওঃ জী কোথায়?

জীবনবাবু হুট করে সরে পড়েন।

কণাকটার গার্ড-এর মনে হল সশরীরে টিকিটধারী ড্রলোকের জীকে হাজির করতে পারলে হয়তো সমস্তার স্বরাহা হবে। স্বপ্রিয়কে বলে, ইয়েন, আপনার জী কই?

—উনি এখনই আসবেন। টয়লেটে গেছেন।

স্বজ্ঞাতাও গম্ভীর হয়ে বলে, আমার কৰ্তাও এখনই আসবেন। টয়লেটে গেছেন।

ভীড়ের মধ্যে একজন যাত্রী কণাকটার গার্ডকে বলে, সাতটা পঁচিশ হয়ে গেছে স্যার। জি. আর. পি.-কে ডাকুন। না হলে ট্রেন ছাড়তে দেবী হয়ে যাবে।

স্বজ্ঞাতা মুখ তুলে দেখল বজ্রা আর কেউ নয়, কৌশিক মিত্র। ইতিমধ্যে বেশ ভীড় জমে গেছে। একজন পুলিশ অফিসার মুখ বাড়িয়ে বলেন, এনি ট্রাবল?

ইন্সপেক্টরের আবির্ভাবমায় অবস্থাটা পালটে গেল। প্রথমেই তিনি ভিডট। হটিয়ে দিলেন—প্রজ্ঞা ক্রিয়ার আউট। ট্রেন এখনই ছাড়বে। যে-যার সীটে গিয়ে বহন।

তারপর ঘরে ঢুকে তিনি কণাকটার গার্ডের কাছে ব্যাপারটা সংক্ষেপে শুনে স্বজ্ঞাতার বিবরণেই বায় দিলেন। বললেন, আপনি নেবে আহ্নন। বোনাকাইড টিকেট-হোল্ডারকে সীট ছেড়ে দিন।

স্বজ্ঞাতা বোঝে আর দেবী করা ঠিক নয়। উঠে দাঁড়ায় সে। লেডিজ হাতব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নেয়। পুলিশ অফিসার BOAC মার্কা ব্যাগের পেটটা চেপে ধরে নেমে আসেন। স্বজ্ঞাতা বলে, ও ব্যাগটা আমার নয়।

—আই সী! আপনার?—পুলিশ অফিসার প্রশ্ন করে স্বপ্রিয়কে।

—হঁ।—গম্ভীরভাবে স্বপ্রিয় বলে, অন্ত দিকে তাকিয়ে।

পুলিশ অফিসার ব্যাগটা নামিয়ে রাখতে গিয়ে কি ভেবে থেমে পড়েন। বলেন, কি আছে ব্যাগটার? খুলুন তো?

সুপ্রিয় কথো ওঠে, কেন বলুন তো ?

ইন্সপেক্টার মুখ তুলে একবার তাকায় তার দিকে। তারপর কারও অসুস্থতির অপেক্ষা না করে খোলা ব্যাগের জিপটা টেনে ফেলে। হাত চুকিয়ে কী যেন স্পর্শ করে। পুনরায় বলে, ব্যাগটা আপনার ?

সুপ্রিয় থিঁচিয়ে ওঠে, বলছি তো, না ! কেন, কি হয়েছে ?

ইন্সপেক্টার কণ্ঠাকটার গার্ডকে বলে, কুইক ! গার্ডকে বলুন, গাড়ি যেন না ছাড়ে। সামথিং ফিশি ! আমার নাম করে বলুন।

সুপ্রিয়র মুখটা লারা হয়ে যায়। কৌশিক এবং ঝোলা গোঁফ না-পাতা। সুজাতা তখনও কাঁঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কণ্ঠাকটার গার্ড ছুটে বেরিয়ে গেল। ইন্সপেক্টার সুজাতা এবং সুপ্রিয় দুজনের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকিয়ে বসলে, এই ব্যাগটা কার ? আইদার অফ য়ু ! বলুন, কার ?

সুজাতা বললে, আমার নয়। আমি জানি না কার।

সুপ্রিয় বললে, আমি যখন ঘরে ঢুকি তখন ব্যাগটা এখানেই ছিল। উনি তখন ঘরে একা ছিলেন। ফলে ব্যাগটা ওঁর !

ইন্সপেক্টার ধমক দিয়ে ওঠে। তাহলে তখন কেন বললেন ব্যাগটা আপনার ?

—আমি লে কথা বলিনি।—সুপ্রিয় জবাবে জানায়।

—বলেছেন ! উনি যখন বললেন ব্যাগটা ওঁর নয়। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম ‘আপনার ?’ আপনি বললেন, ‘হঁ’।’ বলেন নি ?

—আমি তখন অশ্রুদিকে তাকিয়েছিলাম। দেখিনি, আপনি কোন ব্যাগটার কথা জিজ্ঞাসা করছেন। কেন, কি হয়েছে ?

ইন্সপেক্টার ওদের দু’জনকে ভালভাবে দেখে নিল একবার। সুজাতাকে বললে, আপনার নাম অঞ্জলি দাসগুপ্তা ? ঠিকানা ?

সুজাতা অল্পনবদনে বললে, না, আমার নাম সুজাতা মিত্র।

—সুজাতা মিত্র ! গুড গড ! তাহলে এতক্ষণ মিথ্যা কথা বলেছিলেন কেন ?

—আমি বলব না।

—আই মে হ্যাভ টু এ্যারেস্ট য়ু !—হাত বাড়িয়ে ইন্সপেক্টার দুজনাটা বন্ধ করে দেয়। বলে, এ ব্যাগের ভিতর কি আছে জানেন ?

হাত চুকিয়ে সে বার করে একটা লোডেড রিভলভার।

—কেন এতক্ষণ নিজেকে অঞ্জলি দাসগুপ্তা বলে চালাচ্ছিলেন ? বলুন ? জবাব দিন ?

স্বভাৱা একটুও বাবড়ায় না। তাৰ লেডিজ হ্যাণ্ড-ব্যাগেৰ কিপটা খুলে  
কেলে। একটা ছোট্ট আইডেণ্টিটি কাৰ্ড বাৰ কৰে ইন্সপেক্টোৱেৰ হাতে দিয়ে  
বলে, আই ৰিথ্ৰেজেষ্ট ‘স্বকোশলী’! আমাৰ ক্লায়েণ্টেৰ বাৰ্থে মিথ্যা কথা  
বলছিলাম। আমি জানতাম, এই কামবায় আৰু একটা বিল্ডি কাণ্ড হতে  
বাঞ্চে।

ইন্সপেক্টাৰ স্তম্ভিত হয়ে যায়। আইডেণ্টিটি কাৰ্ডটা পৰীক্ষা কৰে বলে,  
‘স্বকোশলী’! এমন প্রাইভেট ডিটেকটিভ ফাৰ্ম কলকাতা শহৰে আছে বলে  
আমি জানতামই না!

—লালবাজাৰেৰ সীলটা নিশ্চয় চিনবেন?

কাৰ্ডটা পকেটে ৰেখে ইন্সপেক্টাৰ সুপ্রিয়ৰ দিকে ফেৰে। বলে, আপনাৰ  
নাম মিষ্টাৰ সুপ্রিয় দাসগুপ্ত তা প্রমাণ কৰতে পাৰেন?

—নিশ্চয়ই। স্মাৰ্টকেশে আমাৰ লেটাৰ-হেড পাড আছে। ভিজিটিং  
কাৰ্ড আছে।

—স্মাৰ্টকেশটা থলুন!

—তাৰ কি কোন প্রয়োজন আছে? অলৱেডি পাঁচমিনিট লেট হয়ে  
গেছে ট্ৰেনটা ছাড়তে!

—আই সে ওপন ইয়োর স্মাৰ্টকেশ।

সুপ্রিয় কমাল দিয়ে মুখটা মুছল। তাৰপৰ বেক্সিৰ নিচ থেকে টেনে বাৰ  
কয়ল স্মাৰ্টকেশটা। চাবি দিয়ে স্মাৰ্টকেশেৰ ডালাটা খুলল। ওয় হাত  
বীতিমত কাঁপেছে। অতি সন্তৰ্পণে সে জামা-কাপড়ের নিচে হাত চালিয়ে  
লেটাৰ হেড পাডটা খুঁজতে থাকে। স্মাৰ্টকেশেৰ উপৰ চাপা দেওয়া ছিল  
একটা নতুন তোয়ালে। হঠাৎ ক্ষিপ্ৰ হাতে ইন্সপেক্টাৰ তুলে ফেলল সেই  
তোয়ালেটা।

তাৰ নিচে থাক দেওয়া দশটাকাৰ নোট! এক স্মাৰ্টকেশ বোকাই।

—মাই গড! কত টাকা আছে ওখানে?

একটা টোক গিলে সুপ্রিয় বললে, এক লাখ টাকা।

—সব দশ টাকায়?

—হঁ!

—বাক্সটা বন্ধ কৰুন।

আদেশ পালন কৰে সুপ্রিয়।

ইন্সপেক্টাৰ স্বভাৱাৰ দিকে ফিৰে বললে, আপনি জানতেন, উনি একলাখ  
টাকা নগদে এবং দশটাকাৰ নোটে নিয়ে যাচ্ছেন?

—না! আমার ইনকর্ডেশান ছিল উনি ছু-সাথ টাকা নগদে এবং দশটাকার নোট নিয়ে যাচ্ছেন।

—আই নী!—ইন্সপেক্টর ঘুরে দাঁড়ায় সুপ্রিয়র মুখোমুখি, এ টাকা কোন ব্যাক থেকে তুলেছেন?

—ব্যাক থেকে তুলিনি।

—ব্ল্যাক-মানি?

সুপ্রিয়-মাথা নাড়ে—নেতিবাচক।

—মিস্টার দাসগুপ্ত, আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে বলছেন যে, নগদ এক লাখ টাকা আপনি দশটাকার নোট নিয়ে যাচ্ছেন—উইথ এ লোডেড রিভলভার—

—ওটা আমার নয়।

—আয়াম সরি। হু আর আগার এ্যাবেস্ট! নেমে আসুন আপনি!

আবার কুখে ওঠে সুপ্রিয়, আপনি—আপনি এভাবে আমাকে ত্রেপ্তার করতে পারেন না! আমি বোনাকাইড প্যাসেঞ্জার! আমি হিউজ কম্পেন্সেশন ক্রেম করব।

—করবেন! তার আগে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে ওটা ব্ল্যাকমানি নয়। নেমে আসুন আপনি! না হলে কিছু আমি আপনাকে হ্যাণ্ডকাফ দিয়ে মাজার দড়ি বেঁধে প্লাটফর্ম দিয়ে নিয়ে যাব।

কাঁপতে কাঁপতে নেমে এল সুপ্রিয়। পাশের কেবিন থেকে জীবন বিশ্বাস। স্বজাতা মুখ তুলে দেখল, কোশিকও নেমে পড়েছে ট্রেন থেকে। অগত্যা সেও নামল।

দশ মিনিট দেরীতে অল্পমতি পেয়ে গুডফ্রাইডের সন্ধ্যায় বগুনা হল বোম্বাই মেল। তার চার-চারটে ফাস্ট ক্লাস বার্ক খালি।

## চার

শনিবার তের তারিখ সন্ধ্যায় জীবন বিশ্বাস এসে হার্জির হল বাস সাহেবের চেম্বারে। একদিনেই লোকটা যেন অর্ধেক হয়ে গেছে। ভেঙে পড়ল সে একেবারে, হৃদয় এবার বাঁচান আমাদের!

—কি হল আবার? আপনার না গতকাল বোম্বাই চলে যাবার কথা?

—তাই তো কথা ছিল তার। ট্রেন ছাড়ার আগেই নেমে পড়তে হল আমাকে। সে এক কেলেকারি কাণ্ড। বলি শুনুন:

জীবন বিশ্বাস বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন ঘটনাটার। হোটেল থেকে যথাসময়ে ওঁরা স্টেশানে এসেছিলেন। কথা ছিল, মিস্টার দাসগুপ্ত কুপেতে একা থাকবেন ট্রেন ছাড়ার সময়; এবং ট্রেন চলে গেলে পাশের কামরা থেকে জীবনবাবু এসে ওটাতে রাত্রে শোবেন। কিন্তু বামেলা বাখালেন এক ভদ্রমহিলা। জীবন তাঁকে চেনেন না, তিনি নাকি আগে ভাগেই ঐ কুপের একটা সীট দখল করে বসেছিলেন। বললেন, তাঁর নাম মিসেস অঞ্জলি দাসগুপ্ত। সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার সেই ভদ্রমহিলা ওদের টিকিটের নম্বর দুটোও কি করে ভানি সংগ্রহ করেছিলেন।

বান্ধু-সাহেব বাধা দিয়ে বললেন, সে আর শক্ত কি? ফার্স্ট-ক্লাস রিজার্ভেশন চার্জেই তো নামের পাশে টিকিট নম্বর লেখা থাকে।

—তবে তাই হবে স্ত্রীর; কিন্তু ভদ্রমহিলা ব্যাগে করে একটা লোডেড রিভলভার নিয়ে এসেছিলেন—

আমুপূর্বিক ঘটনার একটা বর্ণনা দাখিল করলেন জীবনবাবু। শোনা গেল, সুপ্রিয় দাসগুপ্ত জামিন পায়নি। তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ নাকি হত্যার অভিযোগ আনছে।

—মার্ডার কেস? খুন হল কে আবার? কখন?

জীবনবাবু তখন বিস্তারিত জানালেন সেই পূর্ব ইতিহাস। তিনি খানা থেকে মোটামুটি জেনে এসেছেন।

এগারই তারিখ, বৃহস্পতিবার রাত পোনে আটটার সময় বড় বাজারে নিজের গদিতে খুন হয়েছেন একজন ধনী ব্যবসায়ী—এম. পি. জৈন। আটটার দোকান বন্ধ হয়। ওঁরা বাঁপ ফেলার উদ্যোগ করছেন এমন সময় তিন চারজন যুগোশধারী লোক হঠাৎ ঢুকে পড়ে দোকানে। তাদের একজনের হাতে ছিল রিভলভার আর সকলের ছোরা। গেটে ছিল দারোয়ান + সে বাধা দেবার চেষ্টা করার প্রথমেই গুলিবিদ্ধ হয়ে উণ্টে পড়ে। ডাকাতেরা দোকানে ঢুকে পড়ে। কেশিয়াদের কাছে চাবি চায়। কেশিয়ার ইতস্তত করে। তখন একজন ডাকাত তাঁর কপালে রিভলভার উত্তর করে ধরে। বাধা হয়ে কেশিয়ার চাবির খোঁকাটা বার করে দেয়।

মালিক এম. পি. জৈনের একটা নিজস্ব রিভলভার ছিল তাঁর ড্রয়ারে। ডাকাতগুলো আয়রণ সেফ খুলে নোট বার করতে ব্যস্ত আছে দেখে তিনি চট করে টানা ড্রয়ারটা খুলে রিভলভার বার করে ফায়ার করেন। কেউই তাতে গুলিবিদ্ধ হয় না। অপর পক্ষে ডাকাতদের একজন তখন মিস্টার জৈনকে প্রচণ্ড খাকা মারে। জৈন উণ্টে পড়ে যান। তাঁর হাত থেকে রিভলভারটা



ছিটকে পড়ে। তখন আর একজন ডাকাত সেই রিভলভারটা কুড়িয়ে নিয়ে তাই দিয়েই তৈনকে গুলি করে। তিন চার মিনিটের ব্যাপার। ওরা বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে একটা কালো এ্যাংসাভার চেপে উধাও হয়ে যায়। তখন লোকজন ছুটে আসে। দেখা যায় এম. পি. জৈন মৃত। দারোয়ানটার আঘাত মারাত্মক নয়। ডাকাতেরা নগদে প্রায় বাট হাজার টাকা নিয়ে যায়, এবং মৃত এম. পি. জৈনের রিভলভারটাও নিয়ে যায়।

এখন নব্ব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে গতকাল বোম্বাই মেলের ফার্স্ট-ক্লাস কামরায় ঐ BOAC মার্কী ব্যাগের ভিতর যে রিভলভারটা পাওয়া গেছে সেটা জৈনসাহেবের রিভলভার।

হুপ্রিয়র বিরুদ্ধে তাই চার্জ হচ্ছে, ডাকাতি আর খুনর।

বাসু-সাহেব সমস্ত শুনে বললেন, কেসটা ধরাপ। কাল রাতে ঐ পুলিশ ইন্সপেক্টর যখন জিজ্ঞাসা করেছিল—‘ব্যাগটা আপনার?’ তখন হুপ্রিয়র কেন বলেছিল, ‘হ’?

—ও অন্তমনস্ক হয়ে বলেছিল স্তার। বুঝতে পারেনি কোন ব্যাগটার কথা হচ্ছে।

—আপনাকেও তাই বলল?

—স্তার দেখা পেলাম কোথায় স্তার? হাজতে আমাকে যেতেই দিল না। বললে, একমাত্র ওর উকিল ছাড়া আর কারও সঙ্গে ওকে দেখা করতে দেবে না। এখন আপনি যদি ওর কেসটা হাতে নেন স্তার।

একটু ভেবে নিয়ে বাসু-সাহেব বললেন, নেব, কিন্তু এবার আর মৌকম্বে নয়।

—নিশ্চয় নয় স্তার, নিশ্চয় নয়—বলুন এবার কত দিতে হবে?

—আমার মোট ফি হবে দশহাজার টাকা, তার অগ্রিম পাঁচ হাজার এখনই দিতে হবে।

—দশ হা-জা-র টাকা। কী বলছেন স্তার?

গভীর হয়ে বাসু বললেন, জীবনবাবু, ফি নিয়ে দরাদরি আমি করি না। কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ক্রিমিনাল ল-ইয়ার অনেকে আছেন এ-শহরে। অনেক কমেও হয়তো অনেকে রাজী হয়ে যাবেন। চেষ্টা করে দেখুন।

—না স্তার। আমিও বাজার বাচাই করতে বাব না। বেশ, ঐ দশ হাজারই দেব। টাকা তো আমার নয়, কোম্পানির। তবে স্তার আপনাকে আর একটা কাজও করে দিতে হবে। মামলার যেন ঐ ব্ল্যাক-ম্যানির প্রসঙ্গটা না ওঠে।

—সেটা অন্তত্ব । এক লাখটাকা দশ টাকার নোটের ওয় ব্যাপে কেন এল  
একথা উঠবেই । ভাল কথা, বাকি এক লাখ কি আপনার কাছে ছিল ?

—হ্যাঁ স্ত্রী । সেটা আবার ঐ হোটেলের ভন্টেই বেখেছি ।

—পার্ক-হোটলেই উঠেছেন কেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ । অত টাকা নিয়ে আর কোথায় উঠব ? এবার ক্রম  
নম্বর 78 ।

—আর একটা কথা । ঠিক খুনের সময়, অর্থাৎ এগারো তারিখ রাত  
পৌনে আটটার আপনি আর মিষ্টার দাসগুপ্ত কে কোথায় ছিলেন ?

—দুজনেই মোকাম্বো রেস্তোঁরাতে খাচ্ছিলাম স্ত্রী ।

—মোকাম্বো ! কেন পার্ক-হোটেলের খানা কি পছন্দ হচ্ছিল না ?

—কী যে বলেন স্ত্রী ? আমি ছাঁ-পোবা গরীব মানুষ—ওলব খাবার কি  
চোখে দেখেছি কখনও ? এগারো তারিখ রাত্রে আমাদের নিমন্ত্রণ করে  
মোকাম্বোতে খাইয়েছিলেন ঐ বহুপতি সিজ্যানিয়া সাহেবের বড় ছেলে  
বহুপতিজী ।

—ওঁরা কে ?

—আজ্ঞে বড়কর্তার বাড়িটা বহুপতিজী তাঁর বড় ছেলের নামে কিনলেন ।  
ঐ এগারো তারিখের দুপুরেই রেজিস্ট্রি হল কিনা, তা আমি বললাম বহুপতিজী,  
অতবড় সম্পত্তি কিনলেন, আমাদের মিষ্টিমুখ করাবেন না ? উনি তৎক্ষণাৎ  
আমাদের মোকাম্বোতে নিমন্ত্রণ করলেন । আমরা সন্ধ্যা সাতটার ঐ  
রেস্তোঁরাতে বাই এবং রাত সাড়ে নয়টায় বার হয়ে আসি । আমরা তিনজনেই  
খেয়েছিলাম ।

—তিনজন বলতে আপনি, অগ্রিয় এবং ঐ বহুপতি সিজ্যানিয়া ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্ত্রী !

—তাহলে কেসটা অনেক সরল । বহুপতি সিজ্যানিয়া একজন নানকরা  
ধনী নিশ্চয়—

—নিশ্চয়, নিশ্চয়—বিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা ইনকাম-ট্যাক্স দেন !

—তাঁর সাক্ষীটা জোরালো হবে । ঠিক আছে, আমি এ-কেস নেব ।  
রিটেনারটা দিয়ে যান ।

—রিটেনার কি স্ত্রী ?

—অগ্রিয় পাঁচ হাজার টাকা ।

কেশিয়ান জীবনবাবু তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন । মাজার কথি আলগা করে  
একটা কোমরবন্ধ বার করে আনেন । পাঁচ খাক নোটের বাণ্ডিল নামিয়ে

রাখেন টেবিলে। বাসু-সাহেব টেলিকমে রানী দেবীকে ডাকলেন। অল্প পরেই হাইলুড-চেয়ারে মিসেস বাসু এসে উপস্থিত হলেন ঠিক ঘরে। বাসু বললেন, একে একটা পাঁচ হাজার টাকার রসিদ লিখে দাও। রসিদটা হবে মিস্টার সুপ্রিয় দাসগুপ্ত, ম্যানেজার, কাপাডিয়া এ্যাণ্ড কাপাডিয়া কোম্পানির নামে।

জীবন বিশ্বাস চমকে উঠে বললে, কেন শ্রাব ? টাকা দিচ্ছি আমি, রসিদ কেন ম্যানেজারের নামে হবে ?

— কারণ সুপ্রিয় দাসগুপ্তই আমার ক্লায়েন্ট। আপনি নন।

জীবন বিশ্বাস ক্রুদ্ধিত করে চুপ করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, তার মানে কি এটাই ধরে নেব শ্রাব, যে আপনি ইঙ্গিত করতে চাইছেন আপনার ক্লায়েন্টের স্বার্থে আপনি আমারও বিরুদ্ধাচারণ করতে পারেন ?

— না। ইঙ্গিত করছি না। স্পষ্টভাবে সে-কথা জানাচ্ছি। টাকা আপনি টেবিলে রেখেছেন। আমি তা নিইনি এখনও। ঐ সর্বোচ্চ আমি কাজটা হাতে নেব।

জীবন বিশ্বাস গৌজ হয়ে বসে রইলেন কয়েক সেকেন্ড। তারপর বললেন, ঠিক আছে, রাখলেও আপনি, মারলেও আপনি—

রানী দেবী বললেন, আসুন আপনি। রসিদটা নিয়ে যাবেন।

পরদিন রবিবার। সকালবেলা প্রাতঃরাশের টেবিলে বসেছিলেন বাসু-সাহেব স্নানাতা আর রানী দেবী। কৌশিক অল্পপস্থিত। স্নানাতাই এখন রান্নাঘরের হেপাভতে। হাঁপ ছেড়ে বৈচেছেন রানী দেবী। তার চেয়েও বড় কথা নিঃসজতাটার হাত থেকে বেহাই পেয়েছেন। অনেক—অনেকদিন পরে বাড়িটা কলমুগ্ন হয়ে উঠেছে।

স্নানাতা প্রশ্ন করে, আপনার ক্লায়েন্ট কী বলল শেষ পর্যন্ত ?

বাসু-সাহেব শনিবার বিকালেই হাজতে গিয়ে দেখা করেছিলেন সুপ্রিয়র সঙ্গে। জামিন দেওয়া হয়নি তাকে। কথাবার্তা বলে বাসু-সাহেবের মনে হয়েছে খুনের মামলায় সে বেচারি বেমক। জড়িয়ে পড়েছে। সুপ্রিয় দাসগুপ্ত বোম্বাইয়ের একটা নামকরা বাবসারী প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার। বিবাহিত। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাহাড়া সে কলকাতার সমাজের খবর বড় একটা রাখে না। প্রবাসী বাড়ালী। তার পক্ষে সাতদিনের জন্ত কলকাতায় এসে ডাকাতির দলে ভীড়ে পড়া একটা অবিখ্যাত ব্যাপার। যে ব্যাংকের মধ্যে বিডলভারটা পাওয়া গেছে ওটা সুপ্রিয় সঙ্গে করে আনেনি। স্নানাতা নিজেই

জ্ঞার সাক্ষী। হুজাত ডিক্লে-এর তরফে সাক্ষী দিলে হুজির এই অন্তরমনক-ভাবে ‘হ’ বলার অপরাধটা গুরুত্ব পাবে না। তাছাড়া হুজির অকটা অ্যালিভাই আছে। হুজর সাক্ষীর সঙ্গে সে মোকাযোতে মৈশ-মাহার করছিল ঠিক যে-সময়ে বড়বাজারে খুনটা সংঘটিত হয়। হুজর সাক্ষীর একজন অবশ্য ওরই অধীনস্থ কর্মচারী—কিন্তু দ্বিতীয়জন বিশিষ্ট নাগরিক।

রানী দেবী বলেন, তাহলে কাল থেকে এত কি ভাবছ তুমি?

—ভাবছি? হ্যাঁ ভাবছি অন্তরিক থেকে। দুটো কথা আমি ভাবছি। প্রথমত, ঐ মিস ডিক্লেজার ব্যাপারটা। মিস ডিক্লেজার নামটা তোমার মনে আছে হজাতা?

—অ’ছে। দার্জিলিং-এর খুনের কেসটার প্রসঙ্গে এক মিস ডিক্লেজারকে আমরা খুঁজছিলাম; কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

—কাবেস্তে। কিন্তু এটুকু বোঝা গিয়েছিল মেয়েটা নষ্ট-সভাবেব।

রানী দেবী বলেন, কিন্তু মিস ডিক্লেজার নামে কলকাতার কি একটাই মেয়ে আছে?

—না নেই। কিন্তু ঐ নামটা আমাকে কেমন খেন ভাবিয়ে তুলছে।

—আর আপনার দ্বিতীয় চিন্তার কারণ?

—মাইতি হঠাৎ এত উৎফুল্ল হয়ে উঠল কেন?

মিসেস বাহু বলেন, মাইতিটা কে?

বাহু-সাহেব বুঝিয়ে বলেন, নিরঞ্জন মাইতি হচ্ছেন পাবলিক প্রসিকিউটর। অর্থাৎ কোর্টে যখন কেস উঠবে তখন নিরঞ্জন মাইতি ওর বিরুদ্ধে সওয়াল করবেন, সরকার পক্ষে। মাইতি নাকি গতকাল বার-এ্যামোসিয়েশানের আড্ডায় বলেছেন, বাহু-সাহেব কেন যে এই বড়ো বয়সে তাঁর নিজের রেকর্ডটা ভাঙতে এলেন! বেচারি!

হুজাতা বলে, নিজের রেকর্ডটা ভাঙতে মানে?

বাহু জবাব দিলেন না। ছোড়া পোচের প্লটটা টেনে নিলেন।

রানী বললেন, উনি আজ পঞ্চস্ত কোনও কেসে হাবেননি। মানে, মার্ডার কেসে!

হুজাতা প্রশ্ন করে, সত্যি কথা বাহু-মামা?

প্রাণ করে ব্যারিস্টার বাহু বলেন, এ ফ্যাক্ট কান্ট বি ডিনায়েড! হ্যাঁ, ঘটনাটকে কোনও মার্ডার কেসেই আমি কখনও হাবিনি হুজাতা। তাই আমি শুধু ভাবছি, মাইতি ও কথা বলল কেন? সে নিশ্চয় এমন কিছু প্রমাণ পেয়েছে, এমন শাক্ষীর খোঁজ পেয়েছে যাতে কোর্টে আমাকে, হঠাৎ চমকে

দেবে । সেটা কেঁকা, তা আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছি না ! বাট হ'ল যাক  
বিহাতি, সামঝি আপ হিজ স্তিডস্ ।

মিসেস বাব প্রসক্তভাবে বাবার জন্ত বললেন, কৌশিকে কোথায়  
পাঠালে ?

—বাঁচি ।

—বাঁচিতে ? কেন ?

বাহু-সাহেব দাখিল করেন তাঁর যুক্তি । পার্ক-হোটেলের আটত্রিশ নম্বর  
ঘরের ঐ ভবনমহিলা আসলে কে, সেটা তাঁকে জানতে হবে । ঐ মেয়েটার  
লম্বা ছুতনে ছু-রকম কথা কেন বলেছে ।

—‘ছুতনে ছু-রকম কথা’ মানে ?

—জীবন বিশ্বাস বলেছে পাশের কামরায় ডি-সিল্ভাকে সে দেখেছে এবং  
ঐ মেয়েটির সঙ্গে সে স্থগ্নিয়কে কথা বলতেও দেখেছে । অঞ্চ স্থগ্নিয় সরাসরি  
অস্বীকার করেছে । পাশের ঘরের ঐ মেয়েটির অস্তিত্বই না কি সে জানে না ।

—কেসটা কবে কোর্টে উঠবে ?

—চার্জ ক্রেম করা হয়ে গেছে । প্রাথমিক শুনানিও । কেস উঠবে  
বৃহস্পতিবার ।

—এত তাড়াতাড়ি আপনি তৈরী হতে পারবেন ?

—তৈরী আমাকে হতেই হবে স্বজাতা । আমার মক্কেল আমিন পায়নি !

সোমবার সকালে বাহু-সাহেবের জুনিয়ার প্রজ্ঞাপ্ত নাথ এসে জানালো—  
জীবন বিশ্বাসকে সামন করা হয়েছে স্তার ; কিন্তু তার আগেই ওকে থানা থেকে  
ডেকে নিয়ে গিয়েছিল । সেখানে সে একটা এজাহার দিয়ে এসেছে—

—তাই নাকি ? তা এজাহারে কি বলেছে সে ?

—আমাদের কাছে যা বলেছে সেই সব কথাই । তবে ব্ল্যাক-মানির কথা  
স্বীকার করেনি ।

—অ্যালিবাই-এর কথা ?

—তা বলেছে । জীবনবাবু বললেন, থানা অফিসার ঐ মোকাব্বার  
চাপারে খুব বিস্তারিত প্রশ্ন করেছে । কখন ওরা আসেন, কখন যান—মায়  
কে কোন্ আইটেম খেয়েছেন তাও ।

—সব কথাই সে সত্যি বলেছে তো ?

—তাইতো বললেন আমাকে ।

—আর বৃহস্পতি লিম্বানিয়া ? তাকে সমন ধরানো হয়েছে তো ?

—না স্মার। তিনি মাড়ি ছেড়ে একেবারে নিরুদ্ধেশ।

—নিরুদ্ধেশ। মানে? কেউ জানে না তিনি কোথায়?

—আজ্ঞে না। আমার মনে হয় পাছে আদালতে ঐ দু-লাখ টাকা ব্যাক-মানির প্রসঙ্গটা উঠে পড়ে, তাই তিনি গা-ঢাকা দিয়েছেন।

বাহু-সাহেব বলেন, তবে তো কেসটা আবার কাঁচিয়ে গেল!

রাত্রে ট্রেনে কৌশিক ফিরে এল। রাঁচি থেকে সে জেনে এসেছে—মিস্টার ডি. সিল্ভাকে সত্যিই আট তারিখে ওখানকার মানসিক হাসপাতাল থেকে মুক্ত করা হয়। তাকে নিয়ে যায় তারই দিদি মিস্ ডি. সিল্ভা। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ মেয়েটির যে বর্ণনা দিয়েছেন, পার্ক-হোটেলের বোহারী হরিমোহনও তাই দিয়েছে। স্মরণ ওখানে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

—কিন্তু তাহলে সুপ্রিয় কেন তার অস্তিত্বটাই অস্বীকার করছে?

সন্ধ্যাবেলা গাড়িটা বার করে বাহু-সাহেব কৌশিককে নিয়ে চলে গেলেন চৌরঙ্গী অঞ্চলে। প্রথমে মোকাম্বো। সেখানে কিছুই হুবিধা হল না। না ওদের ম্যানেজার, না কোনও বোহারী—কেউই ধনবৃবের যত্নপতি সিভ্যানিয়াকে চেনে না। মেটাই স্বাভাবিক। এমন কত লক্ষপতি আছে কলকাতা শহরে যারা নিত্য মোকাম্বোতে এসে সন্ধ্যা আসর জমায়—খাচ্ছে আর পানীয়ে।

দ্বিতীয়ত পার্ক-হোটেল। এখানে হরিমোহন বরং কিছু খবর দিতে পারল। ই্যা, আটত্রিশ নম্বরের সেই মেম-সাহেবকে তার মনে আছে! তার পাগল ভাইকেও। না, সে চেষ্টামেচি কিছু করতে না। কেমন যেন জড়বুদ্ধি, ধন্দধরা মাছুষ। সবসময় গৌজ হয়ে বসে থাকত একটা চেয়ারে। মেমসাহেব তাকে নিয়ে দিব্যরাত্র একটা গাড়িতে করে ঘুরত। তার চিকিৎসা-ব্যবস্থার জন্তই হবে হয়তো। কবে তারা চলে যায়?—বারো তারিখ সকালে। ঠিক কখন তা সে জানে না। তখন সে ওখানে ছিল না। দারওয়ান বলতে পারে।

দারওয়ানকেও প্রশ্ন করা হল। তারও মনে আছে ওদের গ্রহান পর্বটা। সে ঐ মেমসাহেব বা সাহেবকে আগে দেখেনি। তবে মনে আছে এজন্য যে, সাহেবটাকে প্রায় ধরাধরি করে এনে গাড়িতে তোলা হয়েছিল। তখন দারওয়ান ভেবেছিল সাহেবটা মাতোয়ারা। পরে শুনেছে—না, সে পাগল।

—আর কিছু মনে পড়ছে না তোমার?

নগদ পাঁচ টাকা বকশিশ পেয়েছে দারওয়ান। অনেক চিন্তা করে বলল, আরও একটা কথা মনে পড়েছে স্মার। ঠিক বওনা হবার আগে ড্রাইভার মেমসাহেবকে বলেছিল, জি. টি. রোড খাবাপ আছে। আমরা দিল্লি রোড হয়ে বাই বরং।

—ট্যান্ডি না প্রাইভেট গাড়ি ?

—না সা'ব, প্রাইভেট গাড়ি ।

বাস্থ-সাহেব মানি ব্যাগ খুলে আরও পাঁচটা টাকা ওর হাতে দিয়ে বললেন, থ্যাঙ্ক !

গাড়িতে স্টার্ট দিলেন উনি । কৌশিক বললে, ব্যাপার কি ? আপনি যে আজ দাতাকর্ণ !

বাস্থ বোম্ব-কষায়িত নেত্রে একবার তাকালেন কৌশিকের দিকে । কোন কথা বললেন না । বাড়িতে ফিরে এসেও নয় । সোজা ঢুকে গেলেন নিজের ঘরে । ঘণ্টা-খানেক চুপচাপ বসে বাইরে গেলেন । তারপর বেরিয়ে এসে বললেন, স্বজাতা দুটো ট্রান্সকল বুক কর । একটা বোম্বাই । লাইটনিং কল । নম্বর এই নাও । পি. পি. মিস্টার সি. বরুয়া । দ্বিতীয়টা বর্ধমানের সদর থানার, ও. সি. । ওটাও পি. পি. এবং লাইটনিং । নাম নূপেন ঘোষাল । নম্বরটা 183 ডায়াল করে জেনে নাও ।

স্বজাতা ও'র থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে কোন প্রশ্ন করল না । এগিয়ে গেল টেলিফোনটার দিকে ।

দুটি লাইনই পাওয়া গেল অল্পকালের মধ্যে । প্রথমে এল বর্ধমান ।

রিসিভারটা তুলে বাস্থ-সাহেব বললেন, কে নূপেন ? আমি পি. কে. বাস্থ ; চিনতে পারছ ?...ই্যা, একটা উপকার করতে হবে । খোঁজ নিয়ে জানাও তো, যে, শুক্রবার বারো তারিখে বর্ধমানে সাম মিস্টার ডি. সিল্ভা এবং মিসেস্ ডি. সিল্ভা কোথায় উঠেছেন ।...না, না একটু শোন ডিটেলস্টা । মিস্টার সিল্ভার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ, লম্বা এক হারা । বিকৃতমস্তিষ্ক...ইয়েস, ম্যাড ! তার দিদি তাকে একটা কালো এ্যাসাসাডারে নিয়ে যায় বারো তারিখ, বেলা আটটায় । তার মানে এগারোটা নাগাদ ওরা বর্ধমানে পৌঁচেছে । চেক অল্ জ হোটেলস্, রেস্ট হাউসেস্, অ্যাণ্ড যু নো বেটার হোয়ার । ভাড়া বাড়িতেও উঠতে পারে । কালো রঙের এ্যাসাসাডারটাকে স্পট করার চেষ্টা কর বরং । ...কী ? না ! বর্ধমান ছেড়ে যায়নি । গেলেও কাছে পিঠে কোনখানে আছে...ইয়েস ! থবর পেলেই আমাকে জানাবে । থ্যাঙ্ক !

নূপেন ঘোষাল একটি বদলি সংক্রান্ত ব্যাপারে বাস্থ-সাহেবের কাছে প্রভুত-ভাবে উপকৃত । বেচারিকে ছ' মৌকায় পা দিয়ে চলতে হয়—সরকারী চাকরি আর ডিফেন্স কাউন্সেলার প্রতাপশালী ব্যারিস্টার পি. কে. বাস্থ ।

দ্বিতীয় ফোনটা ধরলেন বাস্থ-সাহেবের বোম্বাই প্রবাদী এক বন্ধু—চন্দ্রকান্ত বরুয়া । তাঁকে বললেন, একটু কষ্ট দিচ্ছি । বোম্বাইয়ের কাপাডিয়া অ্যাণ্ড

কাপড়ভরা কোম্পানিতে খোজ নিয়ে তাঁদের ম্যানেজার সুপ্রিয় দাসগুপ্তের জ্বর সঙ্গে গিয়ে দেখা কর। বেচারি বোধহয় এখনও জানে না, তার স্বামী কলকাতায় এসে একটা বিল্লী মামলায় জড়িয়ে পড়েছে।...কী? না, মার্ডার চার্জ! তোমাকেই বললাম ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝাতে। তুমি মেয়েটাকে মার্ডার-চার্জের কথা বল না। আমার নাম করে বল, তার সাক্ষী খুব জরুরী দরকার। সে খেন নেক্সট এ্যাভেইলেবল্ প্লেনে ক'লকাতা চলে আসে। প্যাসেজ-মানি তার কাছে যদি না থাকে, তুমি আমার হয়ে দিয়ে দেবে। মেয়েটি যদি পারে তবে এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিয়ে খেন সোজা আমার বাড়িতে চলে আসে। যদি পার, তবে ওকে প্লেনে তুলে দিয়ে তুমি আমাকে একটা ফোন কর।...ইয়েস্, ইয়েস্...অল রাইট ইজ মাইন! চিয়্যাবিও!

## পাঁচ

বৃহস্পতিবার সকাল। প্রতিবাদী সুপ্রিয় দাসগুপ্তের আজ প্রাথমিক হিয়ারিং হবে। বাসু-সাহেব আর সুজাতা তৈরী হয়ে নিল। সুজাতা প্রতিবাদী পক্ষের সমন পেয়েছে। প্রত্যেক নাথ সরাঙ্গরি কোর্টে যাবে। ওরা বওনা হতে যাবেন এমন সময় বেজে উঠল টেলিফোনটা। বাসু-সাহেব ধরলেন।

ফোন করছেন প্রবীণ ব্যারিস্টার এ. কে. রে। এখন বয়স আশির কোঠায়। ত্রিশ বছর হল তিনি প্র্যাকটিস্ ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর আয়লে রে-সাহেব ছিলেন ক'লকাতার সবচেয়ে নামকরা ক্রিমিনাল ব্যারিস্টার। ব্যারিস্টার-মহলে তাঁকে বলা হত 'বারওয়াল দ্য সেকেন্ড'। 'বারওয়াল' ছিলেন কলকাতা বারের বিখ্যাত শেষ ইংরাজ ব্যারিস্টার। পি. কে. বাসু প্রথম ঘোবনে এঁর কাজেই জুনিয়ার হিসাবে কাজ শিখেছেন, ব্যারিস্টারী পড়তে যাবার আগে। রে-সাহেব ওঁকে শুভেচ্ছা জানালেন, বললেন, অনেক অনেকদিন পর কোর্টে বের হচ্ছে, তাই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বাসু বললেন, শুভেচ্ছা কেন স্যার? বলুন আশীর্বাদ!

—বেশ আশীর্বাদই। কিন্তু একটা কথা, বাসু। গতকাল নিরঞ্জন ম্যুইতি হঠাৎ আমার কাছে এসেছিল। আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে গেল আজ কোর্টে উপস্থিত থাকতে। আমি তো আজ বিশ-ত্রিশ বছর কোর্টে যাইনি। হঠাৎ এ নিমন্ত্রণটা হল কেন বল তো?

—জানি না। আন্দাজ করতে পারি। সে কী বলল?

—বলল, অনেকদিন পর আপনার শিষ্য আজ সওয়াল করছে, আপনি



আসবেন স্তার। আমি নিমন্ত্রণ করতে এসেছি! কিন্তু ওর মুখ চোখ দেখে  
আমার মনে হল, মানে...

—আপনার দৃষ্টি ভুল করে না, স্তার। আপনি ঠিকই ভেবেছেন—মাইতি  
বার এসোসিয়েশানেও বলে এসেছে এই কেস-এ সে আমার রেকর্ড ভাঙবে!  
অর্থাৎ অ্যাকিউসড-এর কন্ডিকশান হবে!

—কেসটা কী? তিনশ দুই?

—ইয়েস্ স্তার!

—কী বুঝছ? কেসটা কী খারাপ?

—ফিফ্টি-ফিফ্টি! কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে, মাইতি এমন কিছু  
এভিডেন্স পেয়েছে যার কোন হদিসই আমি এখনও পাইনি—হি হ্যাজ্  
সামথিং আপ হিজ্ স্লিভস! কোর্ট-এর ভিতর ড্রামাটিক্যালি সেটা সে পেশ  
করতে চায়—তাতেই আপনাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করছে।

—আমারও তাই মনে হয়। এনি ওয়ে—যদি প্রয়োজন মনে কর তাহলে  
কোর্ট থেকে ফেরার পথে আমার সঙ্গে কনসাল্ট কর। তারপর একটু ইতস্তত  
করে বললেন, যু ক্যান ওয়েল অ্যাপ্রিশিয়েট, বাস্—আই জাস্ট ক্যান্ট অ্যাফোর্ড  
টু সি মাই হিদারটু আনভিফিটেড কোলীগ—

—কোলীগ নয় স্যার, শিশু বলুন!

—ওয়েল মাই বয়! শিশুই।...যাক্ তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। বেস্ট  
অফ ল্যাক্!

প্রবীণ গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে বাস্-সাহেব যখন কোর্টে এসে উপস্থিত হলেন  
তখন কোর্ট বসেছে। আদালতে তিলধারণের স্থান নেই। ব্যারিস্টার পি.  
কে. বাস্ নতুন করে প্র্যাকটিস্ শুরু করছেন এ-খবর আইনজীবী মহলে ছড়িয়ে  
পড়েছে। বার এসোসিয়েশান ভেঙে পড়েছে। দর্শকদের আসন অনেক  
আগেই পূর্ণ হয়ে গেছে। অনেকে দেওয়াল ঘেঁষে মার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।  
কিছু প্রেসের লোকও এসেছে। কোর্ট থেকে তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে  
যেন আদালত চলা কালে কোন ফটো তোলা না হয়।

বিচক্ষণ বিচারক জাস্টিস্ সদানন্দ ভাট্টা নিজের আসনে এসে বসলেন।  
জুরির মাধ্যমে আজকাল আর বিচার হয় না। জুরি নেই। একটু নিচের  
ধাপে বসে আছে দুজন কোর্ট পেশকার। প্রথা-মাকিক বাদী ও প্রতিবাদী  
প্রস্তুত আছেন কিনা জেনে নিয়ে বিচারক বিচার আরম্ভ ঘোষণা করলেন।  
পাবলিক প্রসিকিউটার বিশালায়তন প্রবীণ আইনজীবী নিরঞ্জন মাইতির দিকে  
ডাকিয়ে বললেন, প্রারম্ভিক ভাষণ?

মাইতি খুশিতে ডগমগ। উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করে বললেন, আদালত যদি অহুমতি দেন, আমি একটি সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক ভাষণ দিতে ইচ্ছুক। আমরা আশা রাখি যে, আমরা প্রমাণ করব—আসামী স্বেপ্রিয় দাসগুপ্ত গত এগারোই এপ্রিল, বৃহস্পতিবার, রাত প্রায় পৌনে আটটার সময় বড়বাজারে মিস্টার এম. পি. জৈনের গদীতে আরও তিনটি সঙ্গীর সঙ্গে অনধিকার প্রবেশ করে, আমরা প্রমাণ করব যে, সে ভয় দেখিয়ে ঐ দোকানের কেশিয়ার স্কুমার বস্তুর কাছ থেকে নগদ ষাট হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় এবং মিস্টার এম. পি. জৈনের নিজের রিভলভারটি তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাঁকে গুলি বিদ্ধ করে হত্যা করে। আমরা আশা রাখি, আসামী স্বেপ্রিয় দাসগুপ্তের বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশ, ডাকাতি, আনলাইসেন্সড্ রিভলভার রাখা ও হত্যার অপরাধ প্রমাণিত হবে। এবং আমরা আশা রাখি, মহামাজ্ঞ আদালত এ ক্ষেত্রে আসামীর প্রতি চরমতম দণ্ড বিধান করবেন!

এই কথা বলেই নিরঞ্জন মাইতি আসন গ্রহণ করলেন। উকিল মহলে একটা গুঞ্জন উঠল। পি. পি. নিরঞ্জন মাইতিও শুরুতেই একটি রেকর্ড করলেন! এত সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক ভাষণ নাকি তিনি জীবনে দেননি।

জজ-সাহেবও বোধকরি এটা আশা করেননি। মাইতি শেষ করার পরেও তিনি আশা করেছিলেন, মাইতি বুঝি আবার উঠে কিছু বলবেন। মাইতি সহাই উঠলেন আবার। হেসে বললেন, টাটস্ অল মি' লর্ড!

জাস্টিস্ ভাহুড়ী এবার প্রতিবাদী আইনজীবীদের দিকে ফিরলেন। পাশাপাশি বসে আছেন ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু এবং তাঁর সহকারী প্রজ্যোৎ নাথ। জাস্টিস্ ভাহুড়ী বললেন, এবার আপনারা প্রারম্ভিক ভাষণ দিতে পারেন।

বাসু-সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। কিছু একটা বলতে গেলেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল আদালতের প্রবেশদ্বারের দিকে। চমকে উঠলেন উনি। সংক্ষেপে বিচারককে বললেন, টাটস্ অল মি' লর্ড! আমি কোন প্রারম্ভিক ভাষণ দেব না!

বিচারকের দিকে একটি বাও করে বাসু-সাহেব তাঁর আসন ছেড়ে এগিয়ে গেলেন দ্বারের দিকে। শুভ্রকেশ অতি বুদ্ধ এ. কে. রে লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে এগিয়ে আসছিলেন। তাঁর হাতটা ধরলেন। হাসলেন রে সাহেব। বাসু ঠুকে নিয়ে এসে বসালেন নিজ আসনের পাশে। বুদ্ধ এ. কে. রে স্থির থাকতে পারেননি। এসে উপস্থিত হয়েছেন আদালতে। কোর্টে একটা গুঞ্জন উঠল। জুনিয়র উকিল খাঁরা এ. কে. রে-র নাম শুনেছে, কিন্তু গোখে দেখেনি, তারা দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে দেখতে চায়। জাস্টিস্ ভাহুড়ী তাঁর

হাতুড়িটা টুকলেন। এ. কে. রে বিচারককে একটা বাও করে আসন গ্রহণ করলেন। বিচারক ভাতুড়ীও হাত নেড়ে প্রত্যভিধান করলেন হেসে।

জজ-সাহেব মাইতিকে বললেন, আপনি প্রথম সাক্ষীকে ডাকতে পারেন।

প্রথম সাক্ষী : ডাঃ রামকুমার অধিকারী।

রামকুমার যথারীতি শপথ নিয়ে সাক্ষীর মঞ্চ থেকে তাঁর নাম, পরিচয়, পেশা ইত্যাদি জানালেন মাইতি মশায়ের প্রশ্নের উত্তরে। স্বীকার করলেন, তাঁর ডিস্‌পেনসারি ঐ জৈন-সাহেবের গদীর কাছেই। ঘটনার দিন রাত আটটা বেজে তিন মিনিটে একজন লোক ছুটে এসে বলে জৈন-সাহেব গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। শুনেই তিনি দেখতে যান। গুর ডাক্তারখানা থেকে যেতে গুর আন্দাজ ছ' মিনিট লাগে। স্ততরাং আটটা পাঁচ মিনিটে তিনি প্রথমে জৈন-সাহেব এবং পরে দারোগানকে পরীক্ষা করেন। জৈন মারা গেছেন, আর দারোগানের বাঁ-কাঁধে গুলি বিদ্ধ হয়েছে। দ্বিতীয়জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে তিনি জানতে চান যে, পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে কি না। ভীড়ের মধ্যে একজন, কে তা তিনি বলতে পারবেন না—জানায় যে, থানা এবং অ্যাথুলেন্সে ফোন করা হয়েছে। মিনিট দশেকের ভিতরেই অ্যাথুলেন্স এসে যায়, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিশও।

মাইতি প্রশ্ন করেন, মিস্টার জৈন কখন মারা গেছেন বলে আপনার বিশ্বাস?

—এগার তারিখ রাত আটটা পাঁচ মিনিটের আগে।

—না না, কত আগে? রাত আটটা পাঁচ মিনিটে তাঁকে যখন মৃত অবস্থায় দেখেছেন তখন ও-জবাব আমি চাইছি না।

দেখা গেল রামকুমার অত্যন্ত সতর্ক সাক্ষী। জবাবে বললেন, কত আগে তা অটোপ্সি সার্জেন বলতে পারেন। আমি মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিনি।

মাইতি বিরক্ত হয়ে বলেন, কী আশ্চর্য! আপনার পাশের দোকানে ডাকাতি হল, চৌচামেচি হল, গুলির আওয়াজ হল—

—গুলির আওয়াজ স্বকর্ণে শুনেছি, একথা আমি বলিনি।

—তা শোনেননি, কিন্তু হৈ-২৫ চৌচামেচি তো শুনেছেন?

—শুনেছি। কিন্তু সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে যদি বিশেষজ্ঞ হিসাবে আমি বলি যে, মৃত্যু রাত পৌনে আটটার পরে হয়েছে তবে ঐ উনি কোটের মধ্যে আমার প্যান্টলুন খুলে নেবেন! শুঁকে আমি চিনি—

সাক্ষী ডিফেন্স-কাউন্সিলার পি. কে. বাহুকে ইঙ্গিত করেন। বাহু-সাহেব তখন একদৃষ্টে একটা নথি পড়ছিলেন। চোখ তুলে দেখলেন না।

কোর্টে একটা মুহূ হাস্যরোল উঠতেই জাস্টিস্ ভাহুড়ী তাঁর হাতুড়ি পিটলেন। বিচারক সাক্ষীকে বললেন, আপনি অবাস্তব কথা বলবেন না। প্রশ্নের যা রেশ উত্তর তার মধ্যেই সীমিত রাখুন।

মাইতি বললেন, ছাট্‌স্ অল মি' লর্ড।

বাস্থ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, নো ক্রশ এক্সামিনেশান।

এবার সাক্ষীর মধ্যে উঠে দাঁড়ালেন সরকারপক্ষের দ্বিতীয় সাক্ষী অটোপ্লি-সার্জেন ডাঃ অতুলকৃষ্ণ সাত্তাল। তিনিও তাঁর পরিচয় ইত্যাদি দিয়ে স্বীকার করলেন, মৃত মিষ্টার জৈনের শবদেহ তিনি ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। সীসার গোলকটি মৃতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাজরের মাঝামাঝি অংশ দিয়ে হৃদপিণ্ডে প্রবেশ করে, ঠিক যেখানে 'স্পিরিয়ার ভেনা কাভা' এবং দক্ষিণ দিকস্থ 'পালমোনারি আর্টারি' এসে পড়েছে হৃদপিণ্ডের দক্ষিণ আর্টিয়ামে। ফলে দক্ষিণ আর্টিয়াম বিদ্ধ হয়, তারপর ঐ স্পিরিয়ার ভেনা কাভাকে ফুটো করে এবং দক্ষিণ পালমোনারি আর্টারিয়ার উপর দিকের ধমনীটি বিচ্ছিন্ন করে সীসার গোলকটি পিঠের দিকে চলে যায়। শিরদাঁড়ার একাদশতম খোরাসিক ভার্টিব্রাতে আহত হয়ে সেটা হৃদপিণ্ড অঞ্চলেই আটকে থাকে। যেহেতু 'স্পিরিয়ার ভেনা কাভা' এবং হৃদপিণ্ডের আর্টিয়াম মানবদেহে অতি আবশ্যিক প্রত্যঙ্গ—যাকে বলে ভাইটাল-অর্গান, তাই কয়েক মিনিটের ভিতরেই গুলি-বিদ্ধ জৈনের মৃত্যু হয়েছিল বলে তাঁর বিবাস।

মাইতি প্রশ্ন করেন, আপনি যা বললেন তা থেকে বোঝা যাচ্ছে গুলিটা জমির সমান্তরালে যায়নি, ক্রমশঃ উচু থেকে নিচু দিকে গিয়েছে। তাই নয় ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বুকের যেখান দিয়ে ঢুকেছে এবং পিঠের যেখানে আটকেছে এতে গুলিটা কতখানি নেমেছে ?

—পাঁচ সেন্টিমিটার অর্থাৎ প্রায় দু-ইঞ্চি।

—এ-থেকে কি আপনার ধারণা যে-লোকটা গুলি করেছে, সে মৃত ব্যক্তির চেয়ে উচ্চতায় বেশি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনার উত্তরের সাধারণ-বোধ্য একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিন—

ডাক্তার সাত্তাল মনে হয় এ প্রশ্নের জ্ঞাত প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। আদালতের অল্পমতি নিয়ে তিনি মানব-কঙ্কালের একটি বড় চার্ট পিছনের দেওয়ালে টাঙিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। লম্বা একটা লাঠি দিয়ে দেখালেন ঠিক

কোন স্থানে গুলিটা বৃকে প্রবেশ করেছে এবং কোন্ অস্থিতে আটকে ছিল।  
উনি বললেন, মাতৃষে সচরাচর গুলি করে নিজের বৃকের সমতলে দ্বিভলভারটা  
ধরে। ফলে আহত ব্যক্তির ঠিক বৃকেই যদি গুলি বিদ্ধ হয় এবং দেখা যায়  
সেটা ক্রমশঃ নিচের দিকে নেমেছে তবে আন্দাজ করতে পারা যায় হত্যাকারীর  
উচ্চতা আহতের চেয়ে বেশী ছিল।

—মিস্টার জৈন-এর উচ্চতা কত ছিল ?

—ঠিক পাঁচ ফুট।

—আপনার হিসাবমত আততায়ীর উচ্চতা কত হবে ?

—তা ঠিক করে বলা শক্ত। তবে আন্দাজে বলা যায়, সাড়ে পাঁচ ফুটের  
উপরে তো বটেই।

—আমার জেরা এখানেই শেষ—বসে পড়েন মাইতি।

ব্যারিস্টার বাসু জেরা করতে উঠে দাঁড়ালেন। প্রথমেই প্রশ্ন করলেন,  
আচ্ছা ডক্টর সানিয়াল—ঐ যে বললেন, আপনার মতে আততায়ীর উচ্চতা  
আহত জৈন-এর চেয়ে বেশী ছিল—এটা আপনার আন্দাজ, বিশ্বাস, না স্থির-  
সিদ্ধান্ত।

—না, স্থির সিদ্ধান্ত নয়, আবার আন্দাজও নয়—ওটা আমার যুক্তি-  
নির্ভর অনুমান !

—আই সী ! যুক্তি-নির্ভর অনুমান ! কী যুক্তি ?

—তাই তো আমি বোঝালাম এতক্ষণ।

—আমি বুঝিনি।

—সেটা আমার দুর্ভাগ্য ! আমি চেষ্টার ক্রটি করিনি।

—তা বললে তো চলবে না ডক্টর সানিয়াল। আপনি মানবদেহ সম্বন্ধে  
একজন বিশেষজ্ঞ ; কিন্তু আমি শারীর-বিজ্ঞান কিছু জানি না। আমাদের  
বোধগম্য ভাষায় আপনাকে বুঝিয়ে দিতে হবে বইকি। আচ্ছা, আমি  
একে একে প্রশ্ন করি। আমাদের বুঝিয়ে দিন।—ধরুন গুলি করার  
মুহূর্তে যদি আততায়ী বা আহতের মধ্যে একজন বসে থাকত অথবা কুঁজো  
হয়ে দাঁড়াত তাহলে আপনার যুক্তিনির্ভর অনুমানটা টেকে না,  
কেমন ?

—না, টেকে না।

—আততায়ী যদি তার নিজের বৃকের সমতলে দ্বিভলভারটা না ধরে  
তাহলেও ও-যুক্তি টেকে না ? কারেক্ট ?

—ইয়েস !

—আপনি জানেন যে, আয়রন সেক্টর পৌছতে গেলে দুটি ধাপ উঠতে হয়। সেক্ষেত্রে আততায়ী যদি সেই সিঁড়ির উপর থেকে গুলি ছুঁড়ে থাকে তবে বামন হওয়া সম্ভব ও গুলি ঐ ভাবে মৃতের দেহে ঢুকতে পারত। এ্যাম আই কারেক্ট ?

একটু ইতস্তত করে সাক্ষী বলেন, কারেক্ট !

—তা সম্ভব ও আপনি মনে করেন আপনার ঐ সিদ্ধান্ত যুক্তি-নির্ভর অহুমান ?

—ও-গুলো তো এক্সেপশান কেস !

—এক্সেপশান! আপনি তো বিজ্ঞান-শিক্ষিত! পার্মুটেশান কনফিগেশান অফ নিশ্চয় কয়েকজন! বলুন—হুজেন লোক আছে। একজন আততায়ী একজন আহত : তাদের চারটি অবস্থা হতে পারে—শোয়া, বসা, দাঁড়ানো এবং কুঁজো হয়ে দাঁড়ানো। এক্ষেত্রে হুজেনের সমান হয়ে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা কত পার্সেন্ট ?

মাইতি উঠে দাঁড়ান, অবজেকশান য়োর অনার ! সাক্ষী একজন শারীর-বিদ্যা বিশারদ। অঙ্কশাস্ত্রের পণ্ডিত নন ! এ প্রশ্ন অবৈধ।

বাস্তব-সাহেব বলে ওঠেন, এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে অঙ্ক ব্যাংলার হবার দরকার নেই। ইন্টারমিডিয়েটে অঙ্ক না থাকলে ডাক্তারী কলেজে ভর্তি হওয়া যেত না। যে প্রশ্ন আমি করেছি, উনি যখন পাশ করেছেন তখন তা অ.ই.এস. সি-তে কথানো হত। এই রুডিমেন্টাল অঙ্ক উনি ভুলে গিয়ে না থাকলে ঠর বলা উচিত, মাত্র ০.২৫ পার্সেন্ট !

জাস্টিস্ ভাহুড়ী বলেন, অবজেকশান ওভারকুলড !

সাক্ষী ক্রমাল দিয়ে মুখটা মুছে বললেন, খাতা পেন্সিল ছাড়া ওটা আমি কবে বার করতে পারব না। তবে মনে হয় শতকরা দশ পার্সেন্টের কম !

—যে পার্সেন্টেজটা এখন বলছেন, সেটা আপনার আন্দাজ, স্থির সিদ্ধান্ত না যুক্তি-নির্ভর অহুমান ?

—আন্দাজ !

—ঠিক আছে ! অঙ্কশাস্ত্র থাক। ডাক্তারী প্রশ্নেরই জবাব দিন। খোরাসিক অথবা ডর্গাল ভার্টিব্রার সংখ্যা বারোটা—এ্যাম আই কারেক্ট ?

—ইয়েস।

—একাদশতম খোরাসিক ভার্টিব্রার অবস্থান প্রায় নাভিকুণ্ডের সম-উচ্চতায় ? এ্যাম আই কারেক্ট ?

—আমি তখন একাদশতম খোরাসিক ভার্টিব্রার কথা বলিনি, স্পাইনাল-কলামের একাদশতম অস্থির—

বাধা দিয়ে বাস্ক বলেন, আনসার মি! একাদশতম খোরাসিক ভাটিব্রার অবস্থান প্রায় নাজিকুণ্ডের সম-উচ্চতায়? ইয়েস আর নো?

—কী আশ্চর্য! আমি তখন—

—আই আস্ক ফর ডা থার্ড টাইম—একাদশতম খোরাসিক ভাটিব্রার—প্রশ্নটা শেষ করতে দেন না সাক্ষী। তার আগেই বলেন, ইয়েস।

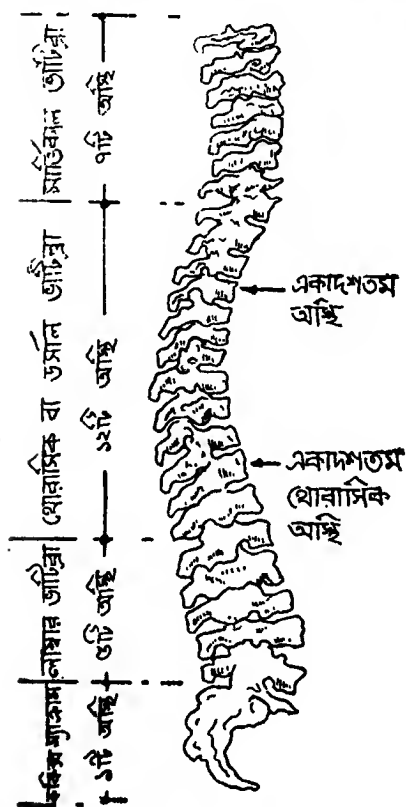
—আহতের বৃকে যেখানে গুলি লেগেছে সেখান থেকে তার একাদশতম খোরাসিক অস্থির অবস্থিতি—সোজা হয়ে দাঁড়ালে—অন্তত এক ফুট নিচে! ঠিক কথা?

—কিন্তু আমি তা—

—বড় বাজে কথা বলছেন আপনি! বলুন—‘হ্যাঁ’, না ‘না’!

—ইয়েস!

—আপনার যুক্তি-নির্ভর থিয়োরি অলুয়ায়ী—অর্থাৎ ঐ 6-25 পার্সেন্ট সম্ভাবনা যদি কোনক্রমে কার্যকরী হয়, আই মীন হুজনেই যদি খাড়া হয়ে



দাঁড়ায়! এবং আততায়ী তার বৃকের নেভেল থেকে গুলি করে, সে ক্ষেত্রে আততায়ীর উচ্চতা দশ থেকে বারো ফুট হওয়া উচিত? বলুন—‘হ্যাঁ’, না ‘না’?

মরিয়া হয়ে সাক্ষী বলেন, আপনি শুধু শুধু ব্যাপারটা গুলিয়ে দিচ্ছেন। আমি একাদশ খোরাসিক ভাটিব্রার কথা আদৌ বলিনি—

বাস্ক-সাহেব হাত তুলে সাক্ষীকে থামতে বলেন। জজ-সাহেবকে বলেন, মহামাত্ত আদালতকে অলুয়োধ করছি, সাক্ষীর জবানবন্দীর ঐ অংশ ঠিক পড়ে শোনানো হোক—ঐ যেখানে উনি সীসার গোলকটা শব্দ-ব্যবচ্ছেদের সময় পেয়েছেন।—বাস্কসাহেব বসে

পড়েন ক্রমাল দিয়ে চশমার কাচটা মোছেন

বিচারকের অহুমতি অহুসারে কোর্ট পেশ্কার পড়ে শোনায়, “ফলে দক্ষিণ আর্টিগ্যাম বিদ্ধ হয়, তারপর ঐ স্থপিরিয়ার ভেনা কাভাকে ফুটো করে এবং দক্ষিণ পালিমোনারি আর্টারিভয়ের উপর দিকের ধমনীটি বিচ্ছিন্ন করে সীসার গোলকটি পিঠের দিকে চলে যায়। শিরদাঁড়ার একাদশতম খোরাসিক ভার্টি-ব্রাতে আহত হয়ে সেটা হৃৎপিণ্ড অঞ্চলেই আটকে থাকে।”

জবানবন্দী পাঠ শেষ হতেই তড়াক করে উঠে দাঁড়ান বাস্ত-সাহেব—  
নাউ আনসার মি! আপনার যুক্তি-নির্ভর মনুমান মতো আততায়ীর উচ্চতা দশ থেকে বারো ফুট হওয়া উচিত?

মাইতি আপত্তি জানান, বলেন, সাক্ষী ইতিপূর্বে একাদশ খোরাসিক ভার্টিব্রার কথা মোটেই বলতে চান নি। শিরদাঁড়ার একাদশতম অস্থির কথা বলতে চেয়েছেন। শিরদাঁড়ার উপর দিকের প্রথম সাতটি অস্থি খোরাসিক নয়।

বাস্ত-সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বিচারককে বলেন, মাননীয় সহযোগী যদি নিজেকেই বিশেষজ্ঞ হিসাবে দাবী করেন তবে তাঁকেই জেব্বা করবার অহুমতি চাইছি— *on voir dire*!

কোর্টে একটা হাস্যরোল গুঠে।

জাস্টিস ভাহুড়ী গম্ভীর হয়ে বলেন, আদালত এসব ব্যঙ্গোক্তি পছন্দ করেন না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ডিফেন্স কাউন্সেলের সঙ্গে আমি একমত। সাক্ষী কী বলতে চান তার ব্যাখ্যা আমরা বাদীপক্ষের উকিলের কাছে শুনতে চাই না, বিশেষজ্ঞ হিসাবে তিনি কী বলেছেন তা আমরা শুনেছি। মিস্টার ডিফেন্স কাউন্সেলার, যু মে প্রসীড—

—আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। আমি মাননীয় আদালতকে এই সিদ্ধান্তেই আসতে বলব, যে সাক্ষী শুধু অংশাংশ নয়, ডাক্তারী শাস্ত্র বিষয়েও বিশেষজ্ঞ হিসাবে দাবী করতে পারেন না। স্পাইনাল কর্ডের একাদশতম অস্থিকে যিনি অষ্টাদশতম অস্থি বলতে পারেন তাঁর পক্ষে কার্ট এম. বি. পাশ করাও অসম্ভব!

জাস্টিস ভাহুড়ী কঠিনস্বরে বলেন, আদালত কোন সিদ্ধান্তে আসবেন সেটা আদালতের বিচার!

—আই এগ্রি, মি’ লর্ড! কিন্তু একথাও আমি আদালতকে ভেবে দেখতে বলব যে, বিশেষজ্ঞ হিসাবে সাক্ষী যে বলেছেন আততায়ীর উচ্চতা পাঁচ ফুটের চেয়ে বেশি তার কোন যুক্তি নেই।

জাস্টিস ভাহুড়ী একটু বিরক্ত হয়েই বলেন, মিস্টার পি. পি. আপনার পরবর্তী সাক্ষীকে ডাকুন।



পরবর্তী সাক্ষী ব্যালাস্টিক এক্সপার্ট জীতেন বসাক। তিনি তাঁর সাক্ষ্যে এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত করলেন যে, এ. পি জৈনের মৃত্যু হয়েছে যে গুলিতে সেটা ৩৪ বোর রিভলভারের। জৈনের নিজের রিভলভারটি ছিল ঐ বোয়ের শাস্ত্রবি কোম্পানির; তার নম্বর 759362 এবং আসামীর নামে রিসার্চকরা ক্যুপে থেকে যে রিভলভারটি আবিষ্কৃত হয়েছে সেটারও ঐ বোর এবং ঐ নম্বর। অর্থাৎ সেটা জৈনের রিভলভার। রিভলভারটি পিপল'স একজিবিট হিসাবে চিহ্নিত হল।

বাসু-সাহেব তাঁকে কোনও প্রশ্ন করলেন না।

প্রত্যাহত নাথ জনাস্থিতে তাঁকে বলে, ব্যালাস্টিক এক্সপার্টকে ক্রশ করবেন না?

বাসু নিম্নস্বরে বললেন, পণ্ডিত! লোকটা আশ্চর্য সত্যি কথা বলছে!

পাশে বসেছিলেন এ. কে. রে। তিনি শুধু বললেন, কারেক্ট!

চতুর্থ সাক্ষী জৈনের কেশিয়ার হুকুমার বসু। মাইতির প্রশ্নে সে নিজের নাম, ধাম, পরিচয় দিয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যারাত্রে মটনার একটি নিখুঁত বিবরণ দিল। বলল, তিনজন ডাকাতেরই মুখে কমাল বাঁধা ছিল। তাদের চোখ দেখা যাচ্ছিল। মাইতি প্রশ্ন করেন, যে লোকটা গুলি করেছিল তাকে আপনি দেখেছেন?

—নিশ্চয়ই! আমার চোখের সামনেই তো সে গুলি করল।

—তার আকৃতির একটা বর্ণনা দিন।

সাক্ষী আসামীর দিকে তাকিয়ে বললে, উচ্চতা পাঁচফুট দশ ইঞ্চি হবে; একহারা ফর্সা—

—ওদিকে কি দেখেছেন? যিনি প্রশ্ন করেছেন তাঁর দিকে তাকান—বাঁধা দেন বাসু-সাহেব!

সাক্ষী খতমত খেয়ে যায়। আসামীর দিকে আর তাকায় না। বলে, বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ, বড় বড় জুলফি ছিল, চোখে কালো চশমা—

মাইতি ওকে ভরসা দিয়ে বলেন, আমার দিকে কেন? ওদিকেই তাকিয়ে দেখুন। আপনার কি মনে হয়, আততায়ীর চেহারার সঙ্গে আসামীর চেহারার সাদৃশ্য আছে?

—আছে।

—কি সাদৃশ্য?

—হুজনের উচ্চতা এক, বয়স এক, হুজনেই ফর্সা এবং হুজনেরই বড় বড় জুলফি আছে।

—আপনার কি অনুমান আসামীরই সেই আততায়ী?

—অবজেক্শান য়োর অনার! সাক্ষী তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথাই বলতে পারেন। তাঁর অহুমান কোন এভিডেন্স নয়।

মাইতি হেসে বলেন, আচ্ছা আমি প্রশ্নটা অন্যভাবে করছি—আপনি আততায়ীকে প্রত্যক্ষ করেছেন, আসামীকেও প্রত্যক্ষ করেছেন। এখন বলুন, দুজনের আকৃতি কি একই রকম?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—সব চেয়ে বেশী সাদৃশ্য কোথায় লক্ষ্য করেছেন?

—ঐ বড় বড় জুলফি।

—যু মে ক্রশ এক্সামিন—বাস্তকে অহুমতি দিয়ে আসন গ্রহণ করেন মাইতি।

বাস্ত প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন। স্কুয়ারবাবু, আপনার নিজের ‘হাইট’ কত?

প্রথম প্রশ্নেই আপত্তি জানালেন পি. পি। এ প্রশ্ন নাকি অবৈধ। সাক্ষীর উচ্চতার সঙ্গে মামলার কোন সম্পর্ক নাকি নেই। বাস্ত জজ-মাহেবকে বললেন, য়োর অনার, সাক্ষীকে দিয়ে বলাতে চাইছি যে, তাঁর নিজের উচ্চতাও ঐ পাঁচ-ফুট দশ ইঞ্চির কাছে, তিনিও একহারা, হোয়াইটেক্স মাথলে তিনিও আসামীর মত ফর্সা হয়ে যাবেন এবং তাঁর নিজেরও বড় বড় জুলফি আছে! অর্থাৎ আসামীর মধ্যে যদি আসামীর পরিবর্তে একটি প্রমাণ সাইজ অগ্ননা থাকত তাহলেও তাঁর জবাব এক রকমই হত! যাই হোক, সহযোগী যখন আপত্তি করেছেন তখন আমি না হয় অন্য প্রশ্ন করছি। বলুন, স্কুয়ারবাবু—আপনি এখনই বলেছেন আসামীকে আততায়ীরূপে চিহ্নিত করার সবচেয়ে বড় যুক্তি হচ্ছে তার বড় বড় জুলফি। তাই নয়?

—হ্যাঁ, তাই বলেছি।

—আপনি কেন অতবড় জুলফি রেখেছেন?

—অবজেক্শান য়োর অনার! ইররেলিভ্যান্ট...

বিচারক বললেন, অবজেক্শান শাসটেনড্।

বাস্ত হেসে বলেন, বড় বড় জুলফি রাখা আজকের দিনে একটা ফ্যাশান, তাই নয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই তো দেখতে পাই।

—তাহলে শিকারী বিড়ালকে যেমন গৌফ দেখে চেনা যায়, মানুষ শিকারীকে তেমনি জুলফি দেখে চেনা যায় না?

মাইতি আজ পান থেকে চুন খসতে দেবেন না। তড়াক করে উঠে দাঁড়ান আবার। আপত্তি জানিয়ে বলেন, সাক্ষী একথা বলেননি যে, গৌফ দেখে কিছু চেনা যায়।

বাস্থ গম্ভীর হইয়ে বলেন, না, গোঁফ দেখে চেনার কথা সাক্ষী স্বকুমার বোস বলেননি, বলেছিলেন স্বকুমার রায়।

মাটিতি অবাক হয়ে বলেন, মানে! স্বকুমার রায়! তিনি কে?

বাস্থ গাম্ভীর্য বজায় রেখেই বলেন, না, স্বকুমার রায়ও নিজের কথা বলেননি। বলেছিলেন তাঁর হেড অফিসের বড়বাবু। বড়বাবুর বদলে কেশিয়ার বরণ বলেছেন: 'জুলফির আমি, জুলফিরতুমি—তাই নিয়ে যায় চেনা!'

আদালতে হাস্যরোল ওঠে।

জাষ্টিস ভাতুড়ী তাঁর হাতুড়ি পিটিয়ে গুগোল খামালেন। বাস্বকে বলেন, আই অ্যাডভাইস দ্য কাউন্সেল নট টু বি ফ্রিভলাস!

বাস্থ একটি বাও করে বলেন, পার্ডন মি' লর্ড! আমার মনে আছে, এটা তিনশ দুই ধারার মামলা। কিন্তু বর্তমান সাক্ষী তাঁর সাক্ষ্যকে ক্রমশঃ ঐ ফ্রিভলিটির পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন,—আমি নাচার। মাননীয় আদালত সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে প্রশিধান করবেন, ঐ বয়সের শতকরা চল্লিশজনের বড় বড় জুলপি আছে।

জাষ্টিস ভাতুড়ী শুধু বলেন, যু বেটার প্রসীড উইথ য়োর ক্রশ একজামিনেশনস্।

বাস্থ পুনরায় সাক্ষীকে জেরা শুরু করেন: আসামী যখন হাজতে ছিল তখন পুলিশ আপনাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে দূর থেকে ঐ আসামীকে চিনিয়ে দিয়েছিল। তাই নয়?

—না তো!

—আপনি বলতে চান আপনাকে পুলিশ আগে ভাগে ঐ আসামীকে দেখিয়ে দেয়নি? চিনিয়ে দেয়নি?

—আজ্ঞে না, কখনও না!

—কেন বাজে কথা বলেছেন? আপনি কি বলতে চান আজ ঐ আদালতে এসে ঐ কাঠগড়ার লোকটাকে জীবনে প্রথম দেখলেন?

—নিশ্চয়ই!

—তাই বলুন। তার মানে দাঁড়াচ্ছে গত এগারো তারিখ রাত আটটা নাগাদ ঐ আসামীকে আপনি দেখেননি—যেহেতু আজই তাকে জীবনে প্রথম দেখলেন। তাই না!

—না, মানে, আমি সেকথা বলিনি!

—বলেছেন! আপনি যা বলেছেন তা সঙ্গে সঙ্গে লেখা হয়ে যাচ্ছে। শুনতে চান?

—না, না। আমি যা বলেছি তার মানে হচ্ছে—

—মানে হচ্ছে ‘কনক্শন’। সেটা আদালত করবেন। আপনি নন।

একটি ‘বাণ’ করে বাস্ব বলেন, থ্যাঙ্ক মি’ লর্ড। আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।

তড়াক করে লাফিয়ে ওঠেন মাইতি। বলেন, পরবর্তী সাক্ষীকে ডাকার আগে আমি বর্তমান সাক্ষীকে রি-ডাইরেক্ট-এক্সামিনেশনে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।

—কখন।

মাইতি বলেন, স্কুয়ারবাবু, আপনি এইমাত্র বলেন যে, আসামীকে সুপ্রিয় দাসগুপ্তরূপে আজই জীবনে প্রথম দেখলেন—

—অবজেকশন য়োর অনার! সাক্ষী সে কথা আদৌ বলেননি।

—বাট হি মেন্ট ইট!—যুরে দাঁড়ান মাইতি।

জজমাহেব নিরাসক্ত কণ্ঠে বলেন, আপনার সহযোগী ও-প্রসঙ্গে শেষ কথা বলে দিয়েছেন। সাক্ষী কি বলেছেন আদালত তা শুনেছেন, তার কী অর্থ আদালত তা বুঝে নেবেন। আপনি সরাসরি প্রশ্ন করুন। সাক্ষীর মুখে নিজ অভিপ্রায়মত শব্দ বসাবেন না।

মাইতির মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। সামলে নিয়ে বললেন, স্কুয়ারবাবু, আপনি কি আসামী সুপ্রিয় দাসগুপ্তের সঙ্গে কখনও টেলিফোনে কথাবার্তা বলেছেন? বলে থাকলে কবে?

—বলেছি। ঘটনার দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, এ বছরের এগারোই এপ্রিল।

—কখন?

—বিকাল পাঁচটায়।

—কী কথা হয়েছিল?

—উনি টেলিফোনে আমার মালিকের খোঁজ করলেন। তিনি গদীতে নেই শুনে উনি নিজের নাম আর পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

—জাস্ট এ মিনিট। নিজ নাম আর পরিচয় বলতে?

—উনি বললেন, উনি সুপ্রিয় দাসগুপ্ত, বোম্বাইয়ের কাপাডিয়া অ্যাণ্ড কাপাডিয়া কোম্পানির ম্যানেজার। আরও বললেন, মালিক ফিরে এলে আমি যেন তাঁকে জানাই যে, সুপ্রিয়বাবু ফোন করেছিলেন, তিনি পরদিন বেলা এগারোটায় সময় ছুটিটা নিতে আসবেন।

—আই নী! ছুটিটা! আর কিছু প্রশ্ন করেননি তিনি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, করেছিলেন। আমি কেশিয়ার বলে পরিচয় দেবার পর উনি জানতে চান, আমার কাশে তখন কত টাকা আছে!

মাইতি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, বলেন কি! আপনার কাশে কত

টাকা আছে তা উনি কেন জানতে চাইছেন তা আপনি জিজ্ঞাসা করেন।  
—করেছিলাম। তাতে উনি বলেন পরদিন গুডফ্রাইডের ছুটি; ব্যাক  
ভন্ট বন্ধ। তাই জানতে চাইছেন?

—তার মানে কি?

—মানে আমি জানি না।

—গার্টস্ অল মি' লর্ড।—আসন গ্রহণ করেন মাইতি।

বাসু-সাহেব তখন সাক্ষীকে রি-ক্রশ-এক্সামিনেশন শুরু করলেন : আচ্ছা  
স্বকুমারবাবু, টেলিফোনে যে আপনি আসামীর সঙ্গেই কথা বলেছিলেন সেটা  
কেমন করে বুঝলেন?

—উনিই তো তাঁর নাম, ধাম টেলিফোনে বললেন!

—সে তো টেলিফোনে যে কেউ বলতে পারে। পারে না?

—পারে।

—আপনি বলেছেন, আসামীকে আপনি জীবনে কখনও আজকের আগে  
দেখেননি, কণ্ঠস্বরও শোনেন নি নিশ্চয়? শুনেছেন?

—আজ্ঞে না।

—তার মানে যে-কেউ আসামীর নাম পরিচয় নিয়ে ও কথা বলতে পারত?

—তা পারত!

—তাহলে কেন হলপ নিয়ে বললেন—আসামী সুপ্রিয় দাসগুপ্তের সঙ্গে  
আপনি টেলিফোনে কথা বলেছেন?

—স্মার, আমি ভেবেছিলাম—

—ভেবেছিলেন! আই সী!—বসে পড়েন বাসু।

আদালত বেলা আড়াইটা পর্যন্ত বন্ধ রইল। মধ্যাহ্ন বিরতি।

ছয়

কৌশিক আদালতে যায়নি। বাড়িতেই ছিল। বেলা বায়োটো নাগাদ  
একটা টেলিফোন এল বাসু-সাহেবের অফিসে। ব্যারিস্টার সাহেব অহুপস্থিত  
শুনে লোকটা স্বকৌশলীর কৌশিক মিজের সঙ্গে কথা বলতে চাইল।  
কৌশিকের সঙ্গে তার নিম্নোক্ত কথোপকথন হল—

—আপনি কি স্বকৌশলীর মিস্টার কৌশিক মিজ আছেন?

কৌশিক ওর খাজা বাংলা শুনে বললে, আছি। আপনি কে?

—আমার নাম আছে বহুপতি সিদ্ধানিয়ার। নামটা পছন্দানতে পারেন?

—পারি। আপনি গত এগারো তারিখে কাপাডিয়া অ্যাণ্ড কাপাডিয়া কোম্পানির একটা বাড়ি সাড়ে ছয় লাখ টাকায় কিনেছেন।

—দু-তুটো টেকনিক্যাল গল্টি হইয়ে গেল, স্বকৌশলী দাদা। সাড়ে ছয় না আছে, সাড়ে চার লাখ; ঐ বাড়ির মালিক কাপাডিয়া কোম্পানি না আছে। মালিকের খাস সম্পত্তি ছিল। আর শুনেম—যো মামলাটা বাস্ত-সাহেব হাতে নিয়েছেন, আই মীন হুপ্‌রিও দাসগুপ্তের মামলা—ঐটার বিষয়ে কুছ্ জরুরী টিপ্‌স্ আমি বাস্ত-সাহেবকে দিতে চাই। তা বাস্ত-সাহেব তো দফতরে না-আছেন না? তাই আপনাকে বাংলিয়ে দিচ্ছি। অগর জরুরং হোয় তো ফিন লিখিয়ে নিন—

—কিন্তু আপনিই যে মিস্টার বহুপতি সিঙ্কানিয়া তা আমি বুঝব কি করে? আপনি বাড়ি থেকে বলছেন তো? লাইন কেটে দিয়ে অপেক্ষা করুন। আমি এখনই আপনার বাড়িতে ফোন করছি—

টেলিফোনে খুকখুক করে হাসির শব্দ ভেসে এল। লোকটা বললে, স্বকৌশলী দাদা। আমি ভি কুছ্ কুছ্ স্বকৌশলী আছি। আমি একটা পাবলিক বৃথ থিকে টেলিফোন করছি, ঘর থিকে নয়। লেকিন আমি আপনার বাং মানিয়ে নিলম—আমি যে, জেহুইন বহুপতি আছি, সিটা প্রমাণ করার ‘ওনাস’ আমার আছে। একটা কোড-নম্বার বাংলাচ্ছি, লিখে নিন—795630।...লিখেছেন? আমার সঙ্গে বাতচিহ্নের পিছে আপনি আমার বাড়িতে আমার ‘ফাদার’কে ফোন করবেন। তিনি ঐ কোড-নম্বরটা বাংলিয়ে দেবেন। ব্যস! আমার আইডেন্টিটি ইস্ট্যাবলিশ হইয়ে যাবে। সমঝ্‌লেন?

কৌশিক অবাক হয়ে বলে, এমন কাণ্ড করার অর্থ?

লোকটা হেসে বললে, আগর বাস্ত-সাহেব হলো এ বাং পুছ্ করতেন না। যথিয়ে নিতেন। মালুম হল না?...এ মামলার ফয়সালা যবতক না হচ্ছে বত্ক আমি শালা ছিপিয়ে থাকব। আমার পাত্তা মিলে গেলেই বাস্ত-সাহেব আমাকে ‘নেওতা’ করে বসবেন—

—নেওতা! মানে নিয়ন্ত্রণ! কিসের?

—কোর্টের ‘সমন’, স্বকৌশলী দাদা। ব্যস! খতম! শালার আদালতে ঠেলেই আমাকে কাবুল খেতে হবে কি আমি দো-লাখ রুপেরা ব্র্যাক-মানি পারিও বাবুকে দিয়েছি। কবুল খেলে ইনকাম ট্যাক্সে ফাঁসব, বে-কবুল লেও পার্জারি কেসে ফাঁসব!...হর্নস্ অব এ ডাইনামো সমঝেন?

—হর্নস্ অব এ ডায়নামো!

—জী হাঁ! ডাইনামো ভি চার্জ নিচ্ছে না, ব্যাটারি ভি ডিসচার্জড! আমার

ঐ হালৎ ! তাই ছিপিয়ে বসে আছি !

ইংরাজি জান যেমনই হ'ক লোকটা যে খলিকা এটা বোঝা গেল । কৌশিক বললে, তাহলে নিজে থেকে টেলিফোন করছেন কেন ?

—সিটা কেমন করে আপনাকে সমঝাই হুকেশলীদাদা ? আমার গলায় যে মছলির কাঁটা বিঁধিয়ে গেল । হর্নস্ অব এ ডাইনামো—শালার কাঁটা না নামছে না উগড়াচ্ছে !

—মছলির কাঁটা ! সেটা আবার কি ?

—আপনি বাংগালি আছেন, ফির 'মাছের কাঁটা' বুঝেন না ?...আপনার ক্রায়েন্ট শালা লাচ্চা মাল আছে ! এমন ইমানদার বুড়বক আমি ভিন্দগিডর ছুটি দেখি নাই ! শালা যদি খালাস পায় ঠুর কাপাডিয়া কোম্পানি যদি ওকে বরখাস্ত করে তবে ঐ শালা ইমানদার বুড়বককে আমি দেড়া মাইনা দিয়ে আমার ম্যানেজার বানিয়ে লিব !

কৌশিক হেসে বলে, এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না কি মিস্টার... ?

লোকটা গম্ভীরভাবে বললে, জী নেহি ! তাহলে সেই কোথাই গুনাই : মোহনবরুপ কাপাডিয়া তাঁর ম্যানেজারকে সিরফ শ্বেশাল পাওয়ার অব এ্যাটনি দেননি—দরটা ফাইনাল করবার এজিয়ারও দিয়েছিলেন । মোহনবরুপজী লেনদেনটা খুব গোপন রাখেতে চেয়েছিলেন—আমি জানি, চার লাখ টাকাত্তে তিনি ক্রোজ ভাউন করতেন । লেकिन তা হতে পারেনি ঐ শালা ইমানদার বুড়বকটার জন্ত । সে কলকাতা বাজারে যাচাই করে সমুখে নিয়েছিল কি হোয়াইট মানিতে সাত লাখ দর উঠবে । আমি তখন ঐ ম্যানেজারকে সিবা অকার দিয়েছিলাম কি সে যদি ভাও কমিয়ে দেয় তবে টুইটি ফাইভ পার্সেন্ট কমিশন দিব । লোকটা এত বড় বুড়বক যে, রাজী হল না ! আমি দাদ নাকতক্ কালোটাকার ডুবে আছি, লেकिन ঐসব বুড়বকের জন্ত আজও আমি মাথার টুপি খুলি । সমুখলেন ?

—বলে যান । আমি গুনছি—

—মাদালতে দাঁড়িয়ে আমি এজাহার দিতে গেকুব না ; লেकिन ঐ বুড়বকটাকে বাঁচাবার জন্ত আমি সবকুছ করতে তৈয়ার ! কাপাডিয়া কোম্পানি যদি মামলা খরচ না দেয় তবে আমি এ মামলা চালাতে প্রস্তুত—

—কালো টাকার ?

—সে বাৎ পুছিয়ে কেন লজ্জা দিচ্ছেন দাদা ? বাহু-সাহেবকে আমার নাম বাতাবেন ।

—কিন্তু বাহু-সাহেব আপনার পাক্তা পাবেন কেমন করে ?

—ঐ তো মুশ্‌কিল আছে দাদা ! তো ঠিক হ্যাঁ, আমি কিন রাত আট বাজে কোন করব ।

—তার আগে আমার করেকটা প্রশ্নের জবাব দিন তো ? প্রথম কথা, গত বৃহস্পতিবার, আই মীন এগারোই এপ্রিল রাতে আপনারা তিনজনে মোকাম্বোতে খেয়েছিলেন ?

—তিনজন না আছে দাদা, দু' জন । আমি আর ঐ সুপারিও দাসগুপ্তা । রাত সাড়ে সাত বাজে মোকাম্বোতে ঘুবেছিলাম, সাড়ে নও বাজে নিকলে আসি । জৈনসাব যখন বড়বাজারে ফৌত হল তখন ঐ সুপারিও শালা আমার সামনে বসে মুরগির টেংরি চুষছে ! আপন গড্‌ !

—সেখানে ঐ কেশিয়ার জীবন বিশ্বাস ছিল না ?

—সুকোশলীদাদা—

—আমার নাম সুকোশলী নয়, কোশিক—

—একই ব্যক্তি আছে দাদা । লেकिन এটা তো মানবেন কি ঐ গন্ধাকামিজ পিনহেবালা বিশ্‌ওয়াসবাবুকে নিয়ে আমি মোকাম্বোতে ঘুবো না ? সে পান খেতে চেয়েছিল, তাকে পান-খ' রপেরার পান খাইয়েছি । পান খাওয়া সম্বন্ধে ?

কোশিক বলে, আর একটা কথা বলুন তো ? ওরা ঐ বাড়তি দু'লাখ টাকা কী ভাবে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছিল ?

—কালোটাকার লেন-দেন কি ভাবে হয় আপনি জানেন না সুকোশলী-দাদা ? হুতি ! হুতির চোরা গলিতে । আমি খোদ ইস্তাজাম করে দিয়ে-ছিলাম । জৈনসাব ঐ হুতি দিত । লেकिन তার আগেই লোকটা ফৌত হইয়ে গেল । ইমানদার বেওকুফটা রোডে সিট-ডাউন হইয়ে গেল !

কোশিক ধমক দিয়ে ওঠে, বার-বার লোকটাকে ইমানদার বেওকুফ বলছেন, সেই ইমানদার লোকটাকে ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচাবার জন্তে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবার সাহস আপনার নেই ?

—দাদা ! দো-লাখ রুপিয়ার ঝামেলা আছে । আমি বিলকুল গডায় গিল্ল যাব—

—তবে কোন করছেন কেন ?

—ওহি তো বাতাচ্ছি ! হর্নস অব এ ডাইনামো ! ইদিকে আই. টি. ও. উদিকে মহিলির কাঁটা—

কৌশিক উত্তেজিত হয়ে বলে, আপনি কী মশাই ? আপনি...আপনি একটা—



কথাটা তার শেষ হয় না। যত্নপতি বলে উঠে, হুকোশলীদাদা! এখন আপনি আমাকে শালা-বাহানচোৎ শুক করবেন। আমি লাইন কাটিয়ে দিলাম...

সত্যই সে টেলিফোনের লাইনটা কেটে দিল।

শুক হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল কৌশিক। যত্নপতি সিঙ্জানিয়ার চরিত্রটাকে বুঝবার চেষ্টা করল। লোকটা নিজেই স্বীকার করছে তার নাক পর্যন্ত ডুবে আছে কালো টাকায়। তাহলে 'মাছের কাঁটা' বলতে সে কী বোঝাতে চায়? কোথায় বাধছে তার ঐ কাঁটাটা? বিবেক? বিবেক বলে ঐ জাতীয় লোকের সত্যই কিছু থাকে না কি?

একটু পরে সে টেলিফোন ডাইরেক্টরি হাতড়ে ফোন করল যত্নপতির বাবা যত্নপতি সিঙ্জানিয়াকে। বাপ ছেলের মত বাংলা বলতে পারেন না। কৌশিক যেইমাত্র বলল যে, সে ব্যারিস্টার বাসুর বাড়ি থেকে ফোন করছে, ভক্তলোক তৎক্ষণাৎ বললেন, তব, ঠাহুরিয়ে!

মিনিটখানেক টেলিফোনে আর মনোহর শোনা গেল না। ক্ষীণ হয়ে বিবিধ-ভারতীর হিন্দী প্রোগ্রামের গানের সঙ্গে একটা এ্যালসেশিয়ানের গর্জন ভেসে এল শুধু। তারপর শুনল: অব শুনিয়ে! মায় যত্নপতি সিঙ্জানিয়া বোলতা হ'। মুঝকো কহুনে কা মংলব ইয়ে হ্যায় কি: সেবুন-নাইন-কাইব-সিকশ-খিরি-ওর ইয়ে ক্যা হ্যায়? জিরো হোগা সায়েদ! রাম রাম...

লাইন কেটে দিলেন যত্নপতি।

কিন্তু কৌশিক ছাড়বার পাত্র নয়। পুনরায় ফোন করল সে। এবার বৃদ্ধ সিঙ্জানিয়া সিংহযুতি ধরলেন। অনর্গল মাতৃভাষায় যে ঝড় বইয়ে দিলেন তার নির্গলিতার্থ: তিনি এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ জানেন না—তঁার পুত্রের নির্দেশ আছে, ব্যারিস্টার বাসুর ফোন এলে ঐ অদ্ভুত নাথারটা তাঁকে শুধু শুনিয়ে দিতে হবে। কেন, কি বৃত্তান্ত তিনি কিছুই জানেন না। ঐ সঙ্গে আরও বললেন—এসব হচ্ছে ঐ 'জিরো-জিরো-সেবুন' মার্কা পিকচারের কুফল! তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বর্তমানে জেমস্ বণ্ডের ভূমিকায় না-পাতা হয়ে গেছেন। ফলে তাঁর মন-মেজাজ খারাপ। নিজেকেই গদিতে বসতে হচ্ছে! তাঁকে যেন এ নিয়ে আর বিরক্ত করা না হয়। পুনরায় রাম-নাথের দ্বিপ্রয়োগান্তে তিনি দূরভাষণে কান্ত হলেন।

কৌশিক বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল। বেলা বারোট। এখনই বার হলে মধ্যাহ্ন-অবকাশের মধ্যে বাসু-সাহেবকে খবরগুলো জানানো যায়। সে তৎক্ষণাৎ একটা ট্যাক্সি নিয়ে আদালতের দিকে রওনা দেয়।

আদালতের অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই কৌশিকের সঙ্গে বাহু-সাহেবের বৈধা হল। ওর কাছে আত্মপাশ শুনে উনি তখনই গিবে দেখা করলেন -আশামী সুপ্রিয়র সঙ্গে। বললেন, তুমি কি সখ করে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে চাও ?

লোকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

—এগারো তারিখ রাত্রে যোকাধোতে তুমি আর যত্নপতি খেতে গিয়েছিলে —তাহলে কেন বললে জীবন বিশ্বাসও তোমাদের সঙ্গে ছিল।

—সুপ্রিয় চোখটা নিচু করে বলল, জীবনই এ পরামর্শ দিয়েছিল। বলেছিল, যত্নপতি কিছুতেই সাক্ষী দিতে আসবে না। জীবন ছাড়া আর কে আমার আলোবাঈটা প্রতিষ্ঠিত করবে ?

—তাই বলে তোমাদের কাউজসকেও তোমরা জানবে না যে, যিথো সাক্ষী দিচ্ছ ?

—আমি জানতাম আপনি এতে রাজী হবেন না !

—হব না তো বটেই ! জীবনকে নতুন করে তালিম দিতে হবে ; তাছাড়া ঐ স্কুয়ারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছিলে দেটা এতক্ষণ স্বীকার করনি কেন ?

সুপ্রিয় মাথা নিচু করে বসে রইল।

—ওর ক্যাশে কত টাকা আছে তা টেলিকোনে জানতে চেয়েছিলে ?

মাথা নেড়ে সায় দিল সুপ্রিয়। অক্ষুটে বলল, পরদিন ছিল গুডফ্রাইডের ছুটি। ব্যাঙ্কের ভন্ট বন্ধ। সেই অজুহাতে দু'-লাখ টাকা নগদ নিতে জৈন-সাহেব রাজী হবে না আমার এই আশঙ্কা ছিল। অথচ ঐ গুডফ্রাইডের রাতের ট্রেনেই আমাদের টিকিট কাটা ছিল। তার উপর যদি জৈন-সাহেবের ক্যাশে আগে থেকেই মোটা টাকা থেকে থাকে তাহলে ছুটির দিন তিনি হয়তো মুশ্কিলে পড়বেন। তাই আমি জানতে চেয়েছিলাম।

বাহু-সাহেব ধমকে ওঠেন, বেশ করেছিলে ! কিন্তু আমাকে বলনি কেন ? সুপ্রিয় অধোবদনে বলেই রইল।

—বোম্বাইয়ে তোমার স্ত্রীকে চিঠি লিখেছ ?

নেতিবাচক শিরশ্চালন করল সুপ্রিয়।

—তোমার স্ত্রী আজ-কালের মধ্যেই আসছে।

একেবারে শিউরে উঠল সুপ্রিয়, সর্বনাশ ! তার নাম-ঠিকানা কেমন করে পেলেন আপনি ?

—সেটা পরের কথা। সর্বনাশ কেন ?

—ও ভয়ানক নার্ভাস ! সে আপনি বুঝবেন না। জীবনকে একবার আমার কাছে আনতে পারবেন ?

বাসু-সাহেব বললেন, অসম্ভব ! তোমার উকিল ছাড়া আর কারও সঙ্গে এ অবস্থায় তোমাকে দেখা করতে দেবে না। তোমার স্ত্রী এলে, হয়তো দিতে পারে।

ঠিক এই সময়েই প্রহরী এসে জানালো—আদালত এবার বসবে। বাসু-সাহেব ফিরে এলেন। কোর্টে গিয়ে বসলেন। প্রত্যেককে বললেন, জীবনকে ডাক তো ?

জীবন গুরুড়পক্ষীর মত হাত দুটি জোড় করে এসে দাঁড়ায়। বাসু বলেন, তোমাকে এখনই সাক্ষী দিতে ডাকব। মোকাযোতে তুমি ঐ রাজে সুপ্রিয়র সঙ্গে খেয়েছ এ মিথ্যা কথা বলবে না, বুঝলে ?

মাথা চুলকে জীবন বলে, ঐটেই আমাদের একমাত্র ভরসা স্তার ! অকাটা অ্যালবি !

ধমক দিয়ে ওঠেন বাসু, বেশি পণ্ডিতোন্মি কর না। মিথ্যে সাক্ষী তোমাকে দিতে হবে না।

—কিন্তু স্তার আমি যে খানায় গিয়ে এজাহার দিয়ে বসে আছি।

—সেটা অল্প জিনিস। খানায় মিথ্যে এজাহার দেওয়া, আর আদালতে হলপ নিরে মিথ্যে সাক্ষ্য দেওয়া সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।

জীবনবাবু বলে, আপনি মিছে ডরাচ্ছেন স্তার। ঐ মাইতিয় বাবার ক্ষমতা হবে না—জেরার আমাকে কাৎ করে। আমি মোকাযোতে ঢুকে সব খুঁটিয়ে দেখে এসেছি কাল সন্ধ্যাবেলায়।

বাসু-সাহেব আর কিছু বলবার সুযোগ পেলেন না। জাঙ্গিস ডাহড়ী পুনরায় বিচারারম্ভ ঘোষণা করলেন। বাদীপক্ষের সাক্ষ্য নেওয়া শেষ হয়নি। সাক্ষ্য দিতে উঠলেন ইস্টার্ন রেলওয়ের স্টাফ—বোম্বাই মেল-এর কণাকটর-গার্ড হেমন্ত মজুমদার। মাইতি সাহেবের প্রেরে তিনি গুডফ্রাইডের সন্ধ্যায় বোম্বাই মেল-এর সি-নং ক্যাপেতে যে ঘটনা ঘটেছিল তার আত্মপূর্বিক বর্ণনা দিলেন। স্বজ্ঞাতা ফিরে এসে বা বলেছিল হব্ব তাই।

বাসু তাঁকে কোন জেরা করলেন না।

পরবর্তী সাক্ষী নেপালচন্দ্র বসু। জি. আর. পি.-র ইন্সপেক্টর। তিনিও

তার সাক্ষ্যে ঐ ঘটনার পাদপূরণ করলেন। বাসু-সাহেব তাঁকে ক্রম এগজামিনে প্রশ্ন করলেন, মিষ্টার বোগ, আপনি যখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাগটা আপনার ?' আর আসামী বলল, 'হঁ' তখন সে কি ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল ?

—না, দেখিনি, কিন্তু তার পূর্বমুহূর্তে যখন সূজাতা বললেন, ও ব্যাগটা আমার নয়, তখন সে ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে ছিল।

—আপনার কি মনে হয় সেটা 'ভেকেন্ট লুক'—মানে সে অস্ত্র কথা ভাবতে ভাবতে এদিকে তাকিয়ে ছিল।

—অবজেকশান ! সাক্ষী কি মনে করেছিল তা আমরা শুনতে চাই না !

—মাইতির কণ্ঠস্বর।

—অবজেকশান সাসটেও—জজসাহেবের নির্দেশ।

—বেশ, দ্বিতীয়বার যখন আপনি প্রশ্ন করেন তখন ও অস্বীকার করেছিল ? বলেছিল, ব্যাগটা ওর নয় ?

—হ্যাঁ, তাই বলেছিল।

—তখনও তো আপনি রিডলভারট! ব্যাগ থেকে বার করে দেখাননি ?

—না।

—তার মানে আসামী তখনও জানত না যে, ব্যাগের ভিতর কি আছে ?

—তা কেন ? আপনি ধরে নিচ্ছেন কেন যে, ব্যাগটা সে নিজেই সঙ্গে করে আনেনি ?

—আপনি কি তাই ধরে নিতে চান ?

—কেন নয় ?

—'কেন নয়', আমার প্রশ্নের জবাব নয়। আমার প্রশ্ন 'আপনি কি তাই ধরে নিতে চান', ইয়েস অর নো।

—ইয়েস !

—আপনি কি এখনই এটা ভাবছেন, না প্রথম থেকেই ওটা ধরে নিয়েছেন।

—প্রথম থেকেই !

—তাই বলুন। তার মানে ব্যাগটা যে আসামীর এই রকম একটা পূর্ব-সিকান্ড প্রথম থেকে ধরে নিয়ে আপনি সাক্ষী দিতে এসেছেন ? যা দেখেছেন তা বলছেন না, যা আপনার প্রথম থেকে ধরে নেওয়া পূর্ব-সিকান্ডের সঙ্গে মিলে যায় তাই সাক্ষী দিচ্ছেন।

—কী আশ্চর্য ! আমি কি তাই বলেছি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি ঠিক তাই বলেছেন !—গাটস্ অল্ মি' লর্ড !

সরকার পক্ষের সাক্ষী এখানেই শেষ।

প্রতিবাদী পক্ষের প্রথম সাক্ষী মিসেস্ হুজাতা যিড ।

হলপ নিয়ে সাক্ষ্য দিতে উঠল হুজাতা । বাহু-সাহেব প্রশ্নের মাধ্যমে প্রমাণ করলেন, হুজাতা ঐ সি-চিহ্নিত কাপেতে প্রথম প্রবেশ করে । বন্ধ দরজা খুলেই সে দেখতে পায় একজন হাটপরা ভদ্রলোককে । তাঁর সঙ্গে হুজাতার কী কথা হয়েছিল তা নথিভুক্ত করা হল । ভদ্রলোকের চলে যাওয়ার সময় ব্যাগ রেখে যাওয়ার কথাও হুজাতা বলল এবং বলল—সুপ্রিয় কামরায় ঢুকেই প্রথম প্রশ্ন করেছিল, ব্যাগটা আপনার ?

মাইতি জেরা করতে উঠলেন । তাঁর প্রথম প্রশ্ন, আপনি কোথায় থাকেন হুজাতা দেবী ?

হুজাতা তার ঠিকানা দিল ।

—ঐ বাড়িতে এ মামলার প্রতিবাদ ব্যারিস্টার পি. কে. বাহুও থাকেন না ?

—হ্যাঁ, থাকেন ।

—আপনি যে ডিটেক্টিভ প্রতিষ্ঠানের পার্টনার তার সঙ্গে ঐ ব্যারিস্টার সাহেবের একটা পার্সোনেজ ব্যবস্থা আছে, না ? কমিশনের ব্যবস্থা ?

—আছে !

—অর্থাৎ এ মামলার বাহু-সাহেব-বা কি পাবেন তার একটা অংশ আপনারও ছুটবে, কেমন ?

হুজাতার মুখটা লাল হয়ে ওঠে ।

—বলুন, বলুন, দৃষ্টি পাচ্ছেন কেন ? এ মামলা বাবদ কমিশান পাবেন না ?

—পাব ।

—তার মানে এ মামলায় বাহু-সাহেব জিতুন এই আপনি চান ?

—না । আমি চাই সত্যের জয় হোক !

—চমৎকার । আর্থিক লোকসান করেও ?

—ওর কেস জেরা-হারার সঙ্গে আমাদের কমিশানের কোনও সম্পর্ক নেই । উনি ‘স্পেসিফিক জব’ দেন, ‘স্পেসিফিকায়ড কি’ দেন । হারলেও দেন, জিতলেও দেন ।

—তাই বুঝি ? আচ্ছা হুজাতা দেবী আপনি নিজে কখনও ঐ 320-খারার আসামী হয়েছিলেন ? খুনের মামলায় ?

—না ।

—না ? কিন্তু আমি যদি প্রমাণ করতে পারি—

—টকিল হিসাবে আপনার জানা উচিত সে-ক্ষেত্রে আপনি আমার বিরুদ্ধে

পার্শ্বারির মামলা আনতে পারেন। যেমন আপনার জানা উচিত আদালতের  
খাইরে ওকথা বললে আপনার বিরুদ্ধে খামি মানহানির মামলা আনতে পারি।  
—সুজাতার দৃষ্ট জবাব।

মাইতি চোখ থেকে চশমাটা খুললেন। প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে  
বললেন, রামচন্দ্রপুরের ময়ূরকেতন আগরওয়াল হত্যা-মামলায় আপনি খুনের  
মামলায় আসামী ছিলেন না?

—না! আমার বিরুদ্ধে কোন চার্জ ফ্রেম করার আগেই প্রকৃত অপরাধী  
ধরা পড়ে। আমার বিরুদ্ধে খুনের মামলা তো ছাড়, আদৌ কোনও চার্জ ফ্রেম  
করা হয়নি!

—কিন্তু আপনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তো?

—বাসু-সাহেব উঠে দাঁড়ান, এনাফ অব ইট! অবজেকশান য়োর অনার।  
এ-নব প্রশ্নের সঙ্গে বর্তমান মামলার কোন সম্পর্ক নেই। অনেক আগেই  
আমি আপত্তি করতাম—করিনি এজন্য যে, ভেবেছিলাম—মাননীয় মহোদয়ের  
যে-কোন মুহূর্তে মনে পড়ে যাবে যে, সে মামলায় প্রকৃত আসামীকে গ্রেপ্তার না  
করে তিনি ক্রমাগত রাম-শ্যাম-যত্নকে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন। উনি সাক্ষীকে  
জিজ্ঞাসা করেছিলেন—‘লজ্জা পাচ্ছেন কেন?’ তাই ভেবেছিলাম, সে-সব কথা  
মনে পড়ে গেলে উনি নিজেই লজ্জায় থেমে যাবেন। কিন্তু উনি থামছেন  
না মি’ লর্ড!

জাস্টিস ভাঙুড়ী সংক্ষেপে শুধু বলেন, অবজেকশান সাসটেইনড। ‘আপনি  
অত্র প্রশ্ন করুন।

—আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই—বসে পড়েন নিরঞ্জন মাইতি।

এরপর সাক্ষী দিতে এলেন জীবন বিশ্বাস।

এগারো তারিখের প্রসঙ্গ আসামাজ সে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে জানিয়ে দিল ঐ  
দিন সন্ধ্যায় সে, আসামী এবং তৃতীয় একজনের সঙ্গে মোকাযোতে নৈশ-মাহার  
করেছে।

বাসু-সাহেবের মুখচোখ রাগে লাল হয়ে উঠল। তিনি তৎক্ষণাৎ সওয়াল  
বন্ধ করে বললেন, ‘গাটস্ অল্ মি’ লর্ড।

মাইতি ডাইরেক্ট এডিভেন্সের স্মৃতি তুলে নিয়ে বললেন, জীবনে কতবার  
মোকাযোতে খেয়েছেন, জীবনবাবু?

—ঐ একবারই স্মার।

—ঐ এগারোই তারিখ রাজ্জেই, জীবনে একবার?

—আজ্জে ইয়া স্মার।

—তার পরে গতকাল আপনি মোকাযোতে যাননি ? সন্ধ্যা সাতটা পাঁচে ?  
জীবনবাবু চোরালের নিরাংশটা খুলে পড়ে ।

—বলুন, বলুন—আমি আপনার টনসিল দেখতে চাইছি না ।

কোটে হাস্তরোল উঠল ।

টোক গিলে জীবন বিশ্বাস বলে, গিয়েছিলাম স্ত্রীর ।

—কেন গিয়েছিলেন ? হোটেলের ভিতরটা দেখে আসতে ? যাতে জেরায়  
আপনার ঐ অ্যালার্জিটা ফেসে না যায় ?

সামলে নিয়েছে জীবন । বললে, আজ্ঞে না, আমি দেখতে গিয়েছিলাম  
যত্নপতি সিংহানিয়া ওখানে আছেন কিনা । সেই মর্মে একটা খবর পেয়েছিলাম ।

—তাই বুঝি । তাহলে মিথ্যা কথা বললেন কেন ? জীবনে একবার  
মাত্র মোকাযোতে গিয়েছিলেন ।

জীবন বলে, আপনি আমার মুখে নিজের ইচ্ছে মত কথা বসাবেন না স্ত্রীর ।

ক্রুদ্ধকিত করে মাইতি বলেন, তার মানে ! আপনি ও কথা বলেননি ?

জীবন এতক্ষণে বেশ সহজ হয়েছে । বললে, আজ্ঞে না । আপনি প্রশ্ন  
করেছিলেন, ‘জীবনে’ কতবার মোকাযোতে খেয়েছেন, জীবনবাবু ?’ তাতে  
আমি বলেছিলাম, ‘ঐ একবারই স্ত্রীর’ । কাল সন্ধ্যায় আমি মোকাযোতে  
খাইনি কিন্তু !

একটা মোক্ষম আওয়ারকাট সাক্ষী অতি হৃদয়ভাবে এড়িয়ে গেল সেটা  
এতক্ষণে মন্থরাবন করলেন নিরঞ্জন মাইতি । জীবন বিশ্বাসের পিছনে টিকটিকি  
লাগিয়ে এখন হৃদয় একটা সূত্র আবিষ্কার করলেন, কিন্তু লোকটা পিছলে  
গেল । জীবন হাসি হাসি মুখে বললে, আমিও স্ত্রীর আপনার টনসিল দেখতে  
চাইছি না । বিশ্বাস না হয় পেশকারবাবুকে শুধোন !

প্রচণ্ড হাস্তরোল উঠল আদালতে ।

জোরে হাতুড়িটা ঠুকলেন জাস্টিস্ ভাজুড়ী । দর্শকদের দিকে ফিরে বললেন,  
আপনার যদি আদালতের কাজে বাধা দেন তাহলে আমি আদালত ফাঁকা করে  
দিতে বাধ্য হব ।

তৎক্ষণাৎ নিস্তব্ধতা ফিরে এল কোর্ট-রুমে । সাক্ষীর দিকে ফিরে জাস্টিস্  
বললেন, আপনি বাজে কথা বলবেন না একদম ।

হাত দুটি জোড় করে জীবন বিশ্বাস বললে, টনসিলের কথাটা কিন্তু হজুর  
আমি আগে তুলিনি ।

—স্টপ ইট ! যুসে প্রসীড ।

মাইতি পুনরায় শুরু করেন, কি খেয়েছিলেন আপনারা ?

—বিনিম্যানি পোলাও, তন্দুরি চিকেন, ক্রায়েড প্রাণ, হুইট আণ্ড সাওয়ার ।  
ও ভুলে গেছি স্মার—তার আগে আমি খেয়েছিলাম চিকেন স্প আর ডিনার  
রোল । সব শেষে কুলকি !

—সবাই তাই খেয়েছিলেন ।

—আজ্ঞে ইয়া, ভাগ করে । ঔরা দুজন স্প খাননি ।

—ড্রিংকস্ নেননি ?

মাথা চুলকে জীবন বিশ্বাস বললে, আজ্ঞে আমি খাইনি স্মার । হ্যাঁ-পোষা  
মাহুস, ও সব আমার পোষায় না । আমি স্প খেয়েছিলাম শুধু ।

—আর ঔরা দুজন ?

ঔরা এক এক পেগ চড়িয়ে ছিলেন ।

বাহু-সাহেব দাঁতে দাঁতে চেপে বললেন, ষ্টেডিরট !

মাইতিও স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়েছেন । বড়শি-ছেঁড়া মাছটা আবার টোপ  
গিলেছে । এখন খেলিয়ে তুলতে হবে । বললেন, মাত্র এক এক পেগ ?

—আজ্ঞে ইয়া স্মার !

—কী খেয়েছিলেন ঔরা জানেন ? না কি মদের নামও জানেন না  
আপনি ?

প্রত্যোৎ বাহু-সাহেবের কানে কানে বললে—অবজেকশান দিন ! মামলার  
সঙ্গে এসবের কী সম্পর্ক ।

বাহু-সাহেব বললেন, ও আমার মর্কেস নয় ! লোকটা আত্মহত্যা করছে ।  
করুক, আমার কি ?

ব্যারিস্টার রে-সাহেব অশ্রুতে বললেন, টু !

—কেন ? বে-ফাঁস কি বলল ও ?—প্রশ্ন করে প্রত্যোৎ ।

ব্যারিস্টার রে অশ্রুতে বললেন, ডোকু ফলো ইয়াং ম্যান ? ঘটনাটা  
গুডফ্রাইডের আগের সন্ধ্যা ।

প্রত্যোৎ হালে পানি পায় না । ওদিকে আরও কয়েকটি প্রশ্নোত্তর হয়ে  
গেছে । মাইতি তখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কি করে বুঝলেন ইনি ব্ল্যাক-  
নাইট হুইস্কি খেলেন, আর উনি জিন-উইথ-লাইম ? একটু পদ্য করে দেখে-  
ছিলেন নাকি ?

জীবন বিশ্বাস একগাল হেসে বললে, আজ্ঞে না স্মার ! আমার সামনে  
অর্ডার দিলেন, বিল যেটালেন, আমি আনব না ?

—তা তো বটেই । তাহলে আপনি নিঃসন্দেহ যে, আগামী সে-রাতে জিন-  
উইথ-লাইম আর মিস্টার বহুপতি সিভ্যানিয়া ব্ল্যাক-নাইট হুইস্কি খেয়েছিলেন ?



—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মাইতি হেসে বলেন, এবার বলুন তো বিশ্বাস মশাই, ‘পার্জারি’ মানে কি?

—আজ্ঞে, আমি জানি না। জোলাপ নেওয়া বোধ হয়।

—কিন্তু এটা তো জানেন যে, সেটা ছিল গুডফ্রাইডের আগের সন্ধ্যা।

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। তা আমি বইকি।

—সেদিন কি বার ছিল?

—বৃহস্পতিবার।

—ক’লকাতার কোন খানদানি দোকানে বৃহস্পতিবার মদ বিক্রি হয়?

টনসিলের প্রথমটো মাইতি আবার তুলতে পারতেন। তা কিন্তু তুললেন না তিনি। বললেন, আপনি আগাগোড়া মিছে কথা বলেছেন! মোকাবেলাতে আপনি ঐ দিন আদৌ যাননি এবং দেখানে ঐ আসামীর সঙ্গে খানা খাননি! বলুন!, স্বীকার করুন!

জীবন হাত দুটি জোড় করে বললে, বিশ্বাস করুন স্যার, আমি যাইনি। কিন্তু ও’রা দুজন গিয়েছিলেন! ঐ সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত ন’টা পর্যন্ত ও’রা ওখানে ছিলেন!

—গাটস্ অল মি’ লর্ড!—মাইতি আসন গ্রহণ করেন। তৎক্ষণাৎ একজন শাব ইন্সপেক্টর তাঁর কানে কানে কি যেন বলে। উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন মাইতি। উঠে দাঁড়িয়ে জজ-সাহেবকে একটি সাড়বর ‘বাও’ করে বলেন, আদালত যদি অনুমতি করেন, তবে আমি একটি নিবেদন করতে চাই। এই মাজ ইনভেস্টিগেটিং অফিসার আমাকে একটি চাক্ষু্যকর সংবাদ পেশ করেছেন—যা এই মামলার সত্য নির্ধারণে প্রভূতভাবে সাহায্য করবে। বস্তুত গত এক সপ্তাহ ধরেই আমরা অনুসন্ধান কার্য চালাচ্ছিলাম—চূড়ান্ত তথ্য এইমাত্র জানা গেছে। আদালত অনুমতি করলে আমি আর একজন সাক্ষীকে প্রেসকিউশানের তরফে সাক্ষ্য দিতে ডাকতে পারি।

জজ সাহেব বলেন, আদালত এটা পছন্দ করেন না। বাদীপক্ষ সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত না হয়ে মামলার ‘ডেট’ নিলেন কেন? বিবাদী পক্ষের সাক্ষী নেওয়া হয়ে গেছে, এখন, ওয়েল—আমি কলিং দেবার আগে জানতে চাই এ বিষয়ে প্রতিবাদীর কাউন্সেল কি বলেন?

বাহু বলেন, সত্য প্রতিষ্ঠিত হ’ক এটাই আমরা চাই। আমাদের আপত্তি নেই।

মাইতির আহ্বানে অতঃপর সাক্ষ্য দিতে উঠে দাঁড়ালেন সি. বি. আই.-এর ফিল্ডার-ক্রিস্ট এক্সপার্ট মিস্টার এম. পাণ্ডে। মাইতি খুশিতে ডগমগ। প্রথম

করেন, মিষ্টার পাণ্ডে, আপনি ফিঙ্গার-প্রিন্ট এক্সপার্ট হিসাবে কোথায় ট্রেনিং নিয়েছেন? কতদিনের?

—স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে। দু' বছরের।

—আপনাকে গত বারই এপ্রিল আসামীর একটি ফিঙ্গার-প্রিন্ট দিয়ে অঙ্গসন্ধান করতে বলা হয়েছিল কি?

—হয়েছিল।

আসামীর সেই ফিঙ্গার-প্রিন্টটি কি আপনি দয়া করে আমাদের দেখাবেন?

সাক্ষী তাঁর ব্যাগ খুলে নম্বর দেওয়া একটি ফিঙ্গার-প্রিন্ট বার করে দিলেন। মাইতি সেটি আদালতে নথিভুক্ত করলেন—“এফ-পি-ওয়ান” রূপে। তারপর বললেন, এবার আপনার তদন্তের কলাফল বলুন।

সাক্ষী অবাবে বললেন যে, তিনি লালবাজার ফিঙ্গার-প্রিন্ট লাইব্রেরীতে বসে গত চার-পাঁচদিন ঐটা মেলাবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করে যান। গত পনের তারিখে তাঁর সন্দেহ হয়, একজন দাগী আসামীর সঙ্গে ফিঙ্গার-প্রিন্টটি মিলে যাচ্ছে। দাগী আসামীর নাম লালু, ওরফে খোকন। সে বহরমপুরের একটি ডাকাতি কেসে ইতিপূর্বে ধরা পড়েছিল আরও সাতজনের সঙ্গে। তাদের ভিতর পাঁচ জনের মেয়াদ হয়—দুজন যথেষ্ট প্রমাণ অভাবে ছাড়া পায়। সেই দুজনের ভিতর একজন ঐ খোকন ওরফে লালু। ষটনা ছয় মাস আগেকার। সাক্ষী ঐ দিনই বহরমপুরে চলে যান। সেখানকার থানায় রাখা ফিঙ্গার-প্রিন্ট-এর সঙ্গে ঐ ‘এফ-পি ওয়ান’ ছাপটি মিলিয়ে দেখেন। দেখে নিঃসন্দেহ হন যে, বর্তমান মামলার আসামী সুপ্রিয় দাসগুপ্ত আর খোকন ওরফে লালু অভিন্ন ব্যক্তি।

মাইতি প্রশ্ন করেন, বহরমপুর থানা থেকে কী খবর পেলেন? সেই লালু ওরফে খোকন বর্তমানে কোথায়?

—ওরা তা বলতে পারলেন না। আজ ছয় সাতমাস সে বহরমপুর যায়নি।

—তাহলে আপনি নিঃসন্দেহ যে, খোকন ওরফে লালুই হচ্ছে ঐ আসামী সুপ্রিয়?

—হ্যাঁ, আমি নিঃসন্দেহ!

—আচ্ছা এমনও হতে পারে যে দুটো ফিঙ্গার-প্রিন্ট ছব্বছ মিলে গেল, অথচ পরে দেখা গেল সে দুটো বিভিন্ন লোকের?

—না, তা হতে পারে না!

—এমন রেকর্ড কোথাও নেই?

—না নেই!

—কিন্তু ‘আনত্রোকন রেকর্ড’ও ক্ষেত্র বিশেষে তো ‘ত্রোকন’ হয় ?

—সাক্ষী ক্রুৎকৃত করে বলেন, আমি আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পারছি না ?

—পারছেন না ? আচ্ছা, আমি একটা উদাহরণ দিই,—হয়তো বুঝবেন কি বলতে চাইছি—ধরুন আজ আমি বিশ বছর ডিকেন্স কাউন্সেল হিসাবে প্র্যাকটিস করছি এবং এই বিশ বছরের ভিতর আমার কোনও মকেলের কখনও ‘কনভিকশন’ হয়নি। তখন হয়তো আমি বড়াই করে বলতে পারি, এটা হচ্ছে ‘আনত্রোকন রেকর্ড’! এ রেকর্ড কখনও ভাঙা যায়নি, ভাঙা যাবে না !

পাণ্ডে সাহেব ক’লকাতার লোক নন। প্রশ্নটার তীব্র ব্যঙ্গের মর্মোদ্ধার করতে পারলেন না। সহজভাবে বলে ওঠেন, তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই! সমস্ত দুনিয়া মেনে নিয়েছে দুটি মানুষের কখনও হুবহু এক রকম ফিঙ্গার-প্রিন্ট হতে পারে না।

প্রত্যোৎ লক্ষ্য করে দেখে বাহু-সাহেব একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন আগামীর দিকে। যে লোকটাকে বাঁচাবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছেন, এখন যেন তাকেই খুন করতে চান উনি! তার পরেই প্রত্যোত্তের নজর পড়ল বাহু-সাহেবের পাশের চেয়ারখানায়। সেটা ফাঁকা। বৃদ্ধ ব্যারিস্টার এ. কে. রে কখন নিঃশব্দে উঠে চলে গেছেন।

মাইতি একেবারে বিনয়ের অবতারণা। খুঁকে পড়ে বাহুকে বলেন, যুমে ক্রশ এক্সামিন হিম, ইফ যু প্লীজ !

বাহু উঠে দাঁড়ালেন। আদালত কর্তৃপক্ষ। বার অ্যাসোসিয়েশানের অনেকেই এসেছে আজ। এমন অবস্থায় বাহু-সাহেবকে কেউ কখনও দেখেনি। সবাই উদ্‌গীব হয়ে অপেক্ষা করছে। বাহু-সাহেব গম্ভীর স্বরে বললেন, সহযোগী পাবলিক প্রসিকিউটার যে বারো তারিখ থেকে এ জাতীয় অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন সে খবরটা তিনি এতাবৎকাল আদালতকে জানাননি। বস্তুত তদন্ত শেষ না করে মামলার উপস্থিতি হওয়াই যে তাঁর পক্ষে উচিত হয়নি একথা মহামাণ্ড আদালত ইতিপূর্বেই বলেছেন। সে যাই হোক, আমরা এ তথ্য এইমাত্র সুনলাম। তাই প্রতিবাদী পক্ষ আদালতের কাছে কিছু সময় চাইছেন।

জাস্টিস ভাড়াট্টী বলেন, আমি আপনার সঙ্গে একমত। প্রতিবাদী আগামী কাল জেরা করবেন।

নির্ধারিত সময়ের কিছু পূর্বেই আদালত বন্ধ হয়ে গেল।

বাহু-সাহেবের গরম লাগছিল। গাউনটা খুসে হাতে ঝুলিয়ে নিলেন। চকিতে তাকিয়ে দেখলেন পাশের চেয়ারখানার দিকে। সেটা ফাঁকা। বীর পদে আদালত ছেড়ে বার হয়ে এলেন। পিছন পিছন এল জজ্ঞাতা। প্রত্যোৎ ন

বলে পারল না—সুপ্রিয়র সঙ্গে একবার দেখা করবেন না স্তার ?

—নো ! হি ইজ্, এ ডাউন-রাইট ডায়মেন্ড, লায়ার ! এক নম্বর মিথ্যাবাদী !

—কিন্তু যত্নপতি সিন্ধুনিয়া তাহলে কেন ওকে—

—যত্নপতি কিছু যুষ্টিগিরের বাচ্চা নয় ! একটা ব্রাকমার্কেটিয়ার ! এমনও হতে পারে ঐ খোকন ওরফে লালু—অর্থাৎ সুপ্রিয়, ওর পোষা গুণ্ডা ! পাপের সাথী !

কোর্ট থেকে ফিরে এলেন ওঁরা ।

## আট

বাড়িতে যখন এসে পৌঁছালেন তখন বিকাল সাড়ে পাঁচটা । গাড়ি থেকে নেমে উনি ধীরে ধীরে ঢুকে গেলেন নিজের চেম্বারে । অক্লান্ত দিন সচরাচর প্রথমেই গিয়ে রানীর সঙ্গে দেখা করেন । দু-চারটে খোশ-গল্প করতে-করতেই এক কাপ কফি খান । তারপর স্নান করেন, এবং তারপর নিজের চেম্বারে গিয়ে বসেন । পিছনে থাক-দেওয়া আইনের বই—নিচেকার লকারে থাকে লিকার-গ্রাস । বিস্ত রেখে যায় বরষের কুচির প্লেট । রাত নটায় ডিনার । কিন্তু তারপর আবার গুরু হয় পড়ানো । আবার গিয়ে বসেন চেম্বারে—তখন আর মগপান করেন না । কচিং কোনদিন হয়তো একটা ড্রাই মার্টিনী খেলেন—সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয় । কখন শুতে যাবেন সেটা নির্ভর করে পরদিনের মাথলাটার গুরুত্বের উপর—অথবা হয়তো নির্ভর করে কতকণে একটা চাকী দেওয়া চেয়ার এসে থামবে ঐ চেম্বারের দ্বারপথে । শোনা যাবে প্রঙ্গ, রাত অনেক হল যে, শোবে না ?

আজ তার ব্যতিক্রম হল । বাস্ স্নান করলেন না, কফি খেলেন না । রানী দেবীর সঙ্গে দুটো হাল্কা-রসিকতাও করলেন না । এমনকি জামা জুতো পর্যন্ত ছাড়লেন না । ঢুকে গেলেন চেম্বারে ।

মিনিট দশেক পরে ইন্টারকমটা সাড়া দিয়ে উঠল । কাচের গব্লেটটা সরিয়ে রেখে বাস্ সুইচ টিপে বললেন, বল, শুন্ছি ।

—কফি খাবে না ? ভিতরে আসবে না ?

—আসব রাগু—ভিতরে আসব বই কি । একটু পরে—

—শোন, ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার হয়েছে । একটু আগে সুবর্ণ এসেছে—

চম্কে উঠলেন বাস্ । অস্বাভাবিকভাবে । হয়তো আনমনা ছিলেন, কিংবা অত্যন্ত ক্রত মদটো খাচ্ছিলেন—প্রায় আর্তকণ্ঠে বলে ওঠেন, কে ? কে এসেছে বললে ?

—ঐ সুপ্রিয়ের স্ত্রী। যাকে আগতে বলেছিলে তুমি—

—হ্যাঁ, কিন্তু কী নাম বললে তার ?

বেদনাহত কণ্ঠ ভেসে এল রানী দেবীর, হ্যাঁ, ঐ নামই ! আশ্চর্য কোরেলিডেল নয় ?

হুজনেই নীরব। প্রায় আধ মিনিট। শেষে রানী বললেন, আমি ও-ঘরে আসব ?

—তাই এস। আমি ঐ মেয়েটার সামনে দাঁড়াতে ...তুমি চলে এস—

নিতান্ত কাকতালীয় ব্যাপার। বছর সাতেক আগে ম্যাসানজোর বাধ দেখতে গিয়ে পথ-দুর্ঘটনায় বাসু-সাহেবের যে মেয়েটি মারা যায় তার নাম এবং ঐ দাগী আসামী সুপ্রিয় দাসগুপ্তের স্ত্রীর নাম অভিন্ন। হুজনেই সুবর্ণ।

একটু পরে চেয়ারের দরজাটা খুলে গেল। চাকা-দেওয়া চেয়ারে এসে উপস্থিত হলেন মিসেস বাসু। বললেন, সূজাতার কাছে সব সুনলাম। আজকে মামলার খবর।—একটু থেমে আবার বলেন, ছেলেটাকে বাঁচানো যাবে না, নয় ?

অসহায়ভাবে মাথা নাড়লেন বাসুসাহেব।

হুজনেই কিছুটা নীরব। তারপর বাসু বললেন, তুমি যা ভাবছ তা নয় রাণু। আমার আনব্রোকন রেকর্ড আজ ভেঙে যাচ্ছে বলে ভেঙে পড়িনি আমি। আফটার অল, হোয়াটস ডাট আনব্রোকন রেকর্ড ? মীয়ার চাল ! আমি বরাবর জিতেছি। কেন জিতেছি ? আমার বাকপটুতার জন্তে ? বুদ্ধির জন্তে ? আইন জ্ঞানের জন্তে ? না ! নিতান্ত কোরেলিডেল। ঘটনাচক্রে প্রতিটি ক্ষেত্রেই সত্য ছিল আমার পক্ষে। আমি যাদের হয়ে লড়েছি তারা প্রতি ক্ষেত্রেই ছিল নির্দোষ ! হ্যাঁ, একটিমাত্র ব্যতিক্রম আছে—তোমার মনে আছে নিশ্চয়। সেই মারোয়াড়ি ছেলেটার কেস—যে তার বাপকে খুন করেছিল। কিন্তু আমি যখন তার কেস লড়েছিলাম তখন আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেছিলাম তার কথায়—যে, সে নির্দোষ ! সেও বেকহুর খালাস হয়েছিল। খালাস পাবার পর আনন্দের আতিশয্যে সে এসে আমার কাছে স্বীকার করেছিল—সে নিজেই তার বাপকে খুন করেছে !

রানী বললেন, মনে আছে আমার। তারপরে বহুদিন তুমি কোর্টে যাওনি।

—সেবার তবু একটা সাক্ষ্য ছিল রানী—আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেছিলাম যে, ছেলেটা নির্দোষ ! বিবেকের কাছে আমি পরিষ্কার ছিলাম। কিন্তু এবার ? এবার যে আমি নিজেই বুঝতে পারছি লোকটা একটা পাকা ক্রিমিনাল।

—সন্দেহের কোন অবকাশ নেই ?

—থাকলে এভাবে ভেঙে পড়ি আমি ? আগামীকাল জীবনে প্রথম কোর্ট থেকে হেরে ফিরব—সেজন্য আমার কোন দুঃখ নেই। অতটা আত্মকেন্দ্রিক নই আমি। কোর্ট থেকে ফেরার কথা ভাবছি না আমি। কোর্টে যাবার কথাই ভাবছি। লোকটা দোষী জেনেও কেমন করে তার পক্ষে সওয়াল করব ? দেখানেই যে আমার সত্যিকারের আনন্ডকন রেকর্ড সম্মানে ভাঙব আমি।

—উপায় কি বল ? এ অবস্থায় কি তুমি আইনত ওর পক্ষ ত্যাগ করতে পার ?

—পারি ! আইনত পারি—প্রফেশনাল এথিয়ে পারি না। সমস্ত বার-এ্যাসোসিয়েশন একবাক্যে বলবে—নিশ্চিত পরাজয় এড়াতে বাহু-সাহেব পালিয়ে গেল !

—ওরা আসল কথাটা বুঝবে না ?

—কেমন করে বুঝবে বাপু ? তুমি ওদের সাইকলজিটা দেখছ না ? ওদের সবারই একবার না একবার লেজ কাটা গেছে ! দল-ছুট এই লাজুল-যুক্ত শৃগালটিকে কেমন করে ওরা ক্ষমা করতে পারবে ? আর তাছাড়া কথাটাও তো ঠিক ! নিশ্চিত পরাজয় এড়াতে সবাই যদি এমনভাবে সরে দাঁড়ায় তবে মস্তেলরা কোথায় দাঁড়াবে ?

—মিঠুর সঙ্গে দেখা করবে না ?

—মিঠু !—চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান বাহু-সাহেব !

অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে যান রানী দেবী, না, না। ওটা আমারই ভুল ! ওর নাম মিঠু নয়। ওর...ওর ডাক নাম আমি জানি না ! আমার...আমার...

হঠাৎ কোথাও কিছু নেই মুখে আঁচল চাপা দিলেন রানী বাহু।

অনেক অনেক দিন পর ঐ দুটো নাম—‘স্বর্ণ’ আর ‘মিঠু’ এ বাড়িতে উচ্চারিত হল। বাহু-সাহেব বুঝতে পারেন—রানী অজান্তে ঐ নামের সাযুজ্য ধরে অজানা অচেনা মেয়েটাকে আপন করে নিয়েছে। তাই হৃপ্রিয় দাসগুপ্তের স্ত্রী স্বর্ণ হঠাৎ ‘মিঠু’ও হয়ে গেছে তাঁর কাছে। বাহু উঠে এসে ওর গিঠে একটা হাত রাখেন। রানী ততক্ষণে সামলেছেন। স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, চল, ভিতরে বাই।

হৃপ্রিয় বলেছিল তার স্ত্রী নার্সাস প্রকৃতির। কিন্তু তেমন কিছু নার্সাস প্রকৃতির বলে মনে হল না বাহু-সাহেবের। এমন দুঃসংবাদ আচমকা পেলে সবাই কিছুটা হতচকিত হয়ে পড়ে। তার বেশি কিছু নয়। সে নিজেই চলে

এসেছে। পেনে নয়, ফ্রেনেই। হাণ্ডা স্টেশন থেকে ট্যাক্সি নিয়ে একেবারে নিউ আলিপুরে। বাসু-সাহেব ওকে আপাদমস্তক ভাল করে দেখে নিলেন। ওঁদের মেয়ে স্ববর্ণ মারা গেছে সাত বছর আগে। তখন তার বয়স ছিল আট-নয়—অর্থাৎ থাকলে আজ সেই স্ববর্ণের বয়স হত বোলো। এ মেয়েটি বোড়শী নয়। বছর বাইশ বয়স ওর। দুই স্ববর্ণের আকৃতিগত পার্থক্যও যথেষ্ট। সে ছিল কৰ্কা, এ শ্রামলা। সে ছিল রোগা একহারা, এ দোহারা, স্বাস্থ্যবতী। একমাত্র নাম-সামুজ্য ছাড়া আর কোনও সাদৃশ্য নেই !

না! ভুল হল! আর একটা সাদৃশ্য আছে! সেই স্ববর্ণের মাথা লক্ষ্য করে যখন এক নিষ্ঠুর অলক্ষ্যচারী বজ্র নিক্ষেপ করেছিলেন তখন বাসু-সাহেব বুক পেতে দিয়েও তাকে রক্ষা করতে পারেননি। ওঁর বিজ্ঞা, বুদ্ধি, প্রতিপত্তি, অর্থ সব কিছু নিষ্ফল হয়ে গিয়েছিল সেই অসহায় ছোট্ট মেয়েটির শেষ-সংগ্রামে। আজ এই স্ববর্ণের অবস্থাও তাই। ওঁর বিজ্ঞা-বুদ্ধি-আইনজ্ঞান কোন কিছুই ঐ আশ্রিতা মেয়েটিকে রক্ষা করতে পারবে না!

—কতদিন বিয়ে হয়েছে তোমাদের?—প্রশ্ন করলেন বাসু।

—ছ' বছর।

—বাচ্ছা-টাচ্ছা হয়নি?

মেয়েটি মুখ নিচু করল। রানী দেবী পাশ থেকে বলে ওঠেন, পেটে এসেছিল, থাকেনি।

—বাবা-মা আছেন? বাপের বাড়ি কোথায়?

মেয়েটি মুখ তুলল না। টপ্ টপ্ করে কয়েক ফোঁটা জল বরে পড়ল কোলের উপর।

রানী দেবীই জবাব দিলেন এ প্রশ্নের। বললেন—বাপের বাড়ি, শঙ্করবাড়ি কোথাও ওকে নেবে না। এ্যারেঞ্জড ম্যারেজ নয়—অসবর্ণ বিয়ে। ওর পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিল।

কোথায় এ রোমাটিক সংবাদে খুশিয়াল হয়ে উঠবেন আধুনিকমন ব্যারিস্টার-সাহেব, তা নয় খিঁচিয়ে ওঠেন উনি, প্রেম করে বিয়ে! তা প্রেম করার আগে ওর ফিলার-প্রিন্টটা নিয়ে যাচাই করাওনি?—চেয়ার ছেড়ে উর্দে পদচারণা শুরু করেন।

বেদনাহত জলভরা দু'চোখ তুলে মেয়েটি বললে, ও খুন করেনি! আপনি বিশ্বাস করুন!

বাসু-সাহেব বাঁ-হাতের তালুতে ডান হাত দিয়ে একটা মুঠোঘাত করলেন শুধু।

—ও মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে পড়েছে...আপনি...আপনি ওকে বাঁচান !—

মেয়েটি উঠে দাঁড়াতে চায়। ওঁর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ত—কিছা—

বাসু-সাহেব প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠেন : সিট ডাউন !

ধতমত খেয়ে মেয়েটি আবার চেয়ারে বসে পড়ে।

—আজ থেকে ছ'মাস আগে—ধর, গত বছর অক্টোবর-নভেম্বর-ডিসেম্বরে  
হুপ্রিয় বোম্বাই থেকে ক'লকাতা এসেছিল ?

স্বর্ণ মনে মনে কি হিসাব করে বলল, ইঁ্যা, অফিসের কাজে। মাস  
খানেকের জন্ত। কেন ?

—‘কেন’ সে-কথা থাক। তুমি কি কোনদিন এমন আশঙ্কা করনি যে,  
ওর কোনও ‘শেডি-পার্ট’ থাকতে পারে ?

—ওর কোনও শেডি-পার্ট নেই !

—কাকে কি বলছ স্বর্ণ ? মায়ের কাছে মাসীর গল্প ?

রানী দেবী এবার প্রতিবাদ করে ওঠেন, তুমি কথায় কথায় ওকে অমন  
মক দেবে না কিন্তু—

বাসু-সাহেব একবার স্বর্ণের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। শ্রাগ করলেন।  
গিয়ে বসলেন তাঁর ইজিচেয়ারে। পাইপটা ধরালেন।

স্বর্ণ বললে, আমি ওর সঙ্গে দেখা করব।

—তাতো করবেই। কাল সকালে তোমাকে নিয়ে যাব।

ঠিক তখনই বিত্ত এনে দিল একটা শুভার-সীজ টেলিগ্রাফ। খামটা খুলে  
স্ব দেখলেন তারবার্তাটা আসছে ব্যারুক থেকে। তাতে লেখা :

“হুপ্রিয় দাসগুপ্তকে ডিফেন্ড করুন এএএ তার সততা এবং কর্মদক্ষতা  
স্বের অতীত এএএ যাবতীয় খরচ আমার এএএ আকাশ হচ্ছে খরচের  
সীমা এএএ ববিবারে দমদম পৌঁছাব এএএ মোহনস্বরূপ কাপাডিয়া।”

বাসু-সাহেব টেলিগ্রাফখানা বাড়িয়ে ধরলেন স্বর্ণের দিকে। বললেন,  
গাই নাউ পেরগ য়োর পার্ডন, স্বর্ণ ! আমি অন্তায় কথা বলেছিলাম। তুমি  
প্রমে পড়ে যে ভুল করেছ তোমার স্বামীর এমপ্রয়ার ধুরন্ধর কোটপতি হওয়া  
স্বেও সেই একই ভুল করেছেন !

নিজের ঘরে গিয়ে টেলিফোন তুলে নিলেন বাসু। পার্ক-হোটেলের নাম্বার  
হিলেন। অপারেটরকে বললেন, কম নম্বর 78 শ্রীজ।

একটু পরে রিভিং টোন শোনা গেল। ওপ্রান্ত বলল, হ্যালো, জীবন  
খাস বলছি—

—আমাকে না বলে কোর্ট ছেড়ে চলে এলে কেন ?



—আপনি কে ? বাসু-সাহেব ?

—হ্যাঁ, আমি। কোর্ট থেকে পালিয়ে এলে কেন ?

—পালিয়ে তো আসিনি শ্রী। কেন, কোন দরকার আছে।

—আছে ! তুমি ইচ্ছে করে তোমার বন্ধুকে ফাঁসিচ্ছ !

—কী যে বলেন শ্রী ! আমি কেন ফাঁসাব ? আমি তো তার জে পার্জারির কেসে ফাঁসতে পর্যন্ত রাজী হয়েছিলাম ?

বাসু-সাহেব একটু চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, তুমি ঘণ্টাখানেক হোটেল ছেড়ে বের হয়ো না। তোমাকে একটা জরুরী খবর দেব। বুঝলে

—আজ্ঞে আচ্ছা !

বাসু-সাহেব টেলিফোনটা রেখে টানা-ড্রয়ারটা খুললেন। বাব করে নিলে আশ্চর্যকার একটা অস্ত্র। স্বজাতা এসে দাঁড়ালো দরজায়। বললে, বে হচ্ছেন নাকি আবার ?

—হ্যাঁ, স্বজাতা ! আবার এক মিস্ট্রিয়াস ব্যাপার। পার্ক-হোটেলে ফো করে এইমাত্র জীবন বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বললাম। লোকটা জীবন বিশ্বাস নয়। আই মাস্ট ফাইণ্ড আউট—লোকটা কে !

—সে কি ! লোকটা বলল যে, সে জীবন বিশ্বাস ?

—তাই সে বলল। গলাটা নকল করবার চেষ্টাও করছিল—কি পারেনি।

গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন উনি। একাই।

আধঘণ্টা পরে পার্ক হোটেলের নিচে গাড়িটা রেখে এগিয়ে গেলে রিসেপশান কাউন্টারের দিকে। জীবন বিশ্বাসের রুম নম্বর জেনে নিয়ে লিফটের উপরে উঠলেন। চিহ্নিত দরজায় যখন বাঁ-হাতে টোকা মারলেন তখন তাঁর ডান হাতটা ছিল পকেটে—যে পকেটে আছে তাঁর আশ্চর্যকার অস্ত্রটা।

একটু পরেই দরজা খুলে গেল। ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে কৌশিক।

—তুমি ! তুমিই তখন ফোন ধরেছিলে ?

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনি যে বললেন অ্যাবার ফোন করবেন ?

বাসু-সাহেব দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। হাসতে হাসতে গিয়ে বসতে একটা চেয়ারে। বললেন, টিকটিকিগিরি ভালই করছ। কিন্তু একটা ত হয়েছিল তোমার। তুমি ভুলে গিয়েছিলে জীবন বিশ্বাসের কাছে ‘পার্জারি’ অর্থ জোলাপ নেওয়া।

এবার কৌশিকও হেসে ওঠে উচ্চকণ্ঠে। বলে, আশ্চর্য সন্নি !

কৌশিক তার এই অদ্ভুত আচরণের কৈফিয়ৎ দিল—

মিথ্যা-সাক্ষী ধরা পড়ার পরেই জীবন আদালত ছেড়ে বেরিয়ে আসে। কৌশিকের সন্দেহ হয় যে, সে আত্মগোপন করতে চাইছে। সে পিছন পিছন বেরিয়ে আসে। জীবন একটি ক্লাইং ট্যান্সি ধরে রওনা দেয়। দ্বিতীয় ট্যান্সি পেতে প্রায় মিনিট দশেক দেবী হয়ে যায় তার। দুর্ভাগ্যক্রমে পথে একটা মিছিলে পড়ে আরও দশ মিনিট দেবী হয়ে যায়। কৌশিক এসে পৌঁছায় পার্ক-হোটেলে। ক্রম বেহারা হসিমোহনের খোঁজ পেতে বিলম্ব হয় না। তার মাধ্যমে রিসেপশান কাউন্টারে খবর নিয়ে জানতে পারে, মিনিট পাঁচেক আগে জীবন বিশ্বাস চেক আউট করে বেরিয়ে গেছে। ও তার ক্রম নান্দারটা স্কেনে নেয় এবং জে. বিশ্বাস নামে তখনই ঘরটা বুক করে।

—কেন ?

—আমি একটা চান্স নিলাম স্তার, আর অভূত ফল ফলেছে তাতে !

—কি রকম ?

কৌশিক নাকি ঘরে এসেই টেলিফোনটা তুলে নিয়েছিল। অপারেটরকে বলে, ক্রম নম্বর 78 থেকে মিস্টার বিশ্বাস বলছি—আমার কোন ট্রাংক কল এসেছিল ইতিমধ্যে ?

মেয়েটি বললে, না স্তার। কাল বিকালে সেই যে ট্রাংক কল এসেছিল তারপর তো আসেনি।

কৌশিক বলেছিল, আচ্ছা কালকে আমি যে কলটা রিসিভ করেছিলাম সেটা বর্ধমান থেকে, না দুর্গাপুর থেকে ? মনে আছে আপনার ?

—আপনার মনে নেই ? আসানসোল থেকে। কলার-এর নান্দারটা চান ?

—আছে আপনার কাছে ? আমাকে উনি বলেছিলেন, লিখেও রেখেছি ;

কিন্তু কোথায় যে ফেললাম।

—এক মিনিট। আপনি লাইনটা ছেড়ে দিন। এখনি জানাব আপনাকে। সমস্ত ইন-কামিং আর আউট-গোয়িং ট্রাংক কল লেখা থাকে একটা রেজিস্টারে।

—তাই নাকি ? তা তো জানতাম না।

—নাহলে এত চার্জ আপনারা দেন কেন পার্ক-হোটেলে ?

কৌশিক টেলিফোনটা নামিয়ে রাখল। সে মনে মনে হাসছিল—মেয়েটা ধরতে পারেনি যে, ক্রম নম্বর 78-এর বাসিন্দা গত দশ মিনিটের ভিতর বদলে গেছে। ‘বিশ্বাস’ উপাধিটাই কি ওর বিশ্বাস উৎপাদন করল ? মেয়েটিও তখন ও-প্রান্তে মনে মনে হাসছিল—ক্রম 78-এর ভদ্রলোকের কাছে হোটেলের বিজ্ঞাপনটা যে ভালই করেছে। সে জানে এ ব্যবসার জন্ত আসলে দায়ী

কলকাতার পুলিশ কমিশনার! খানদানী হোটেলেই খানদানী বড়বহুকারীর ওঠে। তাদের গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্যই এই আদেশ দিয়েছে আরক্ষা বিভাগ।

এক মিনিট পরে মেয়েটি ফোন করে জানাল, কাল আপনার কলার ছিলেন আসানসোল...

—থ্যাঙ্কু। আপনি আর কতক্ষণ বোর্ডে আছেন?

—কেন বলুন তো? কোন ইন্ট্রাকশন থাকলে আমার সাকসেসারকে বলে দাব।

—সে জ্ঞান নয়। কারণটা না জানালে বলতে আপত্তি আছে?

—না না, তা কেন? আমার এখনই ডিউটি শেষ হল। এবার কাল বেলা দশটার আসব আমি। এবার বলুন, কেন জানতে চাইছিলেন।

কৌশিক অগ্নান বদনে বললে, তাহলে কাল দশটার সময় এবার আপনাকে বিরক্ত করব। আপনার কণ্ঠস্বরটা আমার খুব ভাল লাগছে। ডোণ্ট টেক ইট আদার-ওয়াইজ—আমার এক নিকট আত্মীয়া, আত্মীয়া ঠিক নয় বান্ধবীর সঙ্গে আপনার কণ্ঠস্বরের অভূত মিল।

মেয়েটির হাসির জলতরঙ্গ ভেসে এসেছিল টেলিফোনে। বলেছিল, শুভ নাইট স্নার। সুইট ড্রিম্‌স!

—সেম টু য়ু।—লাইন কেটে দিয়েছিল কৌশিক।

তারপর আধঘণ্টা অপেক্ষা করে সে এবার ফোনটা তুলেছিল। এবার কণ্ঠস্বর অনেক ভারী, অনেক ভারট। কৌশিক বর্ধমান সদর থানার ও. সি.-কে একটা পি. পি. কল বুক করে। লাইটনিং কল। তৎক্ষণাৎ লাইন পায়। সে নূপেন ঘোষালকে জানায় যে, বাসু-সাহেব যে মিস ডিক্রুজাকে খুঁজছেন সে আসানসোলের 'অমুক' নম্বর থেকে গতকাল ফোন করেছিল। নূপেন ওকে বলে—এরপর যদি মেয়েটাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পাকড়াও করতে না পারি তবে আমার নামটা পালটে রাখবেন।

কৌশিকের এতবড় কৃতিত্বেও কিন্তু বাসু-সাহেবের কোন ভাবান্তর হল না। তিনি স্থির হয়ে বসে আছেন। যেন ধ্যানস্থ। এতক্ষণ শুনছিলেন কিনা তাই বোঝা গেল না। কৌশিক বুঝতে পারে উনি গভীর চিন্তায় মগ্ন। সে কোন সাড়াশব্দ দেয় না। পুরো পাঁচ মিনিট কি চিন্তা করে হঠাৎ নড়ে চড়ে বলেন উনি। বলেন, কৌশিক, আমি কোন চান্স নেব না! মনে হচ্ছে সমাধান হয়ে গেছে। এখনও দু-চারটে ছোট ছোট অসঙ্গতি রয়েছে বটে, কিন্তু মূল সমস্যাটার মীমাংসা হয়ে গেছে।

—কী বুঝেছেন আপনি ?

—হুই আর হুইয়ে চার !

—তার মানে ?

—তার মানে তুমি এখান থেকেই আমার এই গাড়িটা নিয়ে আসানসোল চলে যাও। এখন সন্ধ্যা সাতটা। রাত দশটা নাগাদ তুমি বর্ধমানে পৌঁছাবে। সেখানে যদি নুপেনের দেখা পাও ভাল, না পাও প্রসীড টু আসানসোল। রাত একটা নাগাদ সেখানে পৌঁছাবে। সোজা কোতোয়ালিতে চলে যাবে। সেখানে আমার পরবর্তী নির্দেশ পাবে।

—কার কাছে ?

—ডিউটি অফিসারের কাছে। আমি বাড়ি ফিরে এ. ডি. এম্ আসানসোল, ডি. এস. পি. অথবা এস. ডি. ও. সদর থাকে কনট্যাক্ট করতে পারব তাঁকে ব্যাপারটা জানাব। মার্ভার-কেস। ওরা তোমাকে সাহায্য করবেই।

কৌশিক বলে, আর যে-সে মার্ভার নয় ! লক্ষপতি এস, পি, জৈনের মার্ভার-কেস !

বাস্ উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওর কাঁধে একখানা হাত রেখে বলেন, তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ কৌশিক। আমি হত্যা তদন্তের কথা বলছি না—হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে চাইছি ! আজ রাত্রেই আসানসোলে দ্বিতীয় একটা মার্ভার হবার আশঙ্কা আছে।

কৌশিক স্তব্ধ বিষ্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

বাস্-সাহেব পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে ওর হাতে দেন, ধর !

—সে কি ! এর লাইসেন্স যে আপনার নামে !

—সে দায়িত্ব আমার, কৌশিক। কিন্তু মৃত্যুর মুখে তোমাকে তো আমি নিরস্ত্র যেতে বলতে পারি না। আমি নিজে যেতে পারছি না। কাল দশটায় আমার কেস আবার উঠবে। আশা করছি, তার আগেই ভোররাত্রে তোমার একটা ফোন পাব। আমার অহুমান যদি সত্যি হয় মিঠুকে এবার বাঁচাতে পারব !

কৌশিক অবাক বিষ্ময়ে বলে, মিঠু কে ?

স্নান হাসলেন বাস্। নিজেই বলেন যেন, আই বেগ য়োর পার্ডন ! মিসেস্ স্প্রিয়ার দাসগুপ্ত। সে এসে উঠেছে আমার বাড়িতে।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে আলিপুর কোর্ট। গাড়িতে যেতে দুই থেকে তিন মিনিট লাগার কথা। কিন্তু ঔদের লাগল আধঘণ্টা। সাড়ে ন'টার ট্যাক্সি নিয়ে বার হয়েছিলেন জেলখানার ফটক থেকে, আর আদালতের সামনে এসে যখন উপস্থিত হলেন তখন ঠিক দশটা। কারণ ছিল। জেলখানা থেকে ট্যাক্সিটা নিয়ে ওরা চলে এসেছিলেন গ্রাশনাল লাইব্রেরীতে। গাড়িটা বাগানের ধারে রেখে ড্রাইভারের পাশে বসে বাসু-সাহেব পিছন ফিরে বলেছিলেন, একটু নেমে এস, ঐ গাছতলায় বসে কয়েকটা কথা বলব।

পিছনের দিক থেকে সজ্জাতা আর সুবর্ণ নেমে পড়েছিল।

ট্যাক্সি ড্রাইভার বলে, আমাকে ছেড়ে দিন স্ত্র—

মানিব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বাসু বলেন, এটা তোমার মিটারের উপর। আধঘণ্টা দাঁড়াতে হবে।

ট্যাক্সি ড্রাইভার বুদ্ধিমান। তৎক্ষণাৎ বুঝে নেয়, মালদার শাঁসালো প্যাসেঞ্জার জুটেছে আজ তার বরাতে। সে কৃতার্থ হয়ে বলে, ঠিক আছে স্ত্র।

ঘাসের উপর ওরা তিনজন বসলেন। বাসু বসলেন, সুবর্ণ, বুঝতে পারছি সুপ্রিয় তোমার সঙ্গে দেখা করতে রাজী না হওয়াতে তুমি মর্মান্বিত হয়েছ—কিন্তু এতে তোমার দুঃখ করার কিছু নেই, এতে তোমার আনন্দিত হওয়ার কথা।

সজ্জাতা অবাক হয়ে তাকায়। আসামী সুপ্রিয় দাসগুপ্ত হাজতে তার জীবর সঙ্গে দেখা করতে না-চাওয়াটা বোঝাই থেকে ছুটে আসা তার হতভাগ্য জীবর কাছে কোন্ যুক্তিতে আনন্দের হতে পারে এটা তার মাথায় ঢোকে না। বাসু-সাহেব বলে চলেন, কাল যখন কোর্ট থেকে ফিরে এসেছিলাম, তখন আমার জয়ের সম্ভাবনা ছিল শূন্য—কেসটা হারার আশঙ্কা ছিল হ্যাণ্ডেড-পার্সেন্ট। তারপর সন্ধ্যা সাতটার সময় কৌশিক একটা অদ্ভুত আবিষ্কার করে বসল। এক লাফে আমার জেতার সম্ভাবনাটা হয়ে গেল শতকরা পঁচিশ ভাগ! আজ দুক দুক বুকে তোমাকে নিয়ে আলিপুর জেলে এসেছিলাম। তুমি হয়তো স্তনলে রাগ করবে, আমি মনে মনে ভগবানকে বলছিলাম—হে ঈশ্বর! সুপ্রিয় যেন তার জীবর সঙ্গে দেখা করতে রাজী না হয়! শেষ পর্যন্ত দয়াময় আমার প্রার্থনাতে কর্পণাত করেছেন। আয়াম হ্যাপি টু সে—ঠিক এই মুহূর্তে আমার জয়ের সম্ভাবনা সেভেনটিকাইভ পার্সেন্ট!

স্বৰ্ণ তার অক্ৰোধে চোখ জোড়া তুলে তাকায়। কথা বলে না।

হুজাতা কিন্তু স্থির থাকতে পারে না। বলে, কী বলছেন আপনি।  
সুপ্রিয়বাবু আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজী না হওয়ার আপনার এ মামলা  
জেরার সম্ভাবনা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেড়ে গেল।

—ইফ নট মোব!

—কেন?

—মেটো আমি এখন বলব না। বলতে পারি না। স্বৰ্ণকে আমি আশা  
দিয়ে হতাশ করতে চাই না। কিন্তু একটা কথা বলব স্বৰ্ণ, মন দিয়ে  
শোন—

—বলুন?

—আদালতে মনকে খুব শক্ত করে রেখ! যত বড় মানসিক আঘাতই  
আত্মক তুমি ভেঙে পড়বে না! পারবে?

স্বৰ্ণের চোয়ালের হাড় শক্ত হয়ে উঠল। বললে, আমাকে পারতেই  
হবে।

—ধর যদি আসামীর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা হয়, ভেঙে পড়বে না?

স্বৰ্ণ দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে নির্বাক বসে রইল।

বাসু-সাহেব বললেন, তোমাকে সাক্ষী দেবার জগা ডাকব আমি। পাঁচ  
মাতটা প্রশ্ন করব। কিন্তু জেরায় বিপক্ষের উকিল তোমাকে খুব নাকাল করাকে  
চাইবে। তুমি খুব শক্ত হয়ে থাকবে আর জবাবে যা বলবে তাতে নির্জ-  
থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হবে না। পারবে? উত্তরে তোমার স্বামীর ভাল  
কি মন্দ হবে তা বিবেচনা করবে না—আত্মসত্য কথা বলবে!

—তাই বলব! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—কোটে যত বড় আঘাতই  
আত্মক না কেন আমি অটল থাকব।

—জাটস এ গুড গার্ল। কিন্তু তারও আগে হয়তো একটা শক পাবে  
তুমি। কোট বসার আগে, মানে তোমাকে সাক্ষী দিতে ডাকার আগে  
তোমার কানে কানে একটা প্রশ্ন করব আমি। তুমি আমার কানে কানে তার  
সত্য জবাব দেবে। এগ্রীড?

হুজাতা বলল, এখনই সে উত্তরটা জেনে নিন না?

—সব জিনিসেরই একটা নিজস্ব সময় আছে হুজাতা। এগ্রীড?

—ই্যা!

—তবে ওঠ, চল, সময় হয়ে গেছে।

আদালত-প্রাঙ্গণে ওরা প্রবেশ করলেন দশটায়। সেখানে বাসু-সাহেবের

অন্ত ছুটি বিন্ময় ইতিপূর্বেই উপস্থিত। প্রথমত তাঁর পাশের চেয়ারে বসে আছেন বৃদ্ধ ব্যারিস্টার এ. কে. বে। প্রবেশপথেই দেখতে পেলেন বাহু-সাহেব। উনি ভেবেছিলেন, ব্যারিস্টার বে আজ আসবেন না। দ্বিতীয়ত প্রবেশপথেই দাঁড়িয়ে ছিল কৌশিক।

—কি খবর?

কৌশিক গুঁকে হাত ধরে বারান্দার একান্তে নিয়ে গেল। নিজের হাতবড়িতে সময়টা দেখল। দশটা বেজে এক। বললে, ভোর সাড়ে চারটের আসানসোল থেকে রওনা হয়েছি। মিনিট দশেক আগে এখানে পৌঁচেছি। শুধুন—জীবন বিশ্বাস ফেরার, তার এক লাখ টাকা সম্মত—

—আই নো। নেস্ট?

—মিস্. ডি. সিল্ভার আন্তানা আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম, কিন্তু সেও ভেগেছে।

—লেট হার গো টু হেল্। তার ভাই? বিকৃত মস্তিষ্ক ছেলেটা?

—তাকে উদ্ধার করে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। কোর্টে বলিয়েছি, দর্শকদের গ্যালারিতে—কিন্তু সে পাগল নয় মোটেই।

কৌশিক খেমে পড়ল। কে একজন এগিয়ে এসে বললেন, জজসাহেব এসেছেন।

বাহু বলেন, চলুন আমি যাচ্ছি—

কৌশিক বললে, আসল কথাটাই আমার বলা হয়নি—

—আসল কথাটা আমি জানি কৌশিক! তুমি মিস্টার ডি. সিল্ভার কাছে যাও। বেচারি অনেক ধকল হয়েছে এ-কদিন। ডাক্তার দেখিয়েছিলে?

একজন কোর্ট পেয়াদা ছুটতে ছুটতে এসে বললে, স্যার!

—ঠিক আছে। চল।

দ্রুত পায়ে বাহু এসে প্রবেশ করলেন। নিজ আসনের কাছে এসে জজ-সাহেবকে বাও করে বললেন, আশ্রয় সরি!

জাস্টিস ভাহুড়ী বললেন, হু অট টু বি! আমাদের প্রতিটি মিনিট হচ্ছে পাবলিক টাইম। এনি ওয়ে। আর উই অল রেডি নাউ?

বাদীপক্ষে নিরঞ্জন মাইতি উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, আমরা তো অনেকক্ষণ আগে থেকেই প্রস্তুত!

—তাহলে আদালত বসছে। গতকাল মিস্টার পাণ্ডের ক্রশ একজামিনেশনের আগেই অধিবেশন শেষ হয়েছিল। মিস্টার পাণ্ডে! টেক ইয়োর স্ট্যাণ্ড প্রীজ।

সি. বি. আই অফিসার মঞ্চের উপর উঠে দাঁড়ালেন।

জাস্টিস ভাহুড়ী বললেন, প্রিজ রিমেম্বার, হু আর আণ্ডার ওথ ওভার-নাইট !

ফিঙ্গার-প্রিন্ট এক্সপার্ট অভিবাদন করে বলেন, আই নো মি' লর্ড !

বাহু-সাহেবকে ইঙ্গিত করলেন বিচারক, প্রীজ প্রসীড !

এতক্ষণ নিম্নস্বরে কথা হচ্ছিল গুরু-শিষ্যে । ব্যারিস্টার রে সাহেব বলেছিলেন, সেজন্য কাল আমি উঠে চলে যাইনি বাহু । আমার শরীরটা ঋণ্য লাগছিল বলে চলে গিয়েছিলাম । হার জিত ' নিয়েই জীবন ! ইফ্, হু ক্যান টেক দ্য পাঞ্চ, কান্ট আই সোয়ালো ইট এ্যাজ ওয়েল ?

জজ সাহেব 'প্রীজ প্রসীড' বলার সঙ্গে সঙ্গে বাক্যালাপ অসমাপ্ত রেখে বাহু উঠে দাঁড়ালেন । সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন, মিষ্টার পাণ্ডে, আপনি কাল আপনার সাক্ষ্য বলেছেন যে, দুটি ভিন্ন লোকের ফিঙ্গারপ্রিন্ট কোন অবস্থাতেই হবহ এক হতে পারে না । তাই না ?

—তাই বলেছি ।

—যেহেতু 'এফ. পি-ওয়ান' আর বহরমপুর থানায় রক্ষিত ফিঙ্গারপ্রিন্ট দুটি হবহ এক, তাই আপনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, কাপাডিয়া এ্যাণ্ড কাপাডিয়া কোম্পানির ম্যানেজার সুপ্রিয় দাসগুপ্ত এবং খোকন ওরফে লালু অভিন্ন ব্যক্তি ? ইয়েস অর নো ?

—ইয়েস !

—আপনার দু' বছর স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড-এর ট্রেনিং এই সিদ্ধান্তে আপনাকে পৌঁছে দিয়েছে ?

—হ্যাঁ তাই !

—কিন্তু ঐ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইতিহাসে কি এমন নজির নেই যে, হায়েন্ট অথরিটি অন দ্য সাবজেক্ট বলেছেন, দুটি ফিঙ্গার-প্রিন্ট হবহ মিলে গেছে অথচ পরে প্রমাণিত হয়েছে সে দুটি বিভিন্ন লোকের ফিঙ্গার-প্রিন্ট ?

—আমি এমন কেস একটিও জানি না ।

—আপনি কি 'চেজ এ ক্রুকেড শ্রাডো' ফিল্মটা দেখেছেন ?

—অবজেকশান য়োর অনার । দ্য কোশান ইস ইররেনিভ্যান্ট, ইমপার্টিক্যান্ট এবং বর্তমান মামলার সঙ্গে সম্পর্ক বিমুক্ত ।

জাস্টিস ভাহুড়ী একটু নড়ে চড়ে বসে বললেন, অবজেকশান সাসটেইনড ! বাই...একটু থেমে বললেন, বিষয়টা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক । প্রতিবাদী কাউন্সেলকে আমি রিসেস্ পিরিয়ডে এ বিষয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে অনুরোধ করছি । আমি ঐ ফিল্মটা দেখিনি, কিন্তু—ওয়েল, হু বে প্রসীড...



বাসু-সাহেব একটা বাণ করে বলেন, ‘চেজ এক্জেকুড শ্রাডো’ ফিল্মটা বর্তমান মামলায় অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু সহযোগী তাঁর ডাইরেক্ট এভিডেন্সে রামচন্দ্রপুরের আগরওয়াল হত্যা মামলার প্রসঙ্গ এনেছিলেন। সে মামলায় বর্তমান বিচারকই বিচার করেছিলেন, এবং আমার সহযোগী আইনজীবীই পাবলিক প্রসিকিউটর ছিলেন। আশা করি আপনাদের মনে আছে, সেখানেও দুটি ফিক্সার-প্রিন্ট পুলিশ কর্তৃপক্ষ হুবহু এক বলে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে প্রমাণিত হয়েছিল সে দুটি ভিন্ন ব্যক্তির !

নিরঞ্জন মাইতি বলেন, সেটা ছিল অন্য ব্যাপার। তাতে ফিক্সার-প্রিন্ট সায়েন্সটা ভুল প্রমাণিত হয়নি।

জাস্টিস ভাহুড়ী বলেন, আমি বাদীর সঙ্গে একমত। যাই হোক, আপনি জেরা চালিয়ে যান।

বাসু-সাহেব বলেন, মিষ্টার পাণ্ডে আজ যদি আমি প্রমাণ করি আসামী সুপ্রিয় দাসগুপ্ত খোকন ওরফে লালু নয়, তবে কি আপনি মেনে নেবেন ফিক্সার-প্রিন্ট সায়েন্সটা ভুল ?

—এটা আপনার পক্ষে প্রমাণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

—ওটা আমার প্রশ্নের জবাব নয়। সে, ইয়েস অর নো !

—ইয়েস !

বাসু হেসে বলেন, যু শুড বেটার হ্যাড সেড ‘নো’ ! তাই কিন্তু প্রমাণ করব আমি !

মাইতি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন প্রতিবাদ জানাতে। তার আগেই বাসু বলেন, জাটস্ অল মি’ লর্ড !

তারপর মহামান্য বিচারককে সম্বোধন করে বলেন, আদালত অহুমতি করলে আমি আমার পরবর্তী সাক্ষীকে ডাকতে পারি !

মাইতি একটা স্বগতোক্তি করেন, এর পরেও !

জাস্টিস ভাহুড়ী তাঁর দিকে কঠিন দৃষ্টিপাত করলেন ; বাসুকে বলেন, ইয়েস প্রসীড !

—আমার পরবর্তী সাক্ষী মিসেস স্বর্ণ দাসগুপ্তা।

—মিসেস স্বর্ণ দাসগুপ্তা হাজির ?

স্বর্ণ স্বজাতার পাশ থেকে উঠে দাঁড়ালো সাক্ষীর মঞ্চে। অচঞ্চল দীপ-শিখার মত।

—আপনার নাম ?

—মিসেস স্বর্ণ দাসগুপ্তা।

—স্বামীর নাম ?

—মিস্টার সুপ্রিয় দাসগুপ্ত ।

—আপনার স্বামী কী কাজ করেন ?

—বোম্বাইয়ের কাপাডিয়া এ্যাণ্ড কাপাডিয়া কোম্পানির ম্যানেজার ।

—কতদিন বিয়ে হয়েছে আপনাদের ?

—দু' বছর ।

—হিন্দু-ম্যারেজ না রেজিলি ম্যারেজ ?

—রেজিলি ম্যারেজ ।

—আপনার স্বামী বর্তমানে কোথায় আছেন ?

—আমি জানি না ।

—অবজেকশান য়োর অনার ! জানেন না মানে কী ?—লাফিয়ে ওঠেন মাইতি ।

জাষ্টিস্ ভাতুড়ী জ্রুহুট করেন । একবার সাক্ষী একবার বাসু-সাহেবের দিকে তাকিয়ে দেখেন । বাসুকে কিছু বলতে যান, তারপর মনস্থির করে মাইতিকেই বলেন, অবজেকশান অন হোয়াট গ্রাউণ্ডস্ ?

—ওঁর স্বামী জলজ্যাস্ত চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, আর উনি বলছেন 'জানি না !'

জাষ্টিস্ ভাতুড়ী বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বলেন, আপনি কিছু বলবেন ?

—আমি কী বলব ? আমি তো শুনছি এখন । আমি সাক্ষীকে প্রশ্ন করেছি, তিনি জবাব দিয়েছেন । সহযোগী 'অবজেকশান' দিয়েছেন, তার কারণ দেখাচ্ছেন না । এখন কী বলতে পারি আমি ?

—যু আর পারফেক্টলি রাইট টেকনিকালি—জজসাহেব মাইতির দিকে ফিরে বলেন, কী আপত্তি এ প্রস্নোত্তরে তা তো বলবেন ?

—এ তো ভাষা মিথ্যা কথা—ফুঁসে ওঠেন মাইতি !

—সো হোয়াট ! সেটা জেরায় প্রশ্ন করবেন । মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার জন্য সাক্ষীর বিরুদ্ধে মামলা আনতে পারেন, অনেক কিছু করতে পারেন ! কিন্তু বর্তমান মামলায় বাধা দিচ্ছেন কোন অধিকারে ?

মাইতি অসহায়ভাবে বসে পড়েন ।

বাসুর পরবর্তী প্রশ্ন, এই কোর্ট ক্রমে আপনার স্বামী উপস্থিত আছেন ?

সাক্ষী দর্শকমণ্ডলীর উপর দৃষ্টি বুলিয়ে বলেন, আমি জানি না । দেখতে পাচ্ছি না ।

মাইতি উঠে দাঁড়ান । আবার বসে পড়েন ।

বাসু তাঁর ঝাঁ হাতটা বাড়িয়ে বলেন, আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ঐ লোকটাকে ভালভাবে দেখুন...বলুন, ঐ লোকটাকে আপনি ইতিপূর্বে জীবনে কখনও দেখেছেন ?

—না !

মুহম্মুহ হাতুড়ির আঘাত সঙ্গেও কোটরুমে নিমন্ত্রিতা ফিরে আসতে পুরো একটি মিনিট লাগল। জাস্টিস্ ভাহুড়ী এবার কিন্তু কাউকে ধমকালেন না।

বাসুর পরবর্তী প্রশ্ন, কাঠগড়ায় ঐ লোকটা আপনার দু-বছরের বিয়ে করা স্বামী, কাপাডিয়া এ্যাণ্ড কাপাডিয়া কোম্পানির ম্যানেজার স্প্রিয় দাসগুপ্ত, এম. এ. নয় ?

—না !

মাইতি আর আত্মসম্বরণ করতে পারেন না। লাফিয়ে ওঠেন, দিস ইস প্রিপস্টারাস মি' লর্ড ! এসব ঠর অতি নাটকীয় প্যাচ !

বাসু একধাপ এগিয়ে এসে উচ্চকণ্ঠে বলেন, মাননীয় আদালতের কাছে আমার একটি আর্জি আছে ! যেহেতু এ পর্যন্ত বিচার আমার মক্কেল স্প্রিয় দাসগুপ্তের অল্পপস্থিতিতে সংঘটিত হয়েছে তাই আমি এ মামলার আগন্ত নাকচ করবার প্রার্থনা জানাচ্ছি !

বিচারকক্ষে পুনরায় গুণ্ডগোলের সূত্রপাত হতেই জাস্টিস্ ভাহুড়ী একবার জোরে হাতুড়ির আঘাত করেন। স্তব্ধতা ফিরে আসে। বিচারক বলেন, যেহেতু এখনও চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়নি যে, আপনার মক্কেলের অল্পপস্থিতিতে এ মামলার অধিবেশন হয়েছে তাই আপনার প্রার্থনা এখনই মঞ্জুর করা যাচ্ছে না ! যু মে প্রসীড !

—চাটস্ অল মি' লর্ড !—বাসু মাইতিকে বলেন, যু মে ক্রশ এক্সামিন হার।

আহত সিংহের মত লাফ দিয়ে ওঠেন মাইতি। নাটকীয়ভাবে সাক্ষীর লায়নে এগিয়ে এসে বলেন, আপনি বললেন যে, ঐ লোকটা আপনার স্বামী নয় ?

—তাই বলছি !

—তাহলে আপনার স্বামী কে ?

—স্প্রিয় দাসগুপ্ত !

—ঐ উনিই তো স্প্রিয় দাসগুপ্ত !

—হতে পারে ঠরও তাই নাম, কিন্তু উনি আমার স্বামী নন !

মাইতি অসহায়ভাবে মাথা নাড়েন। বলেন, রাতারাতি কোথা থেকে

আমদানি হলেন আপনি ?

—অবজেকশান য়োর অনার ! সহযোগীর প্রশ্নের ভাবায় আমার আপত্তি ।

—অবজেকশান সাসটেইণ্ড ! আপনি সংঘত ভাবায় প্রশ্ন করুন ।

—আপনার কটা বিয়ে ?

—অবজেকশান ! সহযোগী আদালতের নির্দেশ মানছেন না । তাঁর ভাষা এখনও অশালীন !

জাঙ্গিস ভাদুড়ী মাইতিকে ধমক দেন, আপনি আপনার ভাবাকে সংঘত করুন, না হলে ব্যাপারটা আমি আপনাদের বার-এ্যাসোসিয়েশানকে জানাতে বাধ্য হব !

মাইতি কিছু বলতে গেলেন । পারলেন না । মরিয়া হয়ে বললেন, আমি সময় চাইছি মি' লর্ড । এ মেয়েছেলেটা কে, সে খবরটা—

—অবজেকশান । 'এই ভদ্রমহিলাকে' বলুন !

মাইতি প্রায় ভোংলা হয়ে গেলেন ।

জাঙ্গিস ভাদুড়ী বলেন, আপনারা দু-পক্ষ যদি রাজী থাকেন তাহলে আমি দশ মিনিটের জন্ত কোর্ট স্থগিত রেখে আমার চেম্বারে আপনাদের দুজনের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করতে চাই । আফটার জল, আমাদের উদ্দেশ্য সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা ।

বাহু বলেন, আমি রাজী, কিন্তু তার আগে আমি একটা কাজ করতে চাই । আমি জানি, ঐ ভদ্রমহিলার স্বামী এই আদালতে উপস্থিত আছেন । তাঁর জীবন সংশয় । তাঁকে সনাক্ত করে সর্বপ্রথম পুলিশের জিহ্বায় দেওয়ার প্রয়োজন । আপনি কি ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দেবেন ?

—ইয়েস ! ডু এ্যাস্‌ যু প্লীজ !

বাহু-সাহেব দর্শকমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে বললেন, মিষ্টার সুপ্রিয় দাসগুপ্ত, ম্যানেজার, কাপাডিয়া এ্যাণ্ড কাপাডিয়া কোম্পানি, যদি এ আদালতে উপস্থিত থাকেন তবে দয়া করে উঠে দাঁড়ান ।

দেখা গেল ভীড়ের মধ্যে একজন একহারা ফর্সা ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়েছেন । তাঁরও বড় বড় জুলফি আছে । কিন্তু কোন মুখই তাঁকে আসামীর সমজ্জ-ভাই বলে ভুল করবে না—চেহারা সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও ।

—আপনি এগিয়ে আহ্নন !

দীর পদবিক্ষেপে ভদ্রলোক এগিয়ে আসেন ।

—আপনিই সুপ্রিয় দাসগুপ্ত—ম্যানেজার, কাপাডিয়া এ্যাণ্ড কাপাডিয়া কোম্পানি ?—প্রশ্ন করেন বাহু ।

—হ্যা!

—সাক্ষীর মধ্যে দাঁড়ানো ঐ স্বর্ণ দাসগুপ্তা আপনার দ্বী?

লোকটা মুখ তুলে তাকালো। দেখলো চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো মেয়েটি। সে কিন্তু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা বললে, হ্যা, আমার দ্বী।

মাইতি বললেন, কিন্তু এটা আমরা মেনে নিতে রাজী নই। এরা দুজনেই জাল হতে পারে! সমস্ত ব্যাপারটাই একটা মেলোড্রামাটিক হচ্ পচ্ হতে পারে।

জাঙ্গিস্ ভাহুড়ী বললেন, মিস্টার বাহু, আপনি কি কোন পথ দেখাতে পারেন যাতে প্রমাণ করা যায়—এঁরা দুজন সত্যি কথা বলছেন, অর্থাৎ আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ঐ লোকটা স্প্রিয় দাসগুপ্ত নয়?

—কিছু সময় পেলে নিশ্চয় পারব, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তেই সেটা কেমন করে সম্ভব?

—তুল বললে বাহু! এই মুহূর্তেই সেটা প্রমাণ করা সম্ভব।

সকলের দৃষ্টি গেল ডিফেন্স কাউন্সেলারদের চিহ্নিত কোণাটায়। উঠে দাঁড়িয়েছেন অসীতিপর বুদ্ধ ব্যারিস্টার এ. কে. রে। তিনি একটি বাণু করে বলেন, আদালত যদি আমাকে অনুমতি দেন—আমি পাঁচ মিনিটের ভিতর চূড়ান্তভাবে সমাধান করে দেব সমস্যাটা—

জাঙ্গিস্ ভাহুড়ী বলেন, ইয়েস! ডু ইট প্লীজ!

—মিস্টার পাণ্ডে এখানে উপস্থিত। তিনি এই দু-জনের ফিগার-প্রিন্ট নিন। এখনই! তারপর ঐ নথিটা দিন। পিপলস্ এক্সিবিট নম্বর সেভেন। ওটা হচ্ছে সাদার্ণ এ্যাভিড্যার একটা বাড়ির বিক্রয়-কোবলা। বিক্রেতা—পাণ্ডার অফ এ্যাটর্নি হোল্ডার স্প্রিয় দাসগুপ্ত। সাড়ে চার লাখ টাকার সম্পত্তি বিক্রয় করতে হলে সই ছাড়া টিপছাপও দিতে হয়। মিস্টার পাণ্ডে ওটা দেখে পাঁচ মিনিটের ভিতর সনাক্তকরণ চূড়ান্তভাবে করে দিতে পারবেন!

আধঘণ্টার জন্ত কোর্ট এ্যাডজর্ন করে জজ-সাহেব তাঁর খাস কামরায় চলে গেলেন। সেখানে ডাক পড়ল বাহু, মাইতি এবং এ. কে. রে-র। ইতিমধ্যে পাণ্ডে-সাহেব তাঁর পরীক্ষাকার্য করে জানিয়েছেন, আসামী আর যেই হোক মোহনবরুণ কাপাডিয়ায় ওকালতনাмаধারী স্প্রিয় দাসগুপ্ত নয়। দর্শকের আসন থেকে যে ভক্তলোক উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তিনিই তাই।

জাঙ্গিস্ ভাহুড়ী বলেন, মিস্টার বাহু, আপনি যদি ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দেন, তাহলে মামলাটার—অবশ্য মামলার নিষ্পত্তি তো হয়েছে। আপনার মক্কেলের অনুপস্থিতিতে—

মাইতি বলেন, তা কেন। ওর মকেল তো ঐ আসামী। তার অপরা-  
ভো প্রমাণিত হয়েছে—

—মা হয়নি।—বাধা দিয়ে বলেন এ. কে. রে—মামলার তাকে অসংখ্য-  
বার ম্যানেজার, কাপাডিয়া অ্যাণ্ড কাপাডিয়া কোম্পানি বলে আপনি উল্লেখ  
করেছেন। সে তা নয়। সে পুনর্বিচার দাবী করতে পারে আইনত।

বাসু-সাহেব বলেন, সে সব কথা পরে। আপাততঃ এই নিন আমার  
বরখাস্ত। বর্তমান মামলার আসামী খোকন ওরফে লালু আমার মকেল নয়।  
স্টেট-ভার্সেস সুপ্রিয় দাসগুপ্তের মামলা ডিসমিস্ হয়েছে জানলেই আমার ছুটি।

জাস্টিস ভাহুড়ী বলেন, মামলা তো ডিসমিস্ হয়েই গেছে। শুধু আমার  
অ্যানাউন্স করা বাকি। কিন্তু রহস্তটা যে কিছুই পরিষ্কার হল না  
বাসু-সাহেব।

বাসু হাত দুটি জোড় করে বলেন, আমার এক অহুগত ভক্ত আছে। সে  
গোয়েন্দা গল্প লেখে। কিছুদিনের মধ্যেই তার লেখা ছাপা বই বাজারে  
বেকবে। আপনাকে না হয় এক কপি কমপ্লিমেন্টারি পাঠিয়ে দিতে বলব।

উঠে দাঁড়ান তিনি।

এ. কে. রে মাইতির দিকে ফিরে বললেন, আপনার নিয়ন্ত্রণে এসেছিলাম।  
আই এক্সপেড ইট থরোলি। আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ।

মাইতির মুখটা কালো হয়ে গেল। তবু কাঠ-হাসি হেসে শুধু বললেন,  
হেঁ হেঁ!

জাস্টিস ভাহুড়ী বললেন, অনেকদিন পর আপনাকে দেখলাম রে-সাহেব!  
শরীর ভাল তো?

—ভাল না থাকলে পর পর দুদিন অ্যাটেণ্ড করি?

জাস্টিস ভাহুড়ী বলেন, বারওয়েল ছাড়া সেকেও রিটার্ন করায় কলকাতার  
'বার' কিন্তু কানা হয়ে গেছে রে-সাহেব।

রে বললেন, আই বেগ টু ডিফার! নূতন স্বর্ষের উদয় হয়েছে কলকাতার  
বারে—'পিয়্যারী-ম্যাসন অফ দি টেস্ট!' অর্থাৎ সাদাবাংলায় : পূর্বাঞ্চলের  
'মেরে পেয়ারী বাঙ্গাকার'।

দক্ষ

কোর্ট-ফেরত সবাই এসে বসেছেন বাসু-সাহেবের বাড়ির সামনের লনে।  
বৈশাখী সন্ধ্যা, ঘরের চেয়ে বাইরেই আরামপ্রদ। তার উপর চাঁদনী রাত।  
গোল হয়ে বসেছেন বাসু, রানী, কৌশিক, স্বজ্ঞাতা, সুপ্রিয়, স্ববর্ণ,

আর এ. কে. রে। বুদ্ধ ব্যারিস্টার এখনও বাড়ি যান নি। ব্যাপারটা লগ্নে  
জেনে না গেলে নাকি তাঁর নিজস্ব ব্যাধাত হবে।

স্বজ্ঞাতা বললে, এবার বলুন বাসু-মামু। কী করে কী হল।

কৌশিক বাধা দিয়ে বললে, আমি কিন্তু ইন্টারেস্টেড জানতে, আপনি  
কোন পর্ষায়ে কতটা বুঝতে পেরেছিলেন, কোন কোন ক্লয়ের সাহায্যে একা  
কখন সবটা বুঝলেন।

এ. কে. রে. বলেন, অর্থাৎ আমাদের কাছে এটা আড্ডা। তোমার কাছে  
ট্রেনিং ক্লাস।

রানী বললেন, তা তো হবেই। এ. কে. রে-র পতাকা তুলে নিয়েছিলেন  
পি. কে. বাসু—ভবিষ্যতে সেটাই তো বহন করবেন কে. মিত্র।

কৌশিক বললে, ভবিষ্যৎ পড়ে মরুক। আপাততঃ আমি হচ্ছি পিরায়ি  
মেসনের সাক্ষর—পল ড্রেক। কিন্তু আর দেবী নয়। শুরু করুন  
আপনি।

বিশ্ব খাবারের ট্রে নিয়ে এসে পরিবেশন শুরু করল।

বাসু বললেন, শুরু আমি করব না, স্থপ্রিয় বলে যাও তোমার অভিজ্ঞতা—

—আমি স্ববর্ণকে বলে এসেছিলাম, সাতদিনের জন্ত কলকাতা যাচ্ছি  
কেন যাচ্ছি, তা ও জানত না। মিস্টার কাপাড়ির নির্দেশে আমি ব্যাপারট  
ওর কাছেও গোপন করি। কলকাতায় এসে পার্ক হোটেলে উঠি। আমি  
আর জীবনবাবু। শুভক্রাইডের আগের দিন এগারোই বাড়িটা বিক্রি হল  
যদুপতি নগদ দু-লক্ষ টাকা আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল, এগারো  
লক্ষালে। সেটা হোটেলের ভণ্টে রেখে আমরা রেজিস্ট্রেশন অফিসে যাই।

—হোটেলের আপনারা কত নম্বর ঘরে উঠেছিলেন ?

—39 নম্বরে। ডবল্ বেড কক্ষ। একসঙ্গেই ছিলাম। বাই হোক  
রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলে জীবনবাবু যদুপতিকে বললেন, স্থার আমাদের মিত্র  
মুখ করিয়ে দেবেন না ? যদুপতি শুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। তারপ  
ক্ষিরে এসে আমাকে বলল, আজ রাত্রে আপনাকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করছি  
মোকাঘোতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার। আমি রাজী হই। আমি আর যদুপতি  
রাত ন'টা পর্যন্ত মোকাঘোতে ছিলাম। তারপর ফিরে আসি হোটেল  
রাত দশটার জীবন ফিরে আসে। সারাদিনের খকলে আর কলকাতা  
গরমে আমার ভীষণ মাথা ধরেছিল। বেয়ারাটাকে ডেকে আমি সারিড  
আনতে দিচ্ছিলাম। জীবন বললে, আনাতে হবে না, তার কাছেই আছে  
সে আমাকে একটা ট্যাবলেট দেয়। আমি খেয়ে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ি

তার পরের কথা আর কিছু জানি না আমি। যখন জ্ঞান হয়, দেখি, আমি হাত-পা বাঁধা অবস্থায় কোন অজানা জায়গায় পড়ে আছি। মাঝে মাঝে একটি অচেনা স্ত্রীলোককে দেখেছি। জ্ঞান হলেই সে আমাকে একটা পানীয় খেতে দিত। প্রচণ্ড তেষ্টায় আমি সেটা ঢুক ঢুক করে খেয়ে ফেলতাম। এখন হিসাব করে দেখছি, এভাবে সাতদিন আমি ঘুমিয়েছি। তারপর গতকাল শেষ রাতে কৌশিকবাবু আমাকে উদ্ধার করেন আসানসোল থেকে। এ-ছাড়া আমি কিছুই জানি না।

বাহু-সাহেব ওর স্বত্র তুলে নিয়ে বললেন, সমস্ত ব্যাপারটার মূল পরিকল্পনা হচ্ছে জীবন বিশ্বাসের। লোকটার সঙ্গে আগার ওয়াল্ড-এর দু-একজনের জানা শোনা ছিল। মাস কতক আগে থেকেই সে জানতে পারে যে, মোহন-স্বরূপ কাপাডিয়া এভাবে বাড়িটা বিক্রি করবেন। তখন থেকেই সে সক্রিয় হয়। খোকন বা লালুর সঙ্গে যোগাযোগ করে। খোকন মিস্ ডি-সিল্ভার মাধ্যমে এই পরিকল্পনাটা ছকে। ডি. সিল্ভার এক ভাই বাঁচি উন্নাদাশ্রমে ছিল। সে তাকে নয় তারিখে ওখান থেকে খালাস করে এনে পার্ক-হোটেলে তোলে এবং নয়-দশ তারিখ বায়ে বায়ে তাকে গাড়ি করে নিয়ে বার হয়। ওর ভাই ছিল অড়ভরত প্রকৃতির পাগল। তাই এতে তার কোন অস্বীকার হয়নি। দশ তারিখে সে তাকে কলকাতার কোন প্রাইভেট উন্নাদাগারে ভর্তি করে দিয়ে একাই ফিরে আসে। হোটেলের সবাই জানত ভাইটি হোটেলেরই আছে। এগারোই রাতে বড়বাজারে জৈনের গদিতে ডাকাতি করে খোকন এসে আশ্রয় নেয় ডি. সিল্ভার ঘরে। মধ্যরাতে সুপ্রিয় অজ্ঞান হয়ে গেলে তাকে ধরাধরি করে পাশের ঘরে আনা হয় এবং খোকন সুপ্রিয়র সীটে চলে যায়। বারো তারিখ সকাল থেকে সে সুপ্রিয়র ডুম্বিকা নেয়। বারো তারিখ সকালেই ডি. সিলভা একটা অ্যাডামাভাবে করে বর্ধমান চলে যায় নড়ে যায় অজ্ঞান অবস্থায় আসল সুপ্রিয়, তার ভায়ের পরিচয়ে।

কৌশিক বলে, আমি ব্যাপারটা বুঝলাম না। সুপ্রিয়বাবু, আপনি কী জীবনবাবুকে বধে মেলে তিনখানা টিকিট কাটতে বলেননি।

—আদৌ না। আমার পেনে ফেরার কথা ছিল। টিকিটও কাটা ছিল।

—তাহলে ?

বাহু-সাহেব বলেন, জীবন বিশ্বাসের পরিকল্পনাটা তুমি বুঝতে পারনি কৌশিক। তার প্ল্যান ছিল—বধে মেলে ওরা দু'জন, জীবন আর খোকন, যওনা হবে। রেলওয়ে রেকর্ড-এ থাকবে—কুপেতে ছিলেন মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস বাসুদেব আর তার পাশের কম্পার্টমেন্টে যাচ্ছিলেন জীবন বিশ্বাস।



গাড়ি বর্ধমানে পৌঁছালে মিস্ ডি. সিলুভা তার তথাকথিত অল্পহুড়া অর্থাৎ সুপ্রিয় দাসগুপ্তকে নিয়ে বিনা টিকিটে কামরায় উঠবে। সে আদল সুপ্রিয় দাসগুপ্তকে শুইয়ে দেওয়া হবে কুপের লোয়ার বার্ধে তারপর খোকন আর ডি. সিলুভা বর্ধমানেই নেমে বাবে দু-লাখ টাকা সমেত। রাত ভোর হলে জীবন এ কামরায় এসে চীৎকার চেষ্টামেচি জুড়ে দেবে। দেখা বাবে, সুপ্রিয় বিষ খেয়ে মারা গেছে এবং তার দুটি স্মার্টকে নেই। জীবন ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে নেই। সে তার ম্যানেজারের নির্দেশ তিনখানা টিকিট কেটেছে। ম্যানেজার সুপ্রিয় কোথা থেকে একা অসচ্চরিত্রের মেয়েছেলে জুটিয়ে এনেছিল তা সে কেমন করে জানবে তার সন্দেহ হয়েছিল কিনা?—ই্যা হয়েছিল। তাই ঘটনার অনেক আগে সে ক্রিমিনাল ব্যারিস্টার বাসু-সাহেবকে তার আশঙ্কার কথা জানিয়েছিল বিশ্বাস না হয়, তাকে জিজ্ঞাসা করুন।

স্বজ্ঞাতা বলে, চমৎকার প্র্যান !

কৌশিক বলে, দাঁড়াও, দাঁড়াও ! তাহলে ঐ জৈন-সাহেবের রিভা ভারটা ও কামরায় এল কেমন করে ?

বাসু হেসে বলেন, সেটা জীবনের পরিকল্পনা অল্পহুয়াই নয়। খোকনে পরিকল্পনা অল্পহুয়াই, ঐ ডি. সিলুভার সঙ্গে যৌথভাবে। ওরা দু-জনে হতে বর্ন-ক্রিমিনাল। দু-লাখ টাকা তিনভাগ করার চেয়ে তারা দু-জনে সেটাকে দু-ভাগ করতে চাইল। যাকে বলে ডবল-ক্রশ। ব্যবস্থা করা হল—ঐ ছাড়ার আগে ওদের দলের একজন একটা লোডেড-রিভলভার খোকনকে পৌঁছে দেবে। রক্তক্ষার সি-ক্যুপেতে অতি অনায়াসে খোকন জীবনকে হত করত। ট্রেন বর্ধমানে পৌঁছালে জীবনের মৃতদেহকেও ঐ ক্যুপেতে রেখে তারা সুযোগমত বর্ধমানে বা আসানসোলে নেমে যেত। পরদিন জোড়াখ আবিষ্কৃত হত-ঐ ক্যুপেতে। কেউ জানতে পারত না—কে খুন করে টাকার নিয়ে ভেগেছে !

রানী বলেন, তাহলে জৈনকে কে খুন করেছিল ?

—খুব সম্ভব খোকন নিজেই। স্কুয়ার বোস-এর এভিডেন্স থেকে তা মনে হয়। আপনি কি বলেন ?—বাসু-সাহেব প্রশ্ন করেন এ. কে. রে-কে।

—আই বেগ টু ডিফার !—বললেন এ. কে. রে। একহারা চেহারাকর্ষা রঙ আর বড় বড় জুলফি ছাড়া আর কোন যুক্তি নেই।

—কিন্তু বিকল্প যুক্তিও কিছু নেই।—বললেন বাসু-সাহেব।

—আছে। প্রকাণ্ড একটা বিকল্প যুক্তি আছে। তাই যদি হত, তাহ

জনের রিভলভারটা এগারোই রায়ে খোকনের কাছে থাকারই সম্ভাবনা। সন্দেশে টোনে অল্প কেউ তাকে ঐ রিভলভারটা পৌছে দিতে আসত না। এগারোই তারিখ থেকে তার পকেটে থাকত একটা রিভলভার, যার নম্বর 159362।

স্বজ্ঞাতা অবাক হয়ে বললে, নম্বরটা মুখস্ত আছে এখনও।

—বাঃ! কোটে স্বকর্ণে শুনলাম যে!

কৌশিক বললে, সে তো আমরাও শুনেছি। ভুলে মেয়ে দিয়েছি।

এ. কে. যে বললেন, তাহলে কোনদিন ‘পল-ড্রেক অব দ্য ট্রিস্ট’ হতে পারবে না তুমি! কিন্তু একটা ব্যাপার এখনও পরিষ্কার হয়নি। সুপ্রিয়বাবু—তুমি কি এগারোই সকালে লেট ল্যামেটেড মিস্টার জৈনের বাড়িতে ফোন করেছিলে?

—না তো! ফোন করব কেন?

—ধর, ঐ ছড়ির ব্যবস্থা পাকা করতে?

—সে কথা তো হয়েই ছিল তাঁর সঙ্গে। নেহাৎ তিনি রাজী না হলে আমি অল্প কারও দ্বারস্থ হতাম। কাপাডিয়া কোম্পানির ম্যানেজার হিসাবে আমি কলকাতার অনেক ধনী ব্যবসায়ীকে চিনি। আর কাউকে না পেলে ‘দুপতীর কাছ থেকেই ছড়ি নিভাম।

—যদুপতি রাজী না হলে—

—অ্যাট লিস্ট দু-লাখ টাকা স্ফটিকেশে নিয়ে বোম্বাই মেলে যেতাম না। হয় কোন ব্যাঙ্ক ভণ্টে রাখতাম—নেহাৎ না হয় প্লেনে নিয়ে যেতাম টাকাটা!

কৌশিক বলে, এবার আপনি বলুন শ্রীর, কেমন করে আন্দাজ করলেন ব্যাপারটা।

বাহু-সাহেব বুঝিয়ে বলেন, আমার প্রথম সন্দেহ জাগে জীবন ঠিক যে মুহুর্তে প্রথমবার আমার কক্ষে ঢোকে। কিন্তু সেটা আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। সেটা একটা অতুভূতি। আমার সন্দেহ জাগে। জীবন যে সন্দেহজনক ব্যক্তি এ আশঙ্কা তোমাদের সকলেরই হয়েছিল। আমার খটকা লাগল মোহনস্বরূপ কাপাডিয়ার টেলিগ্রামের একটি শব্দে। উনি লিখেছেন, ‘হিজ ইন্টিগ্রিটি অ্যাণ্ড এক্সিসিয়েন্সি ইজ বিয়ণ্ড কোন্সেন’ অর্থাৎ তার সততা আর কর্মদক্ষতা সন্দেহের অতীত। ঐ ‘কর্মদক্ষতা’ শব্দটায় খটকা লাগল আমার। মোহনস্বরূপ একজন কোটিপতি—তাঁর ম্যানেজারের ‘কর্মদক্ষতার’ বিষয়ে এতবড় সার্টিফিকেট তিনি কেন দিলেন? অমন দক্ষ ম্যানেজার বোম্বাই রেল-এ স্ফটিকেশে করে পাচার করা ছাড়া আর কোন রাস্তা খুঁজে

পেল না। দু-লাখ টাকা। দ্বিতীয়ত এতবড় কোম্পানির ম্যানেজার খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়ল অথচ বোম্বাই থেকে কোন সাড়া শব্দ নেই কেন? মালিক না হয় বিদেশে—কিন্তু আর সবাই তো আছে—

—কিন্তু ওরা দু-জন তো গোপনে সম্পত্তিটা বেচতে এসেছিল। আর কেউ হয়ত জানে না—

—মানলাম। কিন্তু স্বাভাবিক কি হত? এক্ষেত্রে জীবন নিজেই ট্রাজ্জি কল করে হেড অফিসে জানাতো, কোন একটা কাজে মালিকের নির্দেশে কলকাতা এসে ওরা ভীষণ বিপদে পড়েছে!

—তা ঠিক!

—তৃতীয়ত, খুনের মামলায় যে লোকটা ফাঁসি যেতে বসেছে সে তার উকিলের মাধ্যমে বাবা-দাদা-জী-বন্ধু কাউকে খবরটা জানাবে না? সাহায্য চাইবে না? চতুর্থত, জীৱ আগমন আশঙ্কায় সে অমন শিউরে উঠল কেন? আর সবচেয়ে বড় কণ্ট্রাডিক্শন হচ্ছে সুপ্রিয় দাসগুপ্তের চরিত্র-চিত্রণ! পাণ্ডে সাহেবের আঁকা ছবির সঙ্গে মোহনস্বরূপের আঁকা ছবিখানার আশ্চর্য-জমীনি ফারাক! আমার মনে হল—দুটো লোক আলাদা। সেটা নিঃসন্দেহ হলাম যখন আলিপুরের হাজতে আসামী তার জীৱ সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করল। তার আগেই অবশ্য আমার সন্দেহ হয়েছিল—ডি. সিল্ভার হেপা-জতেই আছে আসল সুপ্রিয়। আসামী যদি সুপ্রিয় না হয় তাহলে কখন সে সুপ্রিয়ের চরিত্রে অভিনয় শুরু করেছে? নিঃসন্দেহে এগারোই দুপুরের পরে। কারণ দলিলে নিশ্চয় আসল সুপ্রিয় সই করেছে? সেটা সন্দেহাতীতরূপে দেখে নেবে যদুপতি। অথচ যদুপতি বলছে রাত ন'টা পর্যন্ত সে আসল সুপ্রিয়কে দেখেছে। যদুপতির মিথ্যাভাবণের কোন যুক্তিপূর্ণ কারণ নেই। সে আসল সুপ্রিয়কে নিশ্চিত চেনে, যেহেতু রেজিষ্ট্রেশান অফিসে তাকে সনাক্ত হতে দেখেছে। তাহলে এগারোই রাত ন'টার পর এবং বারই বেলা দশটার আগে—

—কেন, বারই বেলা দশটার আগে কেন?—প্রশ্ন করে সুজাতা।

—যেহেতু বারো তারিখ বেলা দশটার কোশিক পার্ক হোটেল থেকে টেলিফোনে জানায় সে সুপ্রিয়কে দেখেছে, যে-সুপ্রিয়কে সে আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দেখেছে। ফলে ঐ রাতেই মাহুঘাটীর বদল হয়েছে। ঐ পার্ক হোটেল থেকেই। অথচ দেখা যাচ্ছে, ঐ বারো তারিখেই বেলা নয়টার সময় ওদের পাশের ঘর থেকে মিস্ ডি. সিল্ভা তার পাগল ভাইকে নিয়ে হোটেল ছেড়ে চলে যায়। বাই রোড—দিল্লী রোড ধরে। বাকিটা দুইয়ে দুইয়ে চার...

ঠিক সেই সময়েই একটা প্রকাণ্ড গাড়ি এসে থামল পোর্টে। নেমে এলেন  
কজন সুসজ্জিত যুবক। তাঁকে দেখে সুপ্রিয় উঠে দাঁড়ায়, হ্যালো! আপনি?

ভদ্রলোক গুরুত্বপূর্ণ মত হাত দুটি জোড় করে বলেন, চুমা মাংতে  
সেছি। ঔর ছিপিয়ে থাকার জরুরং না আছে।

সুপ্রিয় বলে, আপনাদের সঙ্গে এঁর পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি  
ছেন...

বাধা দিয়ে কৌশিক বলে, প্রয়োজন হবে না। ঔর ভাষাতেই আমাদের  
মিল হয়েছে!

ভদ্রলোক একগাল হেসে বলেন, আমিও আপনাকে পহ্চানতে পেরেছি  
সুকৌশলীদাদা!

কৌশিক বলে, আপনার গাড়ির ডায়নামো ঠিক হয়ে গেছে?

—বিলকুল!

—আর সেই মাছের কাঁটাটা?

—না পাতা!—তারপর হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গিতে কৌশিকের সামনে  
পাখাটা নিচু করে বোঁগ করেন, মাথা পাতিয়ে দিলেন সুকৌশলীদাদা!  
মগর চাহেন তো এক ঝাপ্পড় মারুন! লেकिन শালা-বাহানচোং করবেন  
না!

—বলেই পান-জর্দায় লাল আধ-হাত জিব বার করেন। দুটি হাত কানে  
হিয়ে যোগ করেন, সীয়ারাম! বিলকুল নজর হয় নাই। লেডিসরা আছেন  
থানে!

## পথের কাঁটা

ইন্টারকমটায় ভেসে এল মিসেস বাহুর কণ্ঠস্বর, তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে চান—একজন নয়, দুজন—মিস নীলিমা সেন আর মিস্টার জয়দীপ রায়। পাঠিয়ে দেব ?

বাহু-সাহেব একটা আইনের বইয়ে ডুবে ছিলেন। সেটা বন্ধ করে বলেন, মকেল কে ? মিস সেন, না মিস্টার রায় ?

—এখনও বোঝা যাচ্ছে না। সম্ভবত যৌথ। জিজ্ঞাসা করব ?

—না থাক। পাঠিয়ে দাও। যুগলেই—

মিস্টার পি কে. বাহু বার-এ্যাট-লকে যারা চেনেন না তাঁদের কাছে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে হয়। প্রসন্ন কুমার বাহু একজন অত্যন্ত নাম করা ক্রিমিনাল সাইডের ব্যাবিস্টার। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। প্রথম যৌবনে প্রভূত উপার্জন করেছেন—ফাঁসীর দড়ি আলাগা করে বহবার খুনের আশামীকে আদালত থেকে ছাড়িয়ে এনেছেন। তারপর বছর আটেক আগে একটি পথ দুর্ঘটনায় ঠুঁদের একমাত্র কন্যাটি মারা যায়, মিসেস রানী বাহু সারা জীবনের মত পঙ্গু হয়ে পড়েন। এ জন্ত প্র্যাক্টিস ছেড়ে দিয়েছিলেন বাহু-সাহেব। প্রায় দু-বছর পঙ্গু স্ত্রীকে সাহচর্য দেওয়াই ছিল তাঁর কাজ। তারপর স্বামী-স্ত্রী দুজনেই একদিন অহুতব করলেন—এভাবে বাকি জীবন অতিবাহিত করার কোন অর্থ হয় না। সম্প্রতি বাহু-সাহেব আবার প্র্যাক্টিস শুরু করেছেন। চেয়ারটা তাঁর নিউ-আলিপুরের বসতবাড়ির এক তলায়। তার অপর অংশে, ঐ এক তলাতেই, ‘স্বকোশলী’র অফিস। ‘স্বকোশলী’ একটি প্রাইভেট ডিক্টেটিভ এজেন্সি। পাটনারশিপ বিজনেস। ঠুঁরাও স্বামী-স্ত্রী মিস্টার কৌশিক মিত্র এবং তাঁর স্ত্রী স্বজ্ঞাতা। সন্তবিবাহিত। যারা ‘নাগচন্দা’ উপন্যাস পড়েছেন অথবা ‘যদি জানতেম’ ছায়াছবি দেখেছেন তাঁরা জানেন এই কৌশিক আর স্বজ্ঞাতা কী-ভাবে বাহু দম্পতির স্নেহভাজন হয়ে পড়ে। পুনর্মুখিক হবার পর থেকেই ঠুঁদের জীবন ‘কটকাকীর্ণ’ হয়ে পড়েছে ‘সোনার কাঁটা’ বা ‘মাছের কাঁটা’র সংবাদ যদি আপনারা না যোগে থাকেন তাহলে আমি নাচাৰ।

দীর্ঘদিন পূর্বে বাসু-সাহেব ব্যারিস্টার এ. কে. বেব জুনিয়র ছি-  
প্র্যাক্টিস শুরু করেছিলেন। কলকাতা বারের ঐ প্রবীণতম অবসরঃঃ  
ব্যারিস্টারের কথা 'মাছের কাঁটার' বলা হয়েছে। তিনিই আদর করে তাঁর  
শিষ্যের নামকরণ করেছিলেন : পিয়ারি ম্যাসন অব স্কট লেস্ট।

যাঁরা ইংরাজি গোয়েন্দা গল্প পড়েন তাঁরা সহজেই বুঝবেন এ নামকরণের  
পিছনে ইঙ্গিতটা কোথায়। ব্যারিস্টার বাসুর কর্ম পদ্ধতি, সওয়াল-জবাব  
—বস্ত্ত অভিযুক্তের মুশ্কিল-আসানের প্রচেষ্টা ঐ পিয়ারি ম্যাসনের হাঁচে  
ঢালা। জুনিয়ার কেস সাজিয়ে দেবে, আর আদালতে গিয়ে 'মিলড' বলে 'বাও'  
করে বক্তৃতা করে কর্তব্য শেষ করার মাহুশ তিনি নন। বস্ত্তঃ দেখা গেছে  
অভিযুক্তকে মুক্ত করেই তিনি ক্ষান্ত হন না, প্রকৃত অপরাধীকে চিহ্নিত করতেও  
উদ্যত হন। সে কাজটা যে ব্যারিস্টারের নয় এ-কথা তাঁকে কে বোঝাবে ?  
সে হিসেবে কৌশিক মিত্রের ভূমিকাটা হচ্ছে 'পল ড্রেক'-এর। আর 'ডেলা  
ফ্লট' এক্ষেত্রে বাসু সাহেবের সেক্রেটারী নন, কৌশিক মিত্রের মিত্রাণী স্বজাতি।  
ওদের গোয়েন্দা অফিসের নামকরণটাও বাসু-সাহেবের করা—নামটায় জী ও  
স্বামীর নামের আন্তঃস্বর্গীয় সংকোশলে লুকানো আছে। বস্ত্তঃ অর্থোপার্জনের  
উদ্দেশ্যে নয়—উত্তেজনাময় জীবনের মাধ্যমে অতীতকে ভুলে থাকা এবং জীকে  
ভুলিয়ে রাখার জগুই বাসু-সাহেব এই নূতন জীবন শুরু করেছেন। স্বকোশলীর  
'সু' এবং 'কৌ' ঐ বাড়িরই দ্বিতলে থাকে—রীতিমত ভাড়া দিয়ে। কিন্তু  
দুটি পরিবারের হাঁড়ি-হেঁসেল এক। মিসেস বানী বাসুর একমাত্র সন্তানটির  
মৃত্যু হবার পর এ বাড়িটা খাঁ-খাঁ করত। এই কায়দায় বাসু-সাহেব বাড়িটাকে  
কলমুখর করে তুলতে চেয়েছেন।

অল্প পরে আগন্তুকস্বয় প্রবেশ করল বাসু-সাহেবের চেম্বারে। বাসু পাইপটা  
দিয়ে ওদের সামনের চেয়ার দুটিকে নীরবে দেখিয়ে দিলেন। নমস্কার করে  
ওরা পাশাপাশি বসল। মেয়েটির বয়স ত্রিশের কোঠায়—স্ফাংলা বড়, গড়নটি  
চমৎকার। চোখ দুটি বড় বড়—বেশ-বাস ছিমছাম। ছেলেটি ছ' চার বছরের  
বড় হতে পারে। অত্যন্ত সুদর্শন এবং সুগঠিত শরীর। দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ এবং  
চোখ-মুখে বুদ্ধিদীপ্ত একটা সপ্রতিভ ভাব। দেখলে মনে হয় সে দু-খা দিতে  
পারে, দু-খা নিতেও পারে।

মেয়েটিই প্রথম কথা বলল, আমার নাম—

বাধা দিয়ে বাসু-সাহেব বললেন, দু-জনের নামই আমি জানি।  
প্রয়োজনটা বলুন।

প্রথম কথাতেই বাধা পেয়ে মেয়েটি যেন কিছু ক্ষুব্ধ হয়। তার মনোব

“তাকিয়ে বলে, তুমি বল।

হেলেটি নড়ে চড়ে বসে। বলে, নীলিমার দাঁড় মিস্টার জগদানন্দ সেন একজন ধনী ব্যবসায়ী। বয়স আশীর কাছাকাছি—এখনও বেশ শক্ত সমর্থ আছেন। নীলিমাই তাঁর একমাত্র—কী বলব, ওয়ারিশ। কিন্তু ইতিমধ্যে এমন কতকগুলি ব্যাপার ঘটেছে—মানে নীলিমা মনে করছে—তার দাঁড়,

বাধা দিয়ে বাস-সাহেব প্রাণ করেন, আপনি জগদানন্দবাবুর কে হন?

—আমি? না আমি কেউই হই না। আমি নীলিমার পাণিপ্রার্থী।

—আই সি। তার মানে সমস্তটা বর্তমানে একমাত্র নীলিমা দেবীরই? কেমন?

—আইনত তা বলতে পারেন আপনি।

—সেক্ষেত্রে—কিছু মনে করবেন না—সমস্তটা আমি শুধু ঠুর মুখ থেকেই শুনেতে চাই।

—আই ডোও মাইও! বল নীলিমা।

মেয়েটি নড়ে চড়ে বসে। সে কিছু বলবার আগেই বাস-সাহেব বলেন, আই রিপীট—কিছু মনে করবেন না, সমস্তটা আমি ঠুর মুখ থেকে জানা-স্তিকেই শুনেতে চাই।

হেলেটি অপ্রতিভ হল না একটুও। হেসে বললে, আই অলসো রিপীট—আই ডোন্ট মাইও। আমি বয়ং বাইরে গিয়ে বসি—

—না বাইরে নয়, ওখানে বন্ধুর। আপনি আমার ল-লাইব্রেরীতে গিয়ে বহন বহন। টেবিলে অনেক ম্যাগাজিন আছে—সময় কেটে যাবে।

বাস-সাহেব ইলেকট্রিক বেলটা টিপলেন টেবিলের তলায় হাত চালিয়ে। এসে হাঁড়াল বিস্কু—ঠুর ছোকরা চাকর। তাকে নির্দেশ দিলেন ঐ তদ্র-লোককে ল-লাইব্রেরীতে নিয়ে গিয়ে বসাতে এবং ফ্যানটা খুলে দিতে।

জয়দীপের প্রস্থানের পরে বাস-সাহেব মেয়েটার দিকে তাকালেন। তার মুখটা ধমধম করছে। বাস-সাহেব প্রশ্ন করলেন, তোমার বয়স কত?

চোখ তুলে মেয়েটি তাকায়। একটু রুঢ় স্বরে বললে, জয়দীপকে এভাবে শ্রীড়ানোর কোনও প্রয়োজন ছিল না। তার কাছে আমার গোপন করার কিছু থাকলে তাকে আমি এ-ভাবে সন্দেহ করে এখানে আনতাম না।

বাস-সাহেব পাইপটা ধরালেন। বিচিত্র হেসে বললেন, তাই বুঝি? আমি ভেবেছিলাম, আমার প্রথম প্রশ্নের জবাবটাই হয়তো তুমি ঠুর কাছ থেকে গোপন করতে চাও! আমার প্রশ্নটার জবাব তুমি এখনও দাও নি। তোমার বয়স কত?

—চৌত্রিশ।

—কিছু হাতে রেখে বলছ না তো ?

মেয়েটি উঠে দাঁড়ায়। বলে, আমি শুনেছিলাম আপনি রুগ্নভাবী ; কিন্তু কোর্টে সওয়াল করতে করতে যে ওটা আপনার এমনই বদ-অভ্যাস হয়ে গেছে তা আমি আশঙ্কা করি নি। আচ্ছা চলি, নমস্কার !

বাস্থ পাইপটা দিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন, বস ! অত রাগ করা ভাল নয়। তোমার মুখ চোখ বলে দিচ্ছে তুমি একটা বিপদের মধ্যে পড়েছ। বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। বস ! অল রাইট ! আই উইথডু। তোমার বয়স বত্রিশ। মেনে নিলাম। এবার বল।

মেয়েটি বসে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলে, না বত্রিশ নয়, চৌত্রিশ। ছ-বছর আপনাকেও হাতে রাখতে হবে না। আর আমার বয়সটা সঠিক কত তা জয়দীপ জানে !

—ভেরি গুড। এবার বল তোমার দায়ের কথা। তোমার সমস্তার কথা। বস। কি থাকে বল, চা না কফি ?

মেয়েটি বসে। বলে, ধন্যবাদ। আপ্যায়ন করতে হবে না। আমি আপনার কাছে সৌজন্য সাক্ষাতে আসিনি, এসেছি ক্লায়েন্ট হিসাবে। সেটুকু মর্যাদা পেলেই আমি খুশি।

—রাগ পড়ে নি তাহলে ? আচ্ছা না হয় আমি কুমাই চাইছি।

—কমা চাওয়ার কিছু নেই। ঠিক আছে শুধু—

নীলিমা সেন যা বলল তা সংক্ষেপে এই :

জগদানন্দ সেনের সমস্ত সম্পত্তি ষোপার্জিত। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। পরীক্ষায় ফেল করে বাড়ি ছেড়ে যখন পালিয়ে যান তখন তাঁর বয়স আঠারো উনিশ। সে বছর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধে। উনি পালিয়ে যান বর্মী মূলুকে। দীর্ঘ দশ বারো বছর ছিলেন প্রবাসে। ব্যবসায় বেশ কিছু জমিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন উনিশ শ' পঁচিশে। বর্মী থেকে সেগুন কাঠ আসত আর উনি কলকাতার বাজারে তা বেচতেন। রেক্সনে ছিল ঠুঁর ব্রাঞ্চ অফিস। সেটা দেখা শোনা করতেন একজন বিশ্বস্ত ম্যানেজার—তিনি বর্মী, সু সিয়ান্ড। তিনিই ওখান থেকে জাহাজে করে সেগুন কাঠ চেরাই করে পাঠাতেন। এভাবেই কেটে গেল আরও বছর পনের। তারপর জাপান বিশ্বযুদ্ধে নেমে পড়ার ঠিক আগে থেকে বর্মী-সেগুন আসা বন্ধ হল ; কিন্তু ধুরন্ধর ব্যবসায়ী জগদানন্দ সময়েই সতর্ক হয়েছিলেন। তিনি ঐ সময়ে কাঠের ব্যবসা ছেড়ে ধরলেন লোহার ব্যবসা—হার্ডওয়ার মার্চেন্ট। যুদ্ধের ক'বছর শুধু পেরেক আর



কীটাতার বেচে তিনি বেশ কয়েক লক্ষ টাকা কামিয়ে ফেলেন। বর্মার থাকতেই একজন স্বজাতির বাঙালী মেয়েকে জগদানন্দ বিবাহ করেছিল। একটি মাত্র সন্তান হয়েছিল—পুত্র সন্তান, নীলিমার বাবা। তার পরেই ঠুঁর জী মারা যান। জাপান বিশ্বযুদ্ধে নেমে পড়ার বছর খানেক আগে জগদানন্দ তাঁর একমাত্র পুত্রকে বর্মা মূলুকে পাঠিয়ে দেন। সেখানকার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বেচে দেবার জন্য পুত্র সদানন্দকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়ে দেন। সদানন্দ সমস্ত কিছু বিক্রয় করে ব্যাংক ড্রাক্ট নিয়ে ফিরে আসে ভারতবর্ষে। কিন্তু সে গিয়েছিল একা, ফিরল যুগলে। ইতিমধ্যে সে রেঙ্গুনে একটি বর্মী মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করেছে। জগদানন্দ পুত্রকে বাড়িতে ঢুকতে দেন নি। ত্যাক্যপুত্রই করতে চেয়েছিলেন একমাত্র সন্তানকে। বছর দুই সদানন্দ এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। তারপর মহেন্দ্রবাবুর প্রচেষ্টায় পিতাপুত্রে একটা মিলন হয়।

বাধা দিয়ে বাস্ত-সাহেব বলেন, মহেন্দ্রবাবুটা কে ?

—মহেন্দ্রনাথ বসু। দাদুর কলকাতা অফিসের ম্যানেজার। তিনি আমার বাবার বয়সী। তাঁকেও দাদু প্রায় ছেলের মতই মাযুষ করে ছিলেন। ঐ দু বছরের মধ্যে আমার জন্ম হয়েছে এবং আমার জন্মের সময়েই আমার মা মারা যান। বাবার আর্থিক অবস্থা তখন খুব খারাপ। মহেন্দ্রবাবুই একদিন আমাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন দাদুর কাছে। আমাকে দেখেই দাদুর বাগ জল হয়ে গেল।

—বুঝলাম। এখন তোমার সমস্যার কথাটা বল। এতক্ষণ তো পূর্বকথন শোনাচ্ছিলে।

—পূর্বকথন আরও কিছুটা শোনাতে হবে। না হলে বর্তমান সমস্যার পারস্পর্যটা আপনি ধরতে পারবেন না। শুধুন—

সদানন্দ মারা যান আরও বছর পাঁচেক পরে। নীলিমা তখন ক্লাস থ্রিতে পড়ে। বাবার মৃত্যুর কথা অল্প অল্প মনে আছে তার—কিন্তু তার পরের কথা আরও স্পষ্টভাবে মনে আছে। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন জগদানন্দ। ব্যবসা-পত্র নিজে কিছুই দেখতে পারেন না। নাতনিকে নিয়েই তাঁর দিন কাটে। এভাবেই কটল আরও দু-বছর। তারপর ক্রি-একটা কারণে জগদানন্দের সন্দেহ হল। একদিন তিনি খাতাপত্র দেখতে বসলেন। হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, ইতিমধ্যে মহেন্দ্র যেন বেশ কিছু টাকা হাতিয়ে ফেলেছে ব্যবসায় থেকে। হিসাব মেলাতে পারলেন না মহেন্দ্রবাবু। আইনতঃ কিছু করবার অধিকার ছিল না জগদানন্দের—কারণ পুত্রের মৃত্যুর

পর শোকাহত জগদানন্দ তাঁর ম্যানেজারকে জেনাবেল পাওয়ার অব্যর্থ আটর্নি দিয়ে রেখেছিলেন। মহেন্দ্র কৌশলী লোক—খাতাপত্রে সে লোকসানও দেখিয়ে গেছে আইন মোতাবেক, কিন্তু বেশ বোঝা যায় যে, সেটা ওই কার-সাজি। তহবিল তচকুপের মায়া আনলেন না জগদানন্দ। তৎক্ষণাৎ অপমান করে তাঁর বিশ্বস্ত ম্যানেজারকে বিদায় করে দিলেন। মহেন্দ্র প্রতিশোধ নেবে বলে শাসিয়ে চলে যায়, আর ফেরে নি। এর পর গত পঁচিশ বছর তার কোন খবর ছিল না। হঠাৎ গত সপ্তাহে তার নাটকীয় আবির্ভাব ঘটে। নীলিমা তাকে চিনতেই পারেনি—না চেনাই স্বাভাবিক। মহেন্দ্রবাবু এ পরিবার ছেড়ে যখন চলে যান তখন নীলিমার বয়স মাত্র আট নয় বছর। এমন কি জগদানন্দও এই ষাট বছরের বৃদ্ধের ভিতর তাঁর সেই যুবক ম্যানেজারকে খুঁজে পান নি। মহেন্দ্র তখন নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছিল, বুড়ো কর্তা, আপনি আমাকে চিনতেই পারলেন না? কিন্তু আমি ষাবার দিনে তো বলে গিয়েছিলাম আবার আমি কিরে আসব! আমি মহেন্দ্র!

এর পরের ইতিহাস নীলিমা বিস্তারিত জানে না। এটুকু দেখেছে মহেন্দ্র সেই যে এসে ঢুকেছেন, আর বাড়ির বার হন নি। আরও দেখেছে—ঐ ঘটনার পর থেকে দাছ যেন কী, একটা আতঙ্কে একেবারে কাঁটা হয়ে আছেন। ব্যাপারটা কী, তা সে জানে না—কিন্তু বুঝতে পারছে যে, বৃদ্ধ জগদানন্দ একটা প্রচণ্ড আতঙ্কের তাড়নায় একেবারে দিশেহারা হয়ে গেছেন। এইটাই নীলিমার সমস্তা।

—কী জাতীয় সাহায্য তুমি চাও আমার কাছে?

—দাছ হঠাৎ এমন বদলে গেছেন কেন সেই রহস্যটা উদ্ধার করতে চাই আপনার সাহায্যে।

বাহু বললেন, আমি গোয়েন্দা নই, আমি হচ্ছি ক্রিমিনাল উকিল। এক্ষেত্রে আমার সাহায্য তো তুমি আশা করতে পার না। তবে আন্দাজে বলতে পারি, ঐ মহেন্দ্র বোস তোমার দাছকে ব্র্যাকমেল করতে এসেছে। তোমার দাছর স্বতীত জীবনের কোনও ঘটনার কথা সে প্রকাশ করে দেবার ভয় দেখাচ্ছে।

—তাহলে গত পঁচিশ বছর সে সেটা দেখায় নি কেন?

—আমার ধারণা, সেই গোপন ঘটনার কথা যে মহেন্দ্র জানে এটা জানা ছিল তোমার দাছর—কিন্তু তাঁর বিশ্বাস ছিল মহেন্দ্র সেটা প্রমাণ করতে পারবে না। মহেন্দ্র নিশ্চয়ই অতি সম্ভ্রান্তি সেই গোপন ব্যাপারের কোন অকাটা প্রমাণ সংগ্রহ করেছে। সেই নথীপত্র নিয়ে এসে হাজির হয়েছে তোমার দাছর কাছে।

—আমারও তাই অজ্ঞান; কিন্তু ব্যাপারটা কী হতে পারে? পঁচিশ

বছর পরে সবকিছুই তো তামাদি হয়ে যায়।

—তা যায় না। ধর একটা মার্ভার কেস। পঁচিশ বছরে সে অপরাধ তামাদি হয়ে যায় না।

—আপনি কি বলতে চান আমার দাছ মাহু খুন করেছিলেন?

—ডিড আই সে জাট? তবে ঐ জাতীয় এমন কিছু তিনি করেছিলেন যে অপরাধ পঁচিশ বছরে তামাদি হয়ে যায় না। তোমাকে আগেই বলেছি, এক্ষেত্রে আমি তোমাকে খুব বেশি কিছু সাহায্য করতে পারব না—কিন্তু তোমার এক্ষেত্রে কী করণীয় তা মাজেস্ট্র করতে পারি। দাছকে ঐ আতঙ্কের হাত থেকে মুক্তি দিতে তোমার কোন প্রাইভেট ডিটেক্টিভের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। সে খুঁজে বার করবে গোপন রহস্যটা কী, কেমন করে মহেশ্বর সেটা সংগ্রহ করেছে—এবং হয়তো সে তোমাকে পরামর্শও দিতে পারবে কেমন করে এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।

—কলকাতায় এমন প্রাইভেট গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান আছে নাকি? আপনি সন্ধান দিতে পারেন?

—পারি। এই বাড়িরই অপর উইং-এ আছে ‘স্ক্রুশলী’র অফিস। সেখানে কৌশিক মিত্র এবং সূজাতা মিত্র পাটনারশিপ বিজনেসে এ জাতীয় কাজ করে। ওরা আমারই লোক। তুমি যদি চাও, তাহলে আমি যোগাযোগ করে দিতে পারি।

—প্রীজ স্মার—

বাহু-সাহেব ইন্টারকমের মাধ্যমে কৌশিককে সংবাদটা জানিয়ে দিলেন। মেয়েটি নমস্কার করে উঠে দাঁড়াতেই বললেন, আর একটা কথা আছে। আমাকে বেশব কথা বললে তা ঐ জয়দীপ ছেলেটি জানে?

—জানে।

—তোমার দাছ জানেন তোমাদের দু-জনের সম্পর্ক?

—জানেন—তিনি রাজী হচ্ছেন না বলেই ব্যাপারটা পিছিয়ে যাচ্ছে।

—রাজী হচ্ছেন না? কেন?

বিচিত্র হাসল মেয়েটি। তারপর বললে, যে কারণে কানা খোঁড়া না হওয়া সত্ত্বেও এই চৌত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি খুবড়ি হয়ে আছি।

—বুঝলাম না।

—যার সঙ্গেই আমার বিয়ের কথা হয়, দাছ ভেবে বদেন যে, সে আমাকে শুধু টাকার জন্ত বিয়ে করতে চাইছে। আমার মনে হয়, দাছর জীবদ্দশায় আমাদের বিয়েটা আদৌ হবে না। এটা ঠুর একটা, কী বলব? ম্যানিয়া!

—অর্থাৎ তোমার দাঁতুর বিশ্বাস যে, জয়দীপও শুধুমাত্র টাকা লোভে তোমাকে বিবাহ করতে চাইছে ?

—হ্যাঁ তাই।

—ও কী করে ? কে আছে ওর পরিবারে ?

—ও মোটামুটি একাই। বাবা-মা নেই। এক দাদা আছেন, এক বোনও আছে। দাদা পৃথক সংসার করেন, বোনও বিবাহিত। ও বিজনেস করে। মোটামুটি সচ্ছল। তবে আদর্শের বাতিক আছে। ঘুস-ঘাসের মধ্যে যেতে চায় না। তাই ব্যবসায় উন্নতি করতে পারছে না।

—তোমার সঙ্গে কতদিনের আলাপ ?

—তা বছর তিনেকের হবে।

—একটা কথা। জয়দীপ কী ঘরজামাই হয়ে তোমাদের বাড়িতে থাকতে রাজী হতে পারে ?

নীলিমা আবার বসে পড়ে। বলে, হঠাৎ এ কথা কেন ?

—আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে তোমার দাঁতু তোমার বিয়ে দিতে রাজী হচ্ছেন না—তোমাকে হারাবার ভয়ে। তাহলে এই বৃদ্ধ বয়সে বাড়িতে তিনি একেবারে একা হয়ে পড়বেন।

নীলিমা মাথা নাড়ল। বললে, না। তা নয়। ঐ ম্যানিয়ার অগ্নিই। তাছাড়া আমাদের বাড়ি ফাঁকা নয়। আমার এক সম্পর্কে কাকা আছেন। তাঁর এক শালিকা-পুত্রও ঐ বাড়িতে থাকে। বাড়ি আমাদের ফাঁকা নয়।

—আই সী !

ইতিমধ্যে ছোকরা চাকরটা জয়দীপকে লাইব্রেরী থেকে ডেকে নিয়ে এসেছে। বাহু-সাহেব বললেন, আপনাকে একা বসিয়ে রেখেছি বলে দুঃখিত। এটা আমার প্রফেশনাল এখিঞ্জ।

জয়দীপ নমস্কার করে বললে, আমার কোনই অসুবিধা হয় নি। লাইফ ম্যাগাজিনে একটা ভাল প্রবন্ধ পড়া গেল।

তুই

দিন তিনেক পরে কৌশিক এসে বাহু-সাহেবকে বলল, বরাতে নেই কো ঘি, ঠক্কাল হবে কী ? আপনি এমন একটি শাঁসালো মক্কেল পাঠালেন আমার কাছে, অথচ সেটা বুমেয়্যাডের মত আবার আপনার হাতেই ফিরে এল।

—কী হল আবার ? কোন্ কেসটা ?

—ঐ যে লোহার দালাল অগদানন্দ্রের ব্ল্যাকমেলেস কেসটা। নীলিমা

কোনো দিন তিনেক আগে আমাকে এনগেজ করলেন। তবে জাঁকিয়ে তবুও  
তরু করেছি, আজ এসে বলছেন ওটা স্থগিত রাখতে।

—কেন ? সমস্তার সমাধান হয়ে গেছে ?

—তাই অস্বীকার করা যাচ্ছে। এবার ওরা এসেছেন আপনার সঙ্গে একটা  
অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে। জগদানন্দ একটি দলিল তৈরী করতে চান আপনার  
পরামর্শ মত। আন্দাজ করছি—ব্ল্যাকমেলারের সঙ্গে টাকায় খেসারত দিয়ে  
ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে চান।

—এবারও কী ওরা যুগলে এসেছে ? কোথায় ?

—আমার অফিসে বসিয়ে রেখে এসেছি, দু'জনকেই।

—টিক আছে, পাঠিয়ে দাও—না, সঙ্গে করে নিয়ে এস।

একটু পরে কৌশিক ওদের দু'জনকে নিয়ে ঢুকল। জয়দীপ নমস্কার করে  
বলল, আপনার লাইব্রেরী ঘরটা খোলা আছে নিশ্চয় ?

বাসু-সাহেব বললেন, এবার আর তার দরকার হবে না। সেবার কেসটা  
জানতাম না। তাই আমার ক্লায়েন্টের স্বার্থে আপনাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম;  
কিন্তু আমার ক্লায়েন্ট তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে জানিয়েছেন যে, আপনি তাঁর কাছে  
যাচাই করুন।

নীলিমা চেয়ারে গুছিয়ে নিয়ে বসে। বলে, আজ কিন্তু আমি আপনার  
ক্লায়েন্ট নই। আমি ক্লায়েন্টের তরফে কথা বলতে এসেছি। আমি দূতমাত্র।  
কলে আজ নিশ্চয়ই আপনার বাক্যবাণে বিদ্ধ হব না। দূত মাত্রেরই অবস্থা !

বাসু হেসে বলেন, ইয়া, দূত মাত্রেরই অবস্থা ! সেদিন অত করে অহরোধ  
করলাম, তবু আজও রাগ পুষে বসে আছি। বাই হোক বল, কী খবর ?

—আপনার নিমন্ত্রণ ! আজ সন্ধ্যা সাতটা পাঁচের পর থেকে সাতটা  
পর্যন্ত, কিংবা আগামীকাল বেলা এগারোটা সতের গতে—

—এ হুস্তার এ-ছুটিই বিবাহের লগ্ন আছে বুঝি ?

—বিবাহ ! কার ?

—তবে এগারোটা সতের গতে কিসের নিমন্ত্রণ ?

বুঝিয়ে বলে নীলিমা। জগদানন্দ পঞ্জিকা মেনে চলেন। ঐ দুটি সময়  
হচ্ছে তাঁর ঠিকুজি-কুজি অফিসের শুভ লগ্ন। ঐ সময়েই তিনি একটি জরুরী  
দলিলে সই দিতে চান। তাঁর পূর্বে পি. কে. বাসু বার. অ্যাট. ল. যদি অফিসে  
করে দলিলটা দেখে দেন, তবে জগদানন্দ কৃতকৃতার্থ থাকবেন। শুধু দলিলের  
স্বার্থার্থ নয়, উকিল হিসাবে সাক্ষ্য দেওয়ার জঙ্কই নয়—ঐ সঙ্গে তিনি কিছু  
আইন-ঘটিত পরামর্শও নিতে চান। জগদানন্দ উন-আঁদী বছরের বৃদ্ধ হলেনও

এখনও কিছু চলচ্ছক্তিহীন নন—তিনি নিজে আসতে পারেন। তবে বাস-সাহেব তাঁর বাড়িতে গেলেই উনি খুশি হবেন।

সব শুনে বাস-সাহেব বলেন, দলিলটা কিসের তা আন্দাজ করতে পারছ ?

—না। তবে বাড়িতে আরও একজন অতিথি বেড়েছেন। উকিল বিশ্বম্ভর রায়। তিনি মহেন্দ্রবাবুরই অতিথি। ফলে আমাদেরও।

—এত উকিল থাকতে হঠাৎ আমাকে কেন ? তোমরা ‘সাসেস্ট’ করেছিলে ?

—না। দাহুর সলিসিটর ছিলেন ব্যারিস্টার এ. কে. বের এ্যাটর্নি-কার্ম। বের-সাহেব অবসর নিয়েছেন। উনিই নাকি আপনার নাম দাহুকে বলেছেন।

—ঠিক আছে। আমি আজই সন্ধ্যার পর যাব। কৌশিকও থাকবে আমার সঙ্গে। তোমাদের ঠিকানা এবং টেলিফোন নম্বরটা দিয়ে যাও।

—তা দিচ্ছি। আপনারা কিন্তু সূচনাক্ষেপেও তাঁকে জানাবেন না যে, আমরা ইতিপূর্বে আপনাদের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। আজই আপনাদের সঙ্গে আমাদের দু-জনের পরিচয়। পূর্বকথা আপনি কিছুই জানেন না।

—বুঝলাম। আচ্ছা তোমার দাহু বোধহয় ইন্টি-টিকটিকি পাজিপুথি মনে চলেন ?

—তা চলেন। এজ্ঞা মাহিনা-করা একজন গ্রাহচার্জও আছেন তাঁর। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ আমাদের জ্ঞপত্রিকায় বাধা।

সন্ধ্যার পর বাস-সাহেব নিজেই ড্রাইভ করে কৌশিককে নিয়ে এলেন। গলিগঞ্জ সাকুলার রোডে প্রকাণ্ড হাতাওয়াল দ্বিতল বাড়ি। সাবেক ডিক্রাইন। দু-খানি ঘর বর্তমানে দখল করেছেন মহেন্দ্র-কাম-বিশ্বম্ভর পার্টি। দ্বিতলে দক্ষিণের বড় ঘরখানা কর্মমশায়ের। ঠিক তার বিপরীতে নীলিমার ঘর।

গাড়িটা পোর্টে এসে দাঁড়াতেই নেমে এল নীলিমা। বললে, আসুন। দাহু আপনাদের জ্ঞ অবেক্ষা করছেন। গাড়ি থেকে নামতেই কৌশিকের নজর হল দ্বিতলের একটি ঘরের বন্ধ-জানালার খড়খড়ি হঠাৎ উঠে উঠল। না দেখলেও তার ওপাশে দু-ছোড়া কৌতূহলী চোখ যে তাঁর আগ্রহ নিয়ে ওদের লক্ষ্য করছে সেটা বুঝতে অস্বীকার্য হল না কৌশিকের। মার্বেল পাথরে বাঁধানো চওড়া করিডর, প্রশস্ত সিঁড়ি। জানালা-দরজা, সিঁড়ির হাতল সবই পালিশ করা বর্ণা সেগুনের। ভা ভ হবেই। বাড়িটি যে-আমলের তখন

বুড়ো কর্তা ছিলেন বর্মা-টাকের রাজা।

জগদানন্দের দ্বিতলের ঘরটি প্রকাণ্ড। ইটালিয়ান-মার্বেলের সাদা-কালো চৌখুপিকাটা মেজে। ঘরের আসবাবপত্র মধ্য ভিক্টোরিয়ান যুগের। সবই পালিশ-করা বর্মা সেগুন। ঘরের একদিকে ডবল বেড খাট। এ পাশে খেতপাথরের নিচু টেবিল ঘিরে সোফা-সেটি। ও পাশে আয়না-বসানো কাঠের আলমারি, বইয়ের ব্যাক। এত আসবাবেও ঘরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে—মাপে সেটা এতই বড়।

পর্দা সরিয়ে ওঁরা প্রবেশ করতেই যুক্তকরে ওঁদের অভ্যর্থনা করলেন গৃহস্থামী। দেখলে মনে হয় না তাঁর বয়স উন-আশি। বরং ষাটের ঘরে বলে মনে হয়। মাথার চুল ধপধপে সাদা, গালে খাঁজও পড়েছে—কিন্তু একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন। ঘরের ভিতর চলাফেরা করছেন দিনা লাঠিতে। উদ্ভাসে একটি সামারকুল গেঞ্জি, পরনে কৌচানো ধুতি। বাঁ হাতে একাধিক কণ্ঠ ও মাহুনি। ডান হাতে সর্বসমেত গোটা-পাঁচেক আংটি প্রবাল, পোকরাজ, নীলা—একটা বোরহয় হীরাও। অলঙ্কারের গুঁট উদ্দেশ্য অবশ্য গ্রহণাস্তির প্রয়োজনে।

আপ্যায়ন করে গৃহস্থামী ওঁদের বসালেন। তাঁর নির্দেশে নীলিমা একটি সৌখিন কাজ-ফরা কাঠের বাস্ক এনে রাখল খেত পাথরের টেবিলে। ডালাটা খুলে দেওয়ায় দেখা গেল তাঁর ভিতর আছে চুফট, সিগারেট, দেশলাই এবং ভাজা-মশলা—বিভিন্ন খোপে।

বাহু-সাহেব বললেন, ধন্যবাদ। আমি পাইপ খাই।

গৃহস্থামী বললেন, আপনার নাম আমার জানা ছিল। কাগজে কয়েকটি বিচিত্র ফৌজদারী মামলায় আপনার নাম দেখেছি! পরিচয় ছিল না। আমার আইনঘটিত পরামর্শ এককালে দিতেন ব্যারিস্টার এ. কে. রে। গত বিশ বছরের ভিতর আর আইন-ঘটিত কোন পরামর্শ নেবার প্রয়োজনই হয় নি। রে-সাহেব আমার চেয়ে বছর দুয়েকের বড়ই হবেন। কিন্তু বুড়িয়েছেন আমার চেয়ে অনেক বেশী। তিনিই আপনার নাম করলেন, কিন্তু এঁকে তো—

—ও আমার সহকারী। নাম কৌশিক মিত্র। আমার কনফিডেন্সিয়াল কাজকর্ম ওই দেখা শোনা করে। আমার সামনে যা বলতে পারেন, তা ওর সামনেও বলতে পারবেন।

—না না, গোপন ব্যাপার তেমন কিছু নয়। একটা সাদা-মাটা দলিল আছে নৌলুদিদি—তুমি একটু জলখাবারের আয়োজন কর—আমি ততক্ষণ এঁকে বৈষয়িক ব্যাপারটা বোঝাই।

বাসু-সাহেব আপত্তি জানান, না না, জলখাবারের প্রয়োজন নেই—

গৃহস্বামী যুক্তকরে বলেন, প্রয়োজনটা আপনার নয়, আমার।  
তিথি যদি মুখে কুটোটি না কাটেন গ্রহ কুপিত হন। গৃহস্থের  
কল্যাণ হয় !

বাসু-সাহেব শ্রীংগ করলেন। নীলিমা চলে গেল।

জগদানন্দ একটি চেয়ারে ধনিয়ে এসে বসলেন। বললেন, ব্যাপারটা  
গামাছ। অনেক অনেকদিন আগে আমি আমার একজন ম্যানেজারকে কর্ম-  
মুক্ত করেছিলাম। তা ধরুন পঁচিশ বছর আগে। চাকরি থেকে বরখাস্ত  
হবার কারণটা হচ্ছে এই যে, আমি মনে করেছিলাম তিনি তহবিল তছরূপ  
করেছেন। তাঁকে আমার ছেনারেল পাওয়ার অফ অ্যাটার্নি দেওয়া ছিল।  
আমার অজ্ঞাতে তিনি কিছু সম্পত্তি বেচে দেন এবং টাকাটা আমার অ্যাকাউন্টে  
ঠিক মত জমা দেন না। সেটা যখন আমি টের পেলাম তখন তাঁকে ডেকে  
টার কৈফিয়ৎ তলব করলাম। উনি সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ পেশ করতে  
পারেন নি। ফলে তাঁকে বরখাস্ত করি। আজ পঁচিশ বছর পরে তিনি ফিরে  
এসে প্রমাণ দাখিল করেছেন যে, তিনি আদৌ কোনও তহবিল তছরূপ করেন  
নি। তাঁর কৈফিয়ৎ এখন আমি মিলিয়ে দেখেছি—বুঝেছি আমারই অন্তায়  
য়েছিল। এজ্ঞা ক্ষতিপূরণ হিসাবে তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা দাবী  
করেছেন। আমি সেটা তাঁকে দিতে রাজী হয়েছি। এই ক্ষতিপূরণটা একটা  
লখাপড়ার মাধ্যমে আমি করতে চাই—যাতে ঐ দাবী নিয়ে ম্যানেজার  
দুর্দলোক আগার না পরে একদিন এসে হাজির হন। আপনাকে তার একটা  
দ্রাক্ষট করে দিতে হবে। নিজে উপস্থিত থেকে এবং মধ্যস্থ হয়ে এই ব্যাপারটা  
সুকিয়ে দিতে হবে।

—বুঝলাম। এবার একটু বিস্তারিত করে বলুন।

জগদানন্দ যেটুকু বিস্তার করলেন তাতে প্রকাশ পেল—দাবীদারের নাম,  
বোঝা গেল তিনি এ বাড়িতেই বর্তমানে আছেন। একা নন, স-উকিল।  
এর বেশি কিছু ভাঙলেন না তিনি।

বাসু বলেন, পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে না ?

—না, যাচ্ছে না। উনি যখন বরখাস্ত হন তখন ঐর মাসিক বেতন ছিল  
চারশ' টাকা। বয়স ছিল চৌত্রিশ। উনি যদি ঐ বেতনেই পঞ্চাশ বছর  
বয়স পর্যন্ত আমার কাছে চাকরি করতেন তবে তাঁর নেট পাওনা হত পৌনে  
একলাখ টাকা। অ্যাড্‌ভাইটিং হিসাব করলে আজ পঁচিশ বছরে তাঁর লোকসানটা  
মতো লাখ দুই টাকা দাঁড়াবে।



বাহু বলেন, তা হতে পারে। কিন্তু তিনি তো কাজ করেন নি আপনার ম্যানেজার হিসাবে। আপনার ঐ ফর্মুলা অনুসারে হিসাব করলে দেখতে হবে চারশ' টাকার মাইনের চাকরি হারিয়ে বাস্তবে উনি কত বোজগার করেছিলেন। ধরুন যদি তিনি তখনই একটা তিনশ' টাকা মাইনের চাকরি করেন, তাহলে তাঁর মাসিক লোকসান হয়েছে একশ'। আপনার হিসাবমত তাঁর ক্ষতির নেট পরিমাণ প্রায় বিশ হাজার টাকায় নেমে আসে।

জগদানন্দ একটি চুরুট ধরিয়ে বললেন, টাকাটা যখন আমি দিতে রাজী তখন আর আপনার আপত্তি কিসের ?

—আপত্তি এইজন্য যে, আমার মনে হচ্ছে আপনি সব কথা বলছেন না—বেশ কিছু গোপন করছেন।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে জগদানন্দ বলেন, ধরা থাক, আপনার কথাই সত্য। তাতেই বা আপনার আপত্তি কি ? আপনি তো ক্ষতিপূরণের একটা দলিলের মুশাবিদা করে দেবেন শুধু।

বাহু-সাহেব বললেন, সে-ক্ষেত্রে আপনি রাম-শ্রাম-যদুকেই বা ডেকে পাঠালেন না কেন ? এমন মামুলি দলিল তো যে-কোন উকিল তৈরী করে দিতে পারে আপনাকে। তার জন্য ব্যারিস্টার এ. কে. রে-র সাগরেদকে এগিয়ে আসতে হবে কেন ?

জগদানন্দ চোখ বুজে মিনিট খানেক কি-যেন ভেবে নেন। তারপর বলেন, ডাক্তারের কাছে রোগ আর সলিসিটরের কাছে আইনের ফাঁক গোপন করতে নেই। কিন্তু ব্যতিক্রম আছে বলেই না নিয়মটাকে নিয়ম বলে মানি ? এখানে আমাকে কিছু গোপন করে যেতে হচ্ছে—আমি স্বীকার করছি—কিন্তু কী গোপন করছি তা আমি স্বীকার করতে পারি না। না, আপনার কাছেও নয়।

বাহু পাইপটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলেন, অর্থাৎ প্রকারান্তরে আপনি স্বীকার করলেন ঐ মহেন্দ্র এসেছে আপনাকে ব্ল্যাকমেল করতে—এবং আপনি তার হাত থেকে রেহাই পেতে চান ?

—ধরুন তাই।

—এ-ক্ষেত্রে আপনি স্বতঃই চাইবেন, ক্ষতিপূরণের দলিলটা এমনভাবে প্রস্তুত হ'ক যাতে ঐ লোকটা টাকা পাওয়ার পরেও যেন আপনাকে এ-শোষণ করতে না পারে। কেমন তো ?

—স্বাভাবিক অহুসিদ্ধান্ত।

—সে-ক্ষেত্রে আপনার গোপন তথ্যটা কী, তা না জানলে আমি কেমন

করে আপনাকে রক্ষা করব ?

—মাপ করবেন—সেটা আমি বলব না, বলতে পারি না।

—থকুন আপনি যৌবনে একটা খুন করেছিলেন—আজ পঁচিশ বছর পরে মহেন্দ্র এসেছে সেই খুনের একটা অকাটা প্রমাণ নিয়ে। আপনি ক্ষতিপূরণ দিয়ে তো মার্ভার-চার্জ থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন না।

জগদানন্দ হেসে বলেন, আপনার উদাহরণটা ভুল। যৌবনে আমি কোন খুন করি নি—তার অকাটা প্রমাণ নিয়েও আসে নি মহেন্দ্র : কিন্তু এটা তো নিশ্চিত—ক্ষতিপূরণটা দেবার সময় আমি ঐ অকাটা প্রমাণটাও নিয়ে নেব—জানে যদি আপনার উদাহরণটাই সত্য হয়।

—কায়েষ্ট ! কিন্তু তার একটা ফটোগ্রাফ কপি ওর কাছে থেকে পেতে পারে !

ভ্রুকুঞ্চিত হয় জগদানন্দের। অনেকক্ষণ নীরবে ধূমপান করেন তিনি। তারপর মনস্থির করে বলেন, না। সে রিস্ক আমিই নেব : আপনাকে লা যাবে না।

—এক্ষেত্রে আমি আপনার কেসটা নিতে পারি না।

জগদানন্দ বিচিত্র হেসে বললেন, তাহলে এ আলোচনার এখানেই শেষ। আমি অন্য কোন উকিলের সন্ধানই করব। আপনার ভিজিটটা এনে দিই। আর আমার যুক্তকর নিবেদন—জলখাবারটা আপনাদের খেয়ে যেতে হবে।

জগদানন্দ উঠে গেলেন। আলমারি খুলে একটি চেকবই বার করে বসলেন। বাস্ব বলেন, দাঁড়ান। আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করি আগে। জগদানন্দ দিতে চান দেবেন না, কিন্তু জবাবে যেটুকু বলবেন তা সত্য করেই বলবেন।

কৌতুক উপচে পড়ল জগদানন্দের হু-চোখে। বলল, সওয়াল-জবাবের খামে রহস্ত উদ্ঘাটন ! বেশ ! করে দেখুন ; কিন্তু সেটা পণ্ডিত্য হবে স্টোর বাস্ব ! আমি খাণ্ডু ব্যবসায়ী। এই করে চুল পাকিয়েছি। ও-ভাবে আমার পেটের কথা আপনি বার করতে পারবেন না।

বাস্ব-সাহেব সে কথায় কর্ণপাত না করে বললেন, আপনি বর্মা থেকে শেষ বে ফিরে এসেছিলেন ?

—ওরে বাবা ! সে তো বছ-বছরদিন আগে। উনিশ শ' পঁচিশে। হু—জানে নীলুর বাবা তখন হু-বছরের। তারপর আমি আর বর্মায় যাই নি।

—সদানন্দবাবুই বড় হয়ে বর্মার কাজ দেখাশোনা করতে যেতেন ?

—না। বর্মার কাজ দেখাশোনা করতেন আমার সেখানকার ম্যানেজার

যুঁ শিয়াও। সদানন্দ একবারই মাত্র বর্মায় যায়, মানে তার সেই ছেলেবেলায় কথা বাদ দিলে। ওর জন্ম ওখানেই।

—একবারই যান, মানে ঐ বিজনেস গুটিয়ে নিতে—সবকিছু বেচে দিয়ে আসতে ?

—হ্যাঁ। জাপান বিশ্বযুদ্ধে নেমে পড়ার আগেই আমার আশঙ্কা হয় এমন একটা কিছু ঘটতে পারে। ঐ সময়ে লোহার ব্যবসায় আমার টাকারও প্রয়োজন ছিল প্রচুর। তাই সত্বে স্পেশাল পাওয়ার-অফ্ অ্যাটর্নি দিয়ে বর্মায় পাঠিয়ে দিই, মাসখানেক সে ওখানে ছিল। সবকিছু বিক্রি করে ব্যাঙ্ক ড্রাফট নিয়ে সে ফিরে আসে।

—কত টাকায় বর্মার সম্পত্তি বিক্রি হয় ?

—বর-বাড়ি, স্টক এবং গুড-উইল সমেত প্রায় সত্তর হাজার টাকায়।

—ব্যাঙ্ক-ড্রাফটের নম্বরটা আমায় দিতে পারেন ?

—কি হবে সে নথর দিয়ে ?

বাস্তব মাথা ঝাঁকিয়ে বলেন, এমন সত্ব তো ছিল না সেন-মশাই। আপনার কোন প্রতিশ্রুতি করার অধিকার নেই। হয় সত্যি জবাব দেবেন, অথবা জবাব দিতে অস্বীকার করবেন।

জগদানন্দ হাসলেন। বললেন, ঠিক কথা। ব্যাঙ্ক ড্রাফট-এর নম্বরটা আপনাকে দিতে পারি। এখনই চান ?

—ইয়েস।

জগদানন্দ তাঁর কাঠের আলমারিটা খুললেন। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই পুরাতন ইনকাম-ট্যাক্স ফাইল হাতড়ে নম্বরটা দাখিল করলেন। ব্যাঙ্ক অফ বার্মা ড্রাফট দিচ্ছেন কলকাতার লয়েডস্-ব্যাঙ্কের উপর। টাকার অংক একাত্তর হাজার পাঁচশ বত্রিশ টাকা তিন আনা। তারিখ আঠারই মে, 1940। বাস্তব সাহেব নোটবুকে টুকে নিলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে। আমি আপনার কাজটা করবার দায়িত্ব নিচ্ছি। ড্রাফট আমি করে দেব। এবার বরং মহেন্দ্রবাবু এবং বিশ্বম্ভরবাবুকে ডেকে পাঠান।

জগদানন্দ বললেন, গোপন তথ্যটা না জেনেই রাজী হলেন ?

—ওটা তো কালকেই জানতে পারব। ব্যাঙ্ক খুললেই।

হো হো করে হেসে উঠলেন জগদানন্দ। বললেন, আপনার আশা যে মহেন্দ্র আমাকে কী স্তরে ব্ল্যাকমেল করছে তা আপনাকে জানিয়ে দেবে লয়েডস ব্যাঙ্ক ?

বাস্তব কঠিন স্বরে বললেন, আগামী কাল এই সময় এসে সেটা স্পষ্টতঃ আমি

আপনাকে জানিয়ে যাব । এবার ডাকুন ঠুকের ।

জগদানন্দ স্থির হয়ে কয়েক মুহূর্ত এক দৃষ্টে দেখতে থাকেন বাসু-সাহেবকে । তারপর মাথা নেড়ে বললেন, অসম্ভব বাসু-সাহেব ! আই গ্র্যাকসেন্ট য়োর চ্যালেঞ্জ ! পঁচিশ বছর সময় লেগেছে মহেন্দ্র—তাও সে আমার নাড়ি-নক্ষত্র জানত । আপনার পক্ষে এটা অসম্ভব !

বাসু-সাহেব ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার দেবী হয়ে যাচ্ছে ।

অল্প পরেই এলেন মহেন্দ্র আর বিশ্বস্তরবাবু ।

মহেন্দ্রবাবুর বয়স ষাটের কাছাকাছি । এক মাথা কাঁচা-পাকা কদম-ছাঁট চুল । ঝোলা গৌফ, আর ঘন জ্র । চোখে নক্ষত্রী দৃষ্টি । দেখলেই বোঝা যায় লোকটা ধূর্ত এবং সাবধানী । অপর পক্ষে বিশ্বস্তরের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি । রীতিমত হুঁপুট--মোটাই বলা চলে । চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা । কাপড়-জামায় দেহের যেটুকু ঢাকা পড়ে নি সেখানে মেদের বাহ্যিক নক্ষত্রে পড়ে । জগদানন্দ ঠুকের পরিচয় করিয়ে দিলেন । মহেন্দ্র হাত তুলে নমস্কার করল । বিশ্বস্তর একটা কাগজে নিবন্ধ দৃষ্টি থাকার অজুহাতে নমস্কার করার হাত এড়ালো । অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠুকা আলোচনায় ডুবে গেলেন ।

কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হওয়া গেল না । মঃঐবধ দেখা দিল । বিশ্বস্তর একটা ড্রাক্ট করে এনেছিলেন—মোটাই হল আলোচনার মূল সূত্র । বাসু-সাহেব বললেন, না, ঐ সঙ্গে মহেন্দ্রবাবুকে বলতে হবে তিনি জগদানন্দের ওয়া-রিশদেরও ভবিষ্যতে ঐ দাবী নিয়ে বিব্রত করতে পারবেন না ।

বিশ্বস্তর বললেন, মামলা হচ্ছে এমপ্লয়ার আর এমপ্লয়ীর মধ্যে—এর ভিতর ওয়ারিশদের প্রসঙ্গ আসবে কী করে ?

—মোটো আমাদের বিবেচ্য । ঠুকে দ্বিতীয়তঃ লিখে দিতে হবে—কোন অজুহাতেই তিনি জগদানন্দ অথবা তাঁর ওয়ারিশদের কাছে কোন দাবী নিয়ে কোনদিন উপস্থিত হবেন না ।

বিশ্বস্তর চটে উঠে বললেন, এ যে অত্যাচার দাবী করছেন মশাই ! অতীতে আমার মক্কেলের প্রতি যে অত্যাচার করা হয়েছে এখন তারই ফয়সালা করছি আমরা ! ভবিষ্যতে জগদানন্দবাবু যদি আমার মক্কেলের প্রতি নতুন কোন অত্যাচার করেন, তবে তাঁকে মুখ বুজে নিয়ে যেতে হবে ?

বাসু-সাহেব বললেন, তৃতীয়তঃ ঠুকে আরও স্বীকার করতে হবে যে, ভবিষ্যৎ অতুসন্ধানে যদি পুনরায় প্রমাণিত হয় যে, আমার মক্কেল জগদানন্দ বুঝতে পারেন আপনার মক্কেল মহেন্দ্রবাবু সত্যিই তহবিল তছরূপ করেছিলেন তাহলে তদানীন্তন ব্যাল্ক-রেট সূদ সমেত ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকা মহেন্দ্রবাবু প্রত্যর্পণের

অন্ত বাধ্য থাকবেন !

বিশ্বস্তর উঠে দাঁড়ান চেয়ার ছেড়ে । বাহু-সাহেবকে ডিঙিয়ে জগদানন্দকে বলেন, আপনি যদি ফয়শালা করতে না চান সেটা সম্পূর্ণ পৃথক কথা । আমরা অন্য পন্থার আশ্রয় নিতে বাধ্য হব । ইনি বা দাবী করছেন তা অযৌক্তিক । অন্ততঃ গতকাল এসব ফ্যাকড়া আপনি তোলেন নি ।

জগদানন্দ বলেন, আচ্ছা আপনারা একটু অপেক্ষা করুন । আমি ওঁকে বুঝিয়ে বলছি ।

বাহু-সাহেবকে নিয়ে জগদানন্দ চলে গেলেন পাশের ঘরে । বললেন, এসব ফ্যাকড়া তুলছেন কেন ?

—স্বাভাবিক কারণে । ধরুন যদি খেসারতের টীকাটি নিয়ে ও আবার আসে । আপনার যে গোপন ব্যাপারটা আছে সেটা প্রকাশ করে দেয়—প্রমাণ নাট করতে পারুক, স্ক্যাণ্ডেল ছড়াবার চেষ্টা করে তখন একটা ‘শো-ডাউন’ অনিবার্য হয়ে পড়বে । তখন মামলা করে ওর কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনি দাবী করতে পারবেন । সে-টাকা আদায় হবে না, কিন্তু সেই ভয়ে স্ক্যাণ্ডলটাও ছড়াতে সাহস পাবে না ।

জগদানন্দ ব্যাপারটা ভেবে দেখেন । একটু পরে বলেন, আপনার যুক্তি ঠিক ; কিন্তু এসব সৰ্ত্ত তো আমি আগে আরোপ করি নি, এখন ওরা শুনতে চাইবে কেন ?

—এক কাজ করুন । ওদের কাছে একদিন সময় চেয়ে নিন । কাল এসে এটার ফয়শালা করা যাবে । কাল সন্ধ্যায়, এই একই সময়ে ।

জগদানন্দ বিচিত্র হেসে বললেন, কেন বলুন তো ? আপনি কি সত্যিই আশা রাখেন যে, কাল সন্ধ্যার মধ্যেই লয়েডস্ ব্যাঙ্ক থেকে ছেনে আসবেন রহস্তের সন্ধান ?

—তাই আশা করছি । মোট কথা একদিন সময় আপনি চেয়ে নিন শুধু ।

তাই নেওয়া হল । বিশ্বস্তর গজ গজ করতে করতে উঠে গেল ।

মহেন্দ্র কিন্তু যাবার সময় সবিনয় নমস্কার করে গেল তার প্রাক্তন মনিবকে এবং তাঁর সলিসিটরকে ।

জলখাবার খেতে বসে শুরু হল খোশ গল্প । বাহু-সাহেব বলেন, সেন-মশাই, আপনার নাতনিটিকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে । বেশ তেজী মেয়ে ।

নীলিমা দাঁড়িয়েছিল সামনেই । জগদানন্দ তার পিঠে একটা স্নেহের চাপড় মেরে বলেন, হবেই তো ! ওর জন্ম যে সিংহরাশিতে !

—তাই নাকি ! সিংহরাশিতে জন্ম হলে বুঝি খুব তেজী হয় ?

হা-হা করে হেসে ওঠেন জগদানন্দ । বলেন, না, জ্যোতিষচর্চা অত সহজ নয় ; ওটা একটা রসিকতা করছিলাম । তবে নীলু-মা একটি ক্ষণজন্মা মেয়ে—  
যাকে বলে লগন-চাঁদা ! ওর লগ্নে রবিও আছেন কিনা ! মুশ্কিল হয়েছে  
ওর নবমে শনি রয়েছে—

তারপর হঠাৎ বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বলেন, আপনি জ্যোতিষ মানেন ?

বাসু বলেন, গণিত-জ্যোতিষ মানি, ফলিত-জ্যোতিষ মানি না ।

—আপনার কী রাশি ?

—আমি নিজেই তা জানি না । ও সব রাশিচক্র তিথি-নক্ষত্র আমি  
বুঝিই না ।

জলখাবার খেয়ে বৃদ্ধের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওঁরা নিচে নেমে গেলেন ।  
নীলিমা ওঁদের গাড়িতে তুলে দিতে এল । বাসু-সাহেব হঠাৎ প্রশ্ন করেন.  
নীলিমা, তোমার জন্মবারটা কী বলতো ?

--জন্মবার দিয়ে কী হবে ? সোমবার !

বাসু বলেন, এমনিই কৌতূহল হল জানতে ! আচ্ছা চলি !

তিন

পরদিন সন্ধ্যায় বুড়ো-কর্তার নিভৃত-কক্ষে যখন আবার ওঁরা দু-জন মুখোমুখি  
বসলেন তখন জগদানন্দ বললেন, ব্যারিস্টার-সাহেব, আজ আপনার জগ্রে আমি  
একটি 'সারপ্রাইজ' নিয়ে বসে আছি ! সেটা দেখলে আপনি চমকে উঠবেন ।

বাসু উৎসাহ দেখিয়ে বলেন, চমকিত হওয়া একটা দুর্লভ সৌভাগ্য !  
তাহলে আগে সেটাই দেখি । কাজের কথা পরে হবে ।

ছোট ছেলের মত মাথা দুলিয়ে জগদানন্দ বলেন, ওটি হচ্ছে না । চমকিত  
হওয়া যখন দুর্লভ সৌভাগ্য তখন প্রতিশ্রুতিমত আপনি আগে আমাকে চমকিত  
করুন ! কথা ছিল, আজ সন্ধ্যায় আপনি আমাকে জানাবেন রহস্যটা কী !  
যানে আমার রহস্যটা ।

বাসু-সাহেব বলেন, সে-সব কথা থাক !

—তাহলে তো হবে না ব্যারিস্টার সাহেব । সে-ক্ষেত্রে আগে হার  
দীকার করুন ।

—কবলাম !

খুশিয়াল হয়ে ওঠেন জগদানন্দ । বলেন, লয়েডস্ ব্যাং কোন খবর দিতে  
পারল না !

—লয়েভস্‌ ব্যাকে আমি আদৌ যাই নি।

—তাহলে আপনি অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করছেন, মহেন্দ্র কী ব্যাপারে আমাকে ব্র্যাকমেল করছে তা আপনি জানতে পারেন নি ?

বাস্থ বিরক্ত হয়ে বলেন, একই কথা আমাকে দিয়ে বারে বারে কেন বলাচ্ছেন মিঃ সেন ?

জগদানন্দ ঈষৎ লজ্জিত হয়ে বলেন, কিছু মনে করবেন না বাস্থ-সাহেব। এতে আপনার লজ্জিত হবার কিছু নেই। যে গাধা বাধ করতে মহেন্দ্রের পঁচিশ বছর লাগল তা যে আপনি চব্বিশ ঘণ্টায় জানতে পারবেন না তা আমিও জানতাম। তবে আপনাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে হচ্ছে একটি বিশেষ কারণে। এই নিয়ে ইতিমধ্যে আমি বাজি ধরে বসে আছি কিনা! আপনার অসাক্ষ্যে আমি একশ টাকা বাজি জিতলাম!

বাস্থ-সাহেব পাইপে অগ্নি সংযোগ করছিলেন। হঠাৎ থেমে পড়ে বলেন, মানে ? এ নিয়ে বাজি ধরেছেন ? কার সঙ্গে ? নাহনি ?

—না! আপনার গুরু ব্যারিস্টার এ. কে. রে!

বাস্থ-সাহেবের হাতে দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে গেল। মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে বলেন, সেটা কি রকম ?

—কাল আপনি চলে যাবার পরেই আমি রে-সাহেবকে টেলিফোন করেছিলাম। ঠুঁকে বললাম, আপনি বলেছেন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমার একটা রহস্য উদ্ঘাটন করে দেবেন। শুনে রে সাহেব বললেন—বাস্থ যদি কথা দিয়ে থাকে তবে নিশ্চয়ই করবে! তারপর যা হয়ে থাকে। দুই বুড়োয় কথা কাটাকাটি! শেষ-মেশ একশ' টাকার বাজি!

বাস্থ এবার দেশলাই থেকে দ্বিতীয় একটি কাঠি বার করে পাইপটা ধরালেন। গম্ভীর হয়ে বললেন, সেন-সাহেব, সেন-মশাই, আমার উক্তি আমি প্রত্যাখ্যান করে নিচ্ছি। গুরুর আর্থিক লোকদান আমি হতে দিতে পারি না। আপনার রহস্য আমি উদ্ঘাটন করেছি!

জগদানন্দ মিটি মিটি হাসছেন। বলেন, বটে! তবে সেটাই শোনান আগে।

বাস্থ ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন একবার। ঘরে ওঁরা তিনজনই মাত্র আছেন। জগদানন্দ, তিনি আর কৌশিক। তবু উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এলেন। বললেন, সেন-মশাই, কথাটা অপ্রিয়, তাই সব স্নেনে শুনেও আমি হার স্বীকার করছিলাম। বিশ্বাস করুন, আমি ব্যাপারটা জানি।

জগদানন্দ ঘন ঘন মাথা নাড়ছেন। বলেন, ও ভাবে ফাঁকি দিতে পারবেন না!

বহু যেন নিকুপায় হয়ে খুঁকে পড়েন। অক্ষুটে বলেন, আমি জানি—মহেন্দ্র এতদিনে প্রমাণ সংগ্রহ করে এনেছে যে, নীলিমা আপনার পৌত্রী নয়।

প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলেন জগদানন্দ। কৌশিকও চমকে ওঠে। বেশ কিছুক্ষণ দম ধরে থেকে জগদানন্দ বলেন, আর একটু খুলে বলুন, কী বলতে চাইছেন।

—বলছি যে, আপনার পুত্র সদানন্দ সেন নীলিমার বাপ নয়—এ তথ্যটা মহেন্দ্র আবিষ্কার করেছে। হয়তো সে অনেকদিন ধরেই এটা জানত—সম্প্রতি একাট্টা প্রমাণ সংগ্রহ করে এনেছে!

মাথাটা নিচু হয়ে গেল জগদানন্দের। অনেকক্ষণ নির্বাক বসে রইলেন তিনি। তারপর মুখ তুলে বললেন, আপনি কেমন করে জানলেন?

—সে প্রশ্ন অবাস্তব! এখন দেখান আপনি কি দেখাতে চাইছিলেন যেন? তবু উৎসাহ ফিরে পেলেন না জগদানন্দ। বললেন, আপনি জানাবেন না—কী পুত্রে এ তথ্যটা আবিষ্কার করেছেন?

—না! সে সত্য তো ছিল না।

আরও মিনিটখানেক গুম ঘেরে বসে রইলেন জগদানন্দ। তারপর উঠে গেলেন এবং আলমারি থেকে একটি দলিল নিয়ে এসে নীরবে বাড়িয়ে ধরলেন বাহু-সাহেবের দিকে। কাগজটা খুলে বাহু-সাহেব দেখেন সেটি একটি উইল। দলান্ত পাকা মুন্সিয়ানার সঙ্গে জগদানন্দ স্বহস্তে একটি উইল লিখেছেন। তাতে তাঁর যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তির খতিয়ান আছে। তাঁর গুরুদেব পাবেন দশ হাজার, নীলিমার এক মামা দশ হাজার, আর একজন কে যেন পাবেন পাঁচ হাজার, এইভাবে প্রত্যেকেই কিছু কিছু পাবে। নীলিমা পাবে নগদ পঁচিশ হাজার। জগদানন্দের বৈমাত্রেয় ভাইপো যোগানন্দ পাবেন পঞ্চাশ হাজার এবং তাঁর বালিগঞ্জ সাকুলার রোডের বসত বাড়িটা নিব্বাট মর্কে উনি দিয়ে যাচ্ছেন মহেন্দ্রকে!

দীর্ঘ উইলটি পাঠ শেষ করে মুখ তুললেন বাহু সাহেব বলেন পড়লাম।

—পড়লেন তা তো দেখতেই পেলাম। এবার আপনার অভিমত?

বাহু-সাহেব হেসে বললেন, আমার বিশ্বাস এত সহজে মহেন্দ্র আর বিশ্বস্তরকে বোকা বানাতে পারবেন না! এ উইল পাল্টে যাতে আপনি আবার উইল করতে না পারেন সে ব্যবস্থা তারা করবে। প্রথমত: এটি রেজিস্ট্রি করাবে; দ্বিতীয়ত: আপনি যাতে তারপর আর দ্বিতীয় উইল না করতে পারেন, সে জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করবে!

—কী ব্যবস্থা?



—চব্বিশ ঘণ্টা আপনাকে নজরবন্দী করে রাখবে !

জগদানন্দ বলেন, আমি জানি। তাই এই ব্যবস্থাটিও করে রেখেছি।  
দ্বিতীয় উইল আমি আদৌ করব না।

উনি আর একটি কাগজ বার করে দেন—বসত বাড়িটি দান বিক্রয় করার  
অধিকার দিয়ে বাহু-সাহেবকে একটা স্পেশাল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি। বলেন,  
আপনি আমার আমমোক্তার-নামা নিয়ে আমার বসত বাড়িটি আমার তরফে  
নীলমাকে দান করে দিন। কালই। তারপর পরশু আমি আমার উইলটা  
অপরিবর্তনীয় শেষ উইল হিসাবে রেজিস্ট্রি করাব এবং একটি কপি মহেন্দ্রকে  
দেব। আমার বিশ্বাস ও মেনে নেবে। তিনটি কারণে—প্রথমতঃ ও জানে,  
এ বাড়ির দাম দু আড়াই লাখ টাকা। দ্বিতীয়তঃ আমি আর কদিন ?  
তৃতীয়তঃ আমার এই ডবল ক্রশিংটা ও সন্দেহ করবে না—ভাববে, আমার  
জীবদ্দশায় যাতে সে পুনরায় ঝামেলা করতে না আসে তাই এই ব্যবস্থা আমি  
করেছি। আমার মৃত্যুর পরে ও যখন উইল মোতাবেক এ বাড়ি দখল নিতে  
আসবে তখন সে জানতে পারবে যে, উইল করার আগেই বাড়ির মালিকানা  
হস্তান্তরিত হয়েছে !

বাহু-সাহেব বলেন, পরিকল্পনাটা ভাল। সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না ;  
কিন্তু তাহলে নাতনিকে মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা দিচ্ছেন কেন ? ওটা  
বিশ্বাসযোগ্য ভাবে একটু বাড়িয়ে দেওয়া ভাল নয় ?

জগদানন্দ হেসে বলেন, সেটা সম্পূর্ণ অল্প জিনিস। আমি দেখতে চাই এই  
উইল পড়ার পরেও ঐ ছোকরা—কি যেন নাম ?—ইয়া জয়দীপ, এ বাড়িতে  
আর মাথা গলায় কি না ! জয়দীপকে আমি উইলে সাক্ষী করব।

—এ বুঝিটা ভালই করেছেন ! এক টিলে দু-পাখি !

বাড়িতে ফিরে এসে কৌশিক চেপে ধরল বাহু-সাহেবকে, এবার বলুন,  
কেমন করে জানলেন জগদানন্দের ঐ গোপন রহস্য ?

ইঞ্জিচেরায়ে বসে পাইপ ধরাচ্ছিলেন বাহু-সাহেব। বলেন, বুঝলে না ?  
পিওর এ্যাণ্ড লিম্বল ম্যাথমেটিক্স ! অঙ্ক রে বাবা, অঙ্ক !

—অঙ্ক মানে ? কিসের অঙ্ক ?—কুথো ওঠে কৌশিক।

—অ্যাস্ট্রনমির। গণিত-জ্যোতিষ ! শিবপুর বি. ই. কলেজে অ্যাস্ট্রনমি  
পড়ানো হয় ?

—হয় না ; কিন্তু বি. এন্-সিতে আমার অঙ্ক অনার্স ছিল। ওটা বুঝি।  
ও-ভাবে আরাকে ব্লাফ দিতে পারবেন না। অ্যাস্ট্রনমির অঙ্ক কে কার বাপ

তো কখনও বোকা যায় না !

—যায় রে বাপু, যায়। শোন বুঝিয়ে দিচ্ছি। কথা প্রসঙ্গে জগদানন্দ নীলিমার জন্ম সম্বন্ধে কী কী বলছিলেন বল দিকিন !

—আমার ঠিক ঠিক মনে নেই, আপনিই বলুন।

—উনি বলেছিলেন, এক নম্বর—ওর জন্ম রাশি সিংহ, দু-নম্বর ও লগন চাঁদা মেয়ে, তিন-নম্বর ওর জন্ম লগ্নে রবি, চার নম্বর ওর নবমে শনি। কেমন ?

—তা হবে। তাতে কী হল ? তাতে কখনও প্রমাণ হয় তার বাপ দখানন্দ নয় ?

—হবে রে বাপু, হবে। অঙ্কটা আগে কষতে দাও। প্রথম কথা—‘জন্মলগ্ন’ কাকে বলে ? জান ? জন্মের সময় যে রাশি পূর্বগগনে উদয় হচ্ছে। তাই তো !

—হ্যাঁ তাই।

—ওর লগ্নে রবি আছেন, অর্থাৎ জন্ম মুহূর্তে সূর্য ও শুটি শুটি উঠছেন ? অর্থাৎ ওর জন্ম সূর্যোদয় মুহূর্তে ! কেমন ?

—তাতে কি হল ?

—তাতে প্রমাণ হল ওর জন্মমাস ভাদ্র !

—তা কেমন করে প্রমাণ হল ?

—হল না ? ওর জন্মরাশি হচ্ছে ‘সিংহ’। জন্মরাশি কি ? জন্ম মুহূর্তে চন্দ্র যে রাশিতে আছেন ! অর্থাৎ চন্দ্র ছিলেন সিংহে। যেহেতু ও লগন-চাঁদা এবং ওর লগ্নে আছেন রবি—ফলে জন্মমুহূর্তে চাঁদ ও সূর্য দুজনেই সিংহ রাশিতে। নয় ? এখন ‘সিংহরাশিষ্বে ভাস্করে’ মানেই ‘এ ভরা বাদর মাহ ভাদর !’ ওর জন্মমাস ভাদ্র !

কৌশিক একটু ভেবে নিয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হয়। বাম্ব বলেন, শুধু ভাদ্র মাসই নয়, ভাদ্রের অমাবস্যা।

—কেন ? অমাবস্যা কেন ?

—যেহেতু সূর্য ও চন্দ্র একই রাশিতে। অ্যাস্ট্রোনমি পেপারে কত নম্বর পেয়েছিলে ?

কমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে কৌশিক বললে, ও ইয়েস !

—তাহলে এ পর্যন্ত জেনেছি যে, নীলিমা কোন একটি ভাদ্রমাসের অমাবস্যার সূর্যোদয় মুহূর্তে জন্মেছে। এগ্রিড ? নাউ ! আমাদের চার নম্বর হাইপথেসিস ছিল ‘নবমে শনি।’

কৌশিক স্বীকার করে, ঐ ব্যাপারটা আমি বুঝিনি। ‘নবমে শনি’ মানে কি ?

বাস্থ বলেন, তোমার বুঝতে না পারাই স্বাভাবিক। ওটা অ্যাস্ট্রনমির এক্টিয়ারভূক্ত নয়, অ্যাস্ট্রলজির ব্যাপার। 'লগ্ন' থেকে নয়-ঘর গুণে যে রাশি পাওয়া যাবে সেখানে জন্ম সময়ে শনি ছিলেন এটাই বুঝতে হবে। যেহেতু ওর লগ্ন ছিল সিংহ তাই জন্মসময়ে দেখা যাচ্ছে শনি আছেন মেঘ রাশিতে। ওর জন্ম-ছটকায় যেটুকু জানা গেল তার সাক্ষেতিক চেহারা এই রকম—সিংহ রাশিতে আছেন রবি (র), চন্দ্র (চ) এবং লগ্ন (লং) আর মেঘরাশিতে শনি (শ)। মজা হচ্ছে শনিগ্রহ এক এক রাশিতে থাকেন আড়াই বছর। মানে গোটা রাশিচক্র পাক মারতে তাঁর সময় লাগে আড়াই ইন্টু-বারো, ত্রিশ বছর! বর্তমান বছরে, এই ১৯৭৫ সালে শনি আছেন মিথুনে। দেখছি, নীলিমার

	বৃষ	মেঘ	মীন
৩০ ৩১		শ	
৩২ ৩৩			
৩৪ ৩৫	লং ৩৬		
	কন্যা	তুলা	বৃশ্চিক

জন্ম সময়ে তিনি ছিলেন দু-রাশি পিছনে। তার অর্থ ওর জন্ম সময়টা আজ থেকে পাঁচ বছর, অথবা ত্রিশ-প্লাস-পাঁচ পঁয়ত্রিশ বছর, কিম্বা ত্রিশ-হুগুণে-ষাট প্লাস পাঁচ পঁয়ষট্টি বছর আগে—কেমন তো? যেহেতু নীলিমাকে পাঁচ বছরের খুকি অথবা পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ি বলে মনে হচ্ছে না তাই ওর বয়স পঁয়ত্রিশ! এগ্রিড? সিদ্ধান্তটা একটা বিকল্প পদ্ধতিতেও প্রমাণ করা যায়—নীলিমা প্রথম সাক্ষাতে বলেছিল তার বয়স চৌত্রিশ; অস্তুত একটা বছর হাতে না রেখে কোন যৌবনোত্তীর্ণা অনুগা নিজের বয়স বলে না। ফলে চৌত্রিশ প্লাস এক পঁয়ত্রিশ! সংক্ষেপে নীলিমার জন্ম বৎসর ১৯৪০।

কৌশিক এতক্ষণে একটা মস্ত ফাঁক বার করেছে হিসাবে। বললে, তা কেন? শনি মেঘরাশির প্রথমদিকে আছেন কিম্বা শেষ দিকে আছেন তা তো জানেন না। আপনি নিজেই বললেন এক রাশি পার হতে শনির আড়াই

বছর লাগে। ফলে সালটা 1941 অথবা 1939 ও তো হতে পারে!

—কারেক্ট! ভেরি কারেক্ট! ভেরি ভেরি কারেক্ট। বরং তোমার বলা উচিত ছিল সে-হিসাবে 1938 থেকে 1942 যে-কোন সাল হতে পারে।

—পারেই তো!

—না, পারে না। কেন পারে না জান? খুব সহজ কারণে। ঐ পাঁচটা বছরে পাঁচ-পাঁচটা ভাদ্রের অমাবস্তা এসেছে। তার ভেতর শুধু মাত্র 1940-এর ভাদ্রের অমাবস্তা পড়েছে সোমবারে—যেটা নীলিমার স্বীকৃতি অহুসারে ওর জন্মবার! ফলে সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ হল—নীলিমার জন্ম 1940 সালের ভাদ্র অমাবস্তায় সূর্যোদয়ের মুহূর্তে। বাংলা হিসাবে সেটা মতেরই ভাদ্র ১৩৪৭ ইংরাজী দেশরা সেপ্টেম্বর 1940।

—বেশ তাও না হয় যেনে নিলাম; কিন্তু তা থেকে তার পিতৃ-পরিচয়—

—ধীরে রজনী, ধীরে! ব্যাক অব বর্মার ড্রাফট-এর তারিখ ছিল 18.5.1940। জগদানন্দের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সদানন্দ মাসখানেক বর্মায় ছিল। যদি ধরে নিই একেবারে প্রত্যাবর্তনের শেষ দিনে সে ড্রাফটটা নিয়েছে তাহলে সদানন্দের বর্মামূল্যে পদার্পণের তারিখটা হচ্ছে 14.4.1940। যদি ধরে নিই যেস্কুনে পদার্পণের দিনই নীলিমার মায়ের সঙ্গে সদানন্দের সাক্ষাৎ খটে থাকে তবে দুজনের প্রথম সাক্ষাৎ সময়ে নীলিমার মায়ের গর্ভে জ্ঞানের বয়স অন্ততঃ পাঁচ মাস! Q.E.D.!

কৌশিক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, আপনাকে একটা প্রণাম করব বাহুমামা?

বাহু-সাহেব ইজিচেয়ারের হাতলে ঠা'ও জোড়া তুলে দিয়ে বলেন, ভাগনে মামাকে প্রণাম করবে—এতে আবার তিথি নক্ষত্র দেখার কি আছে? কর!

চার

জগদানন্দের পরিকল্পনাটি খাসা। কিন্তু সেই-মোতাবেক কাজ করা মুশকিল হয়ে পড়ল। বাহু-সাহেব আমমোক্তার-বলে জগদানন্দের তরফে গোপনে তাঁর বসতবাড়িটি দানপত্র করে দিলেন তাঁর পৌত্রীকে—না, ভুল বললাম। দলিলের কোথাও উল্লেখ নেই দানগ্রহীতা নীলিমা সেন জগদানন্দের পৌত্রী। বরং বলা হয়েছে, যে-হেতু সেন-পরিবারভুক্ত 'কুমারী নীলিমা দেবী' বৃদ্ধ বয়সে দাতা জগদানন্দের সেবা শুশ্রূষা যত্ন আদি করছেন তাই

প্রতিদানে খুশীমনে স্বহ বহাল তবিরতে দাতা নিব্যাচ-স্বখে ইত্যাদি ইত্যাদি—

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জগদানন্দ জয়দীপ এবং নীলিমাকে তাঁর নিভৃত কক্ষে ডেকে পাঠালেন। দ্বানপত্রর কথা গোপন রেখে উইলখানি ওদের ছদ্মনকে পড়তে দিলেন। ছদ্মনে আত্মস্ব তাঁর অপরিবর্তনযোগ্য শেষ উইলখানি পাঠ করলে জগদানন্দ প্রসন্ন করেন, তোমাদের মতামত নেবার জন্ত এ উইল পড়তে দিইনি, বস্তুতঃ তোমাদের মতামতে এটা পরিবর্তনও করব না। আমি ; তবু আমি জানতে চাই এ বিষয়ে তোমাদের কিছু কী বলার আছে ?

নীলিমা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বসেছিল এতক্ষণ। এ প্রশ্নে মাথা ঝাঁকিয়ে শুধু বললে, না !

জয়দীপ কিন্তু স্থির থাকতে পারল না। বললে, আমার একটা কথা বলার ছিল। আপনি এভাবে নীলিমাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করছেন কেন ?

—বঞ্চিত করছি ! কে বলল ? তাকে তো নগদ পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে যাচ্ছি !

—এবং আপনার ভাইপোকে দিয়ে যাচ্ছেন পঞ্চাশ হাজার টাকা, আর নিঃসম্পর্কীয় ঐ মহেন্দ্রবাবুকে দিয়ে যাচ্ছেন এই বাস্তুভিটা।

—হ্যাঁ, তাতে কি হল ?

জয়দীপ স্থির হয়ে বসে রইল। জবাব জোগালো না তার কণ্ঠে। শেষে উঠে গেল সে।

পরদিন, শুক্রবার সকালে সে ফিরে এসে বললে, কাল আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি। আপনি জানেন যে, আমি নীলিমাকে বিবাহ করিতে চাই। আপনার আপত্তি ছিল। যে কারণে আপনি আপত্তি করছিলেন আশাকরি সেই কারণটা এখন আর নেই। যদি মনে করেন এখনও সেই কারণটি আছে তবে ঐ পঁচিশ হাজার টাকা থেকেও তাকে বঞ্চিত করে যান, আমি শুকে এ বাড়ি থেকে নিয়ে যাই।

জগদানন্দ রাগ করেননি। খুশী হয়েছিলেন। জবাবে বলেছিলেন, নীলুর বিবাহ আমার এই শেষ বয়সের শেষ উৎসব। এ ঝামেলা মিটে যাবার আগে সে বিষয়ে আমি চিন্তা করছি না। উইলটা হয়ে যাক, আপদ বিদায় হ'ক—তারপর তোমাদের সঙ্গে কথা বলব।

—আপদ বিদায় হ'ক মানে ? মহেন্দ্রবাবুকে তো আপনি খুশি মনে—

বাধা দিয়ে জগদানন্দ বলেছিলেন, ও কথা থাক !

ঝামেলা কিন্তু মিটল না। মহেন্দ্র এবং বিষ্ণুজ্বর এ প্রস্তাবে প্রথমটা রাজী হয় নি। শেষে অনেক কষ্টে জগদানন্দ রাজী করান। উইলে আরও উল্লেখ

করা হল যে, এইটিই তাঁর শেষ উইল। যে কোনও কারণেই হ'ক এ উইল পরিবর্তন করে উনি যদি ভবিষ্যতে নতুন উইল প্রণয়ন করেন তবে তা আইনতঃ গ্রাহ্য হবে না।

এরপর মহেন্দ্র-বিশ্বস্তর পার্টি রাজী হলেন। রাজী হলেন না বাস্তব। বাস্তবঃ। তিনি প্রকাশ্যে দেখালেন এ অবস্থায় তিনি মোটেই খুশী নন। উইলে সাক্ষী হিসাবে তিনি সই দিতেও অস্বীকার করলেন। হয় তো সেজন্যই মহেন্দ্র-বিশ্বস্তর পার্টি আরও খুশী মনে এ ব্যবস্থামেনে নিলেন। সাক্ষী হিসাবে সই দিলেন এ্যাডভোকেট বিশ্বস্তরবাবু এবং জয়দীপ। শনি-রবি-সোম তিন দিনই ছুটি। স্থির হল, মঙ্গলবার ওটি রেজিস্ট্রি করানো হবে। আপাততঃ উইলের মূল কপিটি থাকল মহেন্দ্রের জিন্দায়।

ঐ শনিবারেই ঘটল একটা অদ্ভুত ঘটনা। জগদানন্দের সঙ্গে দেখা করতে এলেন একজন অদ্ভুতদর্শন স্মাট পরা ভদ্রলোক! তাঁকে নীলিমা ইতিপূর্বে কখনও দেখে নি, চেনে না। খবর, হুইপুই—বয়স ষাটের কাছাকাছি। নাকটা খাণ্ডা, চোখ দুটি ছোট—ত্যাঁড়চ্যাঁড়। যাকে বলে মঙ্গোলীয় ছাপ। গায়ের রঙ তামাটে। কুন্ডলার কক্ষে তিনি জগদানন্দের সঙ্গে কী আলোচনা করলেন তা কেউ জানে না; কিন্তু নীলিমা লক্ষ্য করে দেখে তিনি চলে যাবার পর পিস্ফোরণের পূর্বমুহূর্তে আগ্নেয়গিরির মত গুম্ মেয়ে বসে আছেন জগদানন্দ। সে প্রশ্ন করেছিল, ও ভদ্রলোক কে দা?!

হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটল। চাপা গর্জন করে উঠলেন জগদানন্দ, খুন করব! সব কটাকে খুন করব আমি! এরা ভেবেছে কি?

ক্রমশঃ বোঝা গেল ঐ অজ্ঞাতনামা ভদ্রলোকটির নাম যু সিয়াঙ। পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে তিনি ছিলেন জগদানন্দের বর্মা-অফিসের ম্যানেজার। নীলিমা আন্দাজে বুঝতে পারে—মহেন্দ্র হয় তো এঁর মাধ্যমেই গুপ্তবহন মন্ত্রতি উদ্ধার করেছেন এবং ধূর্ত বর্মী ভদ্রলোক ব্যাপারটা আঁচ করে স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন। অর্থাৎ মহেন্দ্রবিদায় পর্ব চুকলেও মুক্তি পাচ্ছেন না জগদানন্দ। এবার তাঁকে যু সিয়াঙ-এর সম্মুখীন হতে হবে। জগদানন্দের নির্দেশে নীলিমা বাস্তব-সাহেবকে ফোন করল। ওর কাছ থেকে সব শুনে বাস্তব-সাহেব বললেন, এসব ব্যাপারে আমার চেয়ে কৌশিকই তোমাদের বেশী সাহায্য করতে পারবে। কাল সকালে সে যাবে তোমাদের বাড়িতে।

রবিবার কৌশিক সেই অহুসারে এসে উপস্থিত হল জগদানন্দের বাড়িতে। জগদানন্দ তাকে নিভুতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, আপনি আশাকরি বুঝতে পেরেছেন আমার সমস্যাটা কী। এই যু সিয়াঙ লোকটাই মহেন্দ্রকে সরবরাহ

করেছে যাবতীয় তথ্য। ঠিক কী কী তথ্য তা আমি জানি না—আন্না জ করতে পারি। হয় তো যে জাহাজে সদানন্দ গিয়েছিল এবং ফিরে এসেছিল সেই জাহাজের নাম, হয়তো চৌত্রিশ বছর আগেকার সেই প্যাসেঞ্জার লিস্ট-এর ফটো-স্ট্যাট কপি নিয়েছে ওয়া। হয়তো যে হোটেলে সদানন্দ রেক্সনে একমাস ছিল তার হোটেল রেজিস্টার থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে—অথবা নীলুব মাকে যারা চিনত তাদের নাম ধাম বর্তমান ঠিকানা সব সংগ্রহ করেছে।

কৌশিক জানতে চায়, লোকটা কী চাইছে?

—টাকা! কোনও সন্দোচ করেনি যু সিয়াঙ—সে স্পষ্ট বলেছে মহেন্দ্রের সঙ্গে তার সর্ত হয়েছিল যে, সে যা আদায় করবে তার অর্ধেক তাকে দেবে। তার আশঙ্কা মহেন্দ্র তাঁকে ফাঁকি দেবে। তাই তার প্রস্তাব মহেন্দ্রকে আমি যা খেদারত হিসাবে দেব বলেছি তার অর্ধেক তাকে দিতে হবে।

—ও কোথায় থাকে?

—ও লোজা এসেছে রেক্সন থেকে। আছে পার্ক হোটেলে, রুম নম্বর 38 বলেছে, আমি কী স্থির করলাম তা ওকে ঐ রুম নাম্বারে ফোন করে জানিয়ে দিতে।

—ওর সঙ্গে মহেন্দ্রের যোগাযোগ হয়েছে?

—আমি জানি না। আমি ওকে বলেছিলাম মহেন্দ্র এ বাড়িতেই থাকে যদি সে দেখা করতে চায় তবে আমি তাকে ডেকে আনতে পারি। তাহে সে রাজী হয় নি। বলেছিল, মহেন্দ্রের সঙ্গে তার যা ফলশালা করার কথা ত সে জনাস্তিকেই করবে।

কৌশিক সব শুনে বলল, ঠিক আছে। যা ব্যবস্থা করার আমি করছি বাস্তব সাহেবকেও সব জানানো।

সেদিনই নীলিমা আর জয়দীপ এসে দেখা করল কৌশিকের সঙ্গে। জানতে চাইল—ব্যাপারটা কী?

কৌশিক বলে, নীলিমা দেবী যা আশঙ্কা করেছিলেন ঠিক তাই। অর্থাৎ মহেন্দ্র গোপন খবরটা সংগ্রহ করেছে ঐ বমী ভদ্রলোকের মাধ্যমে। উনি এখন বুঝতে পেরেছেন যে, তথ্যটা ব্ল্যাকমেলিঙ-এর পক্ষে প্রশস্ত। ফলে নিজেই চলে এসেছেন রেক্সন থেকে ভারতবর্ষে।

—কিন্তু গোপন তথ্যটা কী?—জানতে চায় জয়দীপ।

কৌশিক সজ্ঞান মিথ্যা ভাবণ করে, সেটা এখনও জানা যায় নি।

—এখন কি করতে চান?

—প্রথম ব্যবস্থা হচ্ছে সর্বক্ষণ ঐ যু সিয়াঙ ভদ্রলোককে নজরে রাখা

থা। আমাদের জানতে হবে, ওর সঙ্গে মহেন্দ্রবাবুর বর্তমান সম্পর্কটা কী ? মহেন্দ্রবাবুকেও নজরে নজরে রাখতে হবে।

—আপনি একা মানুষ—ছুটো মানুষকে ছুঁজারগায় নজরে রাখবেন কেমন করে ?

—আমাকে লোক লাগাতে হবে। এ জাতীয় কাজ করার লোক আমার শূন্য আছে। দৈনিক চুক্তিতে তাদের এনগেজ করতে হবে।

জয়দীপ বলে, তার চেয়ে এক কাজ করা যাক। আমি নিজেই ঐ পার্ক হোটেলে গিয়ে একটা ঘর নিই। যু সিয়াঙ আমাকে চেনে না। তাকে জব্দবন্দী করি। সে কলকাতা শহরও চেনে না, ফলে তার সঙ্গে ভাব করে হয়টা দেখাই—হয়তো কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারব।

কৌশিক বাজী হল। এ ব্যবস্থাটা ভাল। জয়দীপ বেশ চালাক চতুর কে দিয়ে কাজ হবে। রবিবার বিকালেই জয়দীপ পার্ক হোটেলে একটা ঘর নিল। ঐ আটত্রিশ নম্বর ঘরের পরের পরের ঘরটা—চল্লিশ নম্বর কামরা।

বাসু-দাহেব বাড়ি ফিরে সব কথা শুনলেন। বললেন, আমার কেমন খেন লাগছে না কৌশিক। চল, একবার বুড়োর সঙ্গে দেখা করে আসি।

কৌশিক দললে, সেটাই ভাল। বুদ্ধ সকালবেলা আমাকে পেয়ে খুশী হন নি। আপনার কথা বাবে বাবে জিজ্ঞাসা করছিলেন।

সত্যি বাসু-দাহেবের সাক্ষাৎ পেয়ে খুশী হয়ে উঠলেন জগদানন্দ। বললেন, মনই একটা কিছু আশঙ্কা করেছিলাম আমি। আজ থেকে শনির দশা শুরু। যে আমার।

বাসু বললেন, সেন-মশাই, আমি ওসব শনির দশা, বৃহস্পতির দশা বুঝি। যা বুঝি তা হচ্ছে এই যে, আপনি বর্তমানে একটি প্রচণ্ড বিপদের খীন হয়েছেন। তাই আমি ছুটে এসেছি। মহেন্দ্র আর বিশ্বস্তর কি ঐ সিয়াঙের আগমন সংবাদটা জানে ?

—বোধহয় না। যে সময় যু সিয়াঙ আসে তখন ওরা দুজনেই বাড়ি ছিল।

—বুঝলাম। ওরা এখন বাড়ি আছে ?

—আছে।

—তবে ওদের ডেকে পাঠান। নীলিমা আর জয়দীপকেও ডাকুন।

সবাই সম্মত হল বাসু বললেন, আপনারা সকলেই জানেন, গত পরশু দানন্দবাবু একটি উইল তৈরী করেছেন। তাতে কী আছে, আমি জানি না।

আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি ঐ উইল করেন—কিন্তু আপনারা তা



জানেন। উইলটি রেজিস্ট্রি করা হয়নি, কিন্তু তাতে জগদানন্দের স্বাক্ষর আছে—সেটি আইনমোতাবেক সিদ্ধ। আমার মতে, যতদিন না উইলটি রেজিস্ট্রি করা হচ্ছে ততদিন সেটা উইলের কোন বেনিফিশিয়ারির কাছে থাকা উচিত নয়।

—কেন বলুন তো?—জানতে চান বিশ্বস্তর উকিল।

—সেটাই প্রথা। তা ছাড়াও কারণ আছে।

—সেই কারণটাই তো আমি জানতে চাইছি।

বাসু-মাহেব হঠাৎ ঘুরে বসেন মহেন্দ্রের দিকে। তাকে সরাসরি প্রশ্ন করেঃ  
মহেন্দ্রবাবু, আপনি যু সিয়াঙ বলে কাউকে চেনেন?

মহেন্দ্র এ প্রশ্নে হঠাৎ থতমত খেয়ে যায়। কিন্তু সে জবাব দেবার আগে বিশ্বস্তর প্রতিপ্রশ্ন করে, সে প্রশ্নের সঙ্গে এ বিষয়ের পারস্পর্শ্য কি?

বাসু ওর কথা কানে তোলেন না, মহেন্দ্রকেই প্রশ্ন করেন—আপনি সম্পূর্ণ রেজুর্নে গিয়ে ঐ যু সিয়াঙ-এর সঙ্গে দেখা করেন নি?

মহেন্দ্র আমতা আমতা করে। তাকে খামিয়ে দিয়ে বিশ্বস্তর বলে, মিস্টার বাসু, আপনার যা কিছু প্রশ্ন তা আমাদের করবেন। মক্কেলের তরফে আপনি তো হাজির আছি।

মহেন্দ্র ঢোক গিলে চূপ করে যায়। বাসু এবার বিশ্বস্তরের দিকে ঘি বলেন, বেশ আপনাকেই বলছি। আপনার মক্কেল যেমন পঁচিশ বছর পরে এ খেসারত দাবী করেছে, ঠিক সেইভাবে ঐ যু সিয়াঙও এসে দাবী করেছে টাকা তারও ঐ একই বক্তব্য! সেটা যে কী, তা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন?

—না, পারছি না। সেটা কী?

—তার প্রতিও জগদানন্দবাবু নাকি অস্ত্রায় করেছেন। সেও ঐ এক-রকম প্রমাণ দাখিল করে খেসারত দাবী করেছে।

—হতে পারে। তার সঙ্গে আমার মক্কেলের সম্পর্কটা কী? সে একটা অস্ত্র কেস?

—না, কেস একটাই। তা যাক। আপনি যেমন আপনার মক্কেলের দেখছেন, আমিও তেমনি আমার মক্কেলের স্বার্থ দেখছি। তাই বলতে চাই উইলটা আপনার মক্কেলের হেপাজতে থাকার সময়—এবং আমার মক্কেল সিয়াঙের সঙ্গে ঐ ব্যাপারটা কয়সালা করার আগে যদি আমার মক্কেলের ভালমন্দ হয়ে যায় তবে তার জন্য আপনার মক্কেল পুরোপুরি দায়ী থাকবে বুঝেছেন?

বিশ্বস্তর চোখ থেকে চশমাটা খুলে তার কাচটা মুছতে মুছতে বলেন, আনা, বুঝি নি। ‘ভালমন্দ’ বলতে কী বোঝ করেছেন?

—আই মীন এ্যান এ্যাটেন্‌পট টু মার্ডার ! খুন ! এবার বুঝলেন ? এস  
কৌশিক !

উঠে পড়লেন বাসু-সাহেব । ঘরের কেউই তখনও স্বাভাবিকতা ফিরে  
পায় নি ।

## পাঁচ

সোমবার সকাল আটটার সময় কৌশিককে ফোন করল জয়দীপ । ছেলেটা  
বুঝেই তুখড় ! গোয়েন্দাগিরির কাজটা সে ভালই করছে । তার খবর—গতকাল  
রাত নয়টার সময় মহেন্দ্র পার্ক হোটেলে এসেছিল । আটত্রিশ নম্বর পরে  
রুদ্ধদার কক্ষে বড়যন্ত্রকারী কী আলোচনা করেছে তা সে জানে না ; কিন্তু রাত  
দশটা দশে মহেন্দ্র হোটেল ছেড়ে চলে যায় । যু সিয়াঙ তখন নিচের ভাইনিং  
রুমে গিয়ে নৈশ আহার সারে । আহাৰান্তে যু সিয়াঙ নিজের ঘরে ফিরে  
আসে, মালপত্র বেঁধে ছেঁদে চেক-আউট করে বেরিয়ে যায় ।

কৌশিক টেলিফোনে বলেছিল, সে কী ! ওকে এত বড় ক'লকাতা শহরে  
নেপাত্তা হতে দিলেন ?

জয়দীপ বলল, আমি অত কাঁচা ছেলে নই । ও যদি ট্যাক্সি নিত তবে  
ওকে ফলো করতাম ; কিন্তু লোকটা ট্যাক্সি ভাঙে নি—হোটেলের গাড়িটাই  
ব্যবহার করেছিল । তাই সামান্য কিছু খরচ করে সহজে জানতে পেরে গেলাম  
ওকে কোথায় পৌঁছে দিয়ে এল গাড়িটা ।

—কোথায় গেল ও ?

—আমার থেকে বর্তমানে ফুট আস্টেক দূরে যু সিয়াঙ রয়েছে ।

—সে কি ! কোথা থেকে ফোন করছেন আপনি ?

—দমদম থেকে । ভি. আই. পি. হোটেলের একুশ নম্বর ঘর থেকে । যু  
সিয়াঙ আছে বাইশ নম্বরে । আমিও আজ সকালে পার্ক হোটেল থেকে চেক-  
আউট করে এখানে চলে এসেছি । এবার ঘটনাচক্রে ওর ঠিক পাশের ঘরটাই  
পেয়েছি ।

কৌশিক বলে, আমার মনে হয় মহেন্দ্র ওকে শাসিয়েছে কাল  
রাত্রে । বিদেশে বিঁড়ুই-এ যু সিয়াঙ বোধহয় একটু ঘাবড়ে গেছে । ক'লকাতা  
শহরের খুব একটা জ্ঞানমণ্ড তো নেই বাইরের ছনিয়ায় । তাই রাতারাতি  
হোটেল বদলে একেবারে দমদমে গিয়ে উঠেছে । যাতে তেমন তেমন অবস্থা  
হলে হুট করে প্লেনে চেপে বসতে পারে ।

জয়দীপ বলল, আমার কিন্তু মনে হয়, লোকটা সহজে পালাবে না। তাহলে এত খরচ করে বর্মা থেকে সে আদৌ আসত না।

—দেখা যাক।

বেলা বারোটা নাগাদ ফোন করল নীলিমা। বালিগঞ্জ সাকুলার রোডের বাড়িতেও শান্তি নেই। কাল বিকালে বাবু-শাহেব ঐ যে নাটকীয় ভঙ্গিতে ‘এ্যাটেম্প্ট টু মার্ডার’ কথাটা শুনিয়ে এলেন তারপর থেকেই জগদানন্দ কেমন যেন অস্থির হয়ে পড়েছেন। কাল রাত্রে ঔর একেবারে ঘুম হয় নি। আজ সকালে আলমারি খুলে ঔর একটা পুরানো দিনের হাতিয়ার বার করেছেন। বর্গায় থাকতে সখ করে কিনেছিলেন। গজদস্তের মূটওয়াল। একটা সৌখিন ছোরা। দেখতে সৌখিন, কাজে দড়—ব্রেডটা তীক্ষ্ণ, আট ইঞ্চি লম্বা। সেট আর আলমারিতে তোলেন নি—বালিশের নিচে রেখে দিয়েছেন। এ-ছাড়া আজ সকালে যোগানন্দবাবুর সঙ্গে তাঁর কী সব কথাবার্তা হয়েছে কল্পনার কক্ষে।

—যোগানন্দবাবুটা কে?—জানতে চেয়েছিল কৌশিক।

নীলিমা বুঝিয়ে দিয়েছিল, যোগানন্দ হচ্ছেন সম্পর্কে ওর ছোট কাকা অর্থাৎ জগদানন্দের ভাইপো—সেই থাকে তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছেন উইলে। যোগানন্দ নির্বিরোধী মানুষ। বিপত্নীক—ছেলে-মেয়েও নেই। থাকার মধ্যে আছে যোগানন্দের এক জালিকা পুত্র—জামল রায়। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স। সেও অবিবাহিত। একটা সগুদাগরী অফিসে চাকরি করে। ঐ বাড়িতেই থাকে। উপসংহারে নীলিমা বললে, দাদু আপনাকে একবার সন্ধ্যাবেলা দেখা করতে বলেছেন।

—কেন?

—কেন, তা বলেননি। তিনি মনে করেন আমি নাবালিকা। এসব আলোচনার আমার না থাকাই ভাল।

—কথাটা তো ঠিকই! কুমারী মেয়ে মাজেই বাঙালী পরিবারে নাবালিকা—

—তাই বুঝি? বয়সে কিন্তু আমি বোধহয় আপনার চেয়ে বড়!

—হতেই পারে না। কোন অবিবাহিত মেয়ে আমার চেয়ে বয়সে বড়; এটা আমি কখনই মেনে নিতে পারি না!

বিকাল পাঁচটা নাগাদ কৌশিক গিয়ে হাজিরা দিয়েছিল। বালিগঞ্জ সাকুলার রোডের বাড়িটার ঢুকবার মুখে দেখা হয়ে গেল জয়দীপের সঙ্গে। কৌশিক বললে, এ কি! আপনি এখানে? দম্বলের চিড়িয়া?

—ভয় নেই, চিড়িয়া আপনার ভাগে নি। শহর দেখতে বেরিয়েছেন।

জয়দীপ কাজের ছেলে। সে খবর রাখে যু সিয়াঙ আজ সকালে একটি টুরিস্ট বাসে সারাদিনের জঙ্গ ক'লকাতা শহর দেখতে বেরিয়েছে। বিকাল সাড়ে পাঁচটার টুরিস্ট বাসটা ফিরে আসবে এসপ্ল্যানেন্ড স্টেটে। জয়দীপ এখন সেখানেই আছে। বাস থেকে নামা মাত্র সে হারানো স্ত্রীর খেই ফিরে পাবে এবং তারপর আবার আঠার মত স্টেটে থাকবে তার পিছনে।

কৌশিক বললে, নতুন কোনও খবর নেই?

—কিছু না। লোকটা একাই ছিল ঘরে। কোন ভিজিটার আসে নি, কোনও টেলিফোনও নয়। আমি ওর মুভমেন্ট সমস্ত লিখে রাখছি আমার ভায়েরিতে।

জয়দীপ ঘড়ি দেখল। বললে, সময় হয়ে গেছে, আমি চলি।

কৌশিক বলে, চিড়িয়া দমদমে ফিরে গেলে ওখান থেকে আমাকে একটা কোন করে জানাবেন।

—জানাব।

জয়দীপ চলে গেল। কৌশিককে নিয়ে নীলিমা দ্বিতলে উঠে এল। গৃহস্থানী বললেন, কালকে বাহু-সাহেব ঐ কথাটা বলার পর থেকেই আমার মনটা চঞ্চল হয়েছে। উনি ঠিকই বলেছেন,—ঐ মহেন্দ্র আর বিশ্বম্ভর না পারে এমন কাজ নেই। অথচ ওদের এখন তাড়াতেও পারছি না। মহেন্দ্র বলেছে, উইলটো রেজিষ্ট্রি হয়ে গেলে ওরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে এবং আমার জীব-দশায় আর বিরক্ত করতে আসবে না। জানি না, সে তার কথা রাখবে কি না; কিন্তু ঐ যু সিয়াঙ এসে পড়ায় অবস্থাটা আবার গুলিয়ে গেছে।

—যু সিয়াঙ-এর সঙ্গে আপনি কি পৃথকভাবে বোঝাপড়া করতে চান?

—এখনও মনস্থির করতে পারি নি। যোগানন্দ সেই পরামর্শই দিচ্ছিল।

—যোগানন্দবাবু! তিনি কি সব কথা জানেন?

—এখন তো দেখছি, জানে। অন্তত ভাল ছেলেটা, জানলে—

জগদানন্দের কথা থেকে বোঝা গেল নির্বিরোধী বাহু যোগানন্দ বহুদিন আগে থেকেই এ গোপন রহস্যের সন্ধান রাখেন। প্রায় ত্রিশ বছর ধরে এটা জানেন, দ্বিতীয় কারও সঙ্গে আলোচনা করেন নি—এমন কি জগদানন্দের সঙ্গেও নয়। কী দরকার ওসব মানিকর প্রসঙ্গ আলোচনা করার?—ভাবটা এই। তারপর মহেন্দ্রর আগমন, উইল প্রণয়ন সব কিছুই খবর উনি রাখেন। একতলায় ঘরটিতে বসে আপন মনে হাঁকো টানেন আর চতুর্দিকে নজর রাখেন। কাল বিকেলে স্টাট-বুট পরা যে ভদ্রলোকটি এসেছিলেন তাঁকে

ইতিপূর্বে কখনও দেখেন নি যোগানন্দ । তবে আন্দাজ করতে পেরেছিলেন লোকটা কে । আজ সকালে তিনি দ্বিতলে উঠে এসে জগদানন্দকে সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন, কাকা কাল বিকেলে যে ভদ্রলোক এসেছিলেন তিনিই কি আপনার সেই রেহুনের ম্যানেজার হু সিয়াঙ ?

জগদানন্দ চমকে উঠে বলেছিলেন, তুমি কেমন করে জানলে ?

—আন্দাজ করছি । আমি একটা কথা বলতে এসেছি কাকা—

—বল । বস ঐ চেয়ারটায় ।

যোগানন্দ বসেন নি । দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলেন, এবার নীলুর বিয়েটা আপনি দিয়ে দিন । শ্রামলের সঙ্গে নয়, ঐ জয়দীপ ছেলেটির সঙ্গেই । ওরা দুজনেই দুজনকে—

মাঝপথে থেমে গিয়েছিলেন যোগানন্দ । বুদ্ধ বলেছিলেন, কিন্তু তুমি তো এতদিন তোমার শ্রালিকাপুত্র ঐ শ্রামলের সঙ্গেই নীলুর বিয়ে দিতে চাইতে । আজ হঠাৎ তোমার মত বদলালো কেন ?

—শ্রামল ছেলেটা সত্যি ভালো । কিন্তু দিনকাল পালটে গেছে । এখন আর বাপ-মা-কাকা-জেঠাদের পছন্দ অল্পসারে ছেলেমেয়েরা বিয়ে করে না । জয়দীপ আর নীলিমা যখন পরস্পরকে—

এবারও সন্কোচে থেমে গিয়েছিলেন উনি ।

জগদানন্দ বলেন, ঠিক আছে । তোমার কথাটা মনে রাখব । আপাতত একটা ঝামেলায় পড়েছি, সেটা মিটুক ।

—সে সম্বন্ধেও আমার কিছু বক্তব্য আছে । আমারও বয়স ষাটের কোঠায় । একা মানুষ, কতদিনই বা বাঁচব ? আপনি কেন শুধু শুধু আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে যাচ্ছেন, কাকা ?

জগদানন্দ অবাক হয়ে যান । কী বলবেন ভেবে পান না ।

—তার চেয়ে ঐ পঞ্চাশ হাজারের ভিতর থেকে বিশ-পঁচিশ হাজার দিয়ে হু সিয়াঙ-এর সঙ্গে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলুন ।

জগদানন্দ চমকে উঠে বলেন, তার মানে ? কী মেটাবো ?

মাথা নিচু করে যোগানন্দ বলেন, কাকা, এ বাড়িতে আপনার ছেলের মতই মানুষ হয়েছি । আমি তো সবই জানি । আপনি আমাকে যা দিয়ে যাবেন, আমি মরে গেলে ঐ নীলুই আবার তা পাবে । অথচ আজ যদি সব জানাজানি হয়ে যায় হয়তো জয়দীপ বঁকে দাঁড়াবে । হয়তো নীলু মনের দুঃখে ...না-কাকা, আপনি আর আপত্তি করবেন না—

সব কথা শুনে কৌশিক জানতে চাইল কেন তাকে ডেকে পাঠানো

হয়েছে। জগদানন্দ বললেন যে, গতকাল বাসু-সাহেব যে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন তারপর থেকেই তিনি কেমন যেন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন! গতকাল তাঁর তিলমাত্র ঘুম হয়নি। জগদানন্দ অস্বস্তিরোধ করলেন, মহেন্দ্র যতদিন না বিদায় নিচ্ছে—মানে আর দু-তিন দিন হতে পারে—ততদিন কৌশিক বরং এ বাড়িতেই রাজিবাস করুক। কাল রেজিস্ট্রেশন হবে—তারপরেই মহেন্দ্র চলে যাবে। তখনই কৌশিকের ছুটি।

কৌশিক রাজী হল। বাড়িতে ফোন করে দিল। স্থির হল, কৌশিক থাকবে দ্বিতলে—জগদানন্দের ঘরের বিপরীতে উত্তর দিকের ঘরে। সে ঘরে এতদিন ছিলেন উকিল বিশ্বম্ভরবাবু, অগত্যা তাঁকে একতলায় নেমে যেতে হল। মহেন্দ্রবাবু তাঁর উকিলের কাছাকাছি থাকতে চান, তাই তিনিও দ্বিতল ছেড়ে একতলায় যোগানন্দের ঘরটি দখল করতে চাইলেন। যোগানন্দের তাতে আপত্তি নেই। ক'রাজের জন্ম যোগানন্দ দ্বিতলের উত্তর-পশ্চিমের ঘরখানি দখল করলেন, ঠিক সিঁড়ির পাশেই। জগদানন্দ, নীলিমা অথবা শ্রামলের শয়নকক্ষের কোনও পরিবর্তন হল না।

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে সবাই শুতে যাবে তখন টেলিফোনটা বেজে উঠল। নীলিমা ফোন ধরল। দমদম থেকে জয়দীপ ফোন করছে। সে সঙ্কেতে জানালো পাখি আবার খাঁচায় ফিরে এসেছে। তার ঘরের আলো এইমাত্র নিবল। পব মুহূর্তেই সে ফোন রেখে দিল।

শুতে যাবার আগে কৌশিক সারা বাড়িটা একবার টহল দিয়ে এল। যে ঘর ঘরে চলে গেছেন। একতলায় মহেন্দ্র এবং বিশ্বম্ভর শুয়ে পড়ছেন। ঘরের বাতি নেবানো। শ্রামল একটা টেবিলে ল্যাম্প জেলে বই পড়ছে। দোতলায় জগদানন্দের ঘরে আলো জ্বলছে। কৌশিক এসে দরজায় টোকা দিল। জগদানন্দ ভিতর থেকে “ল্যাচ-কী” খুলে দিলেন; কৌশিককে দেখে বললেন, আবার কী হল?

—কিছু না। শুতে যাবার আগে দেখে যাচ্ছি। আপনি কি রাত্রে ভিতর থেকে ঘর বন্ধ করে রাখেন?

—এতদিন রাখতাম না। ইদানিং রাখছি!

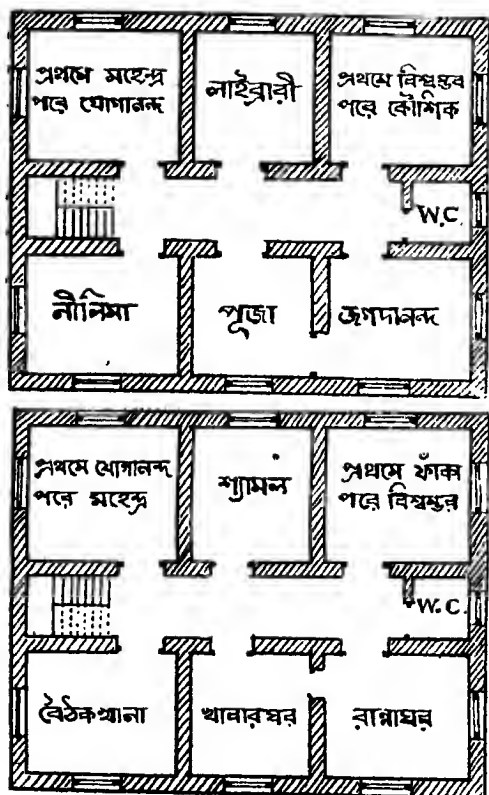
কৌশিক লক্ষ্য করে দেখে জগদানন্দের খাটের পাশে রাখা একটি সাইড-টেবিল। তার উপর রাখা আছে ঢাকা দেওয়া এক গ্লাস জল, একটি টর্চ, সিগারেট-দেশলাই, ছাইদান। খান কয়েক বই, একটি টেবিল ল্যাম্প এবং একটি স্ফদর্শন খাপে ঢাকা হাতীর দাঁতের মূঠগুলা ছোরা। কৌশিক বলল, আজ আর বইটাই পড়বেন না, কাল ঘুম হয় নি, শুয়ে পড়ুন।

শুভরাত্রি জানিয়ে সে বিদায় নিল। 'ক্রুক' করে-ল্যাচ-কী বন্ধ হবার শব্দ হল।

বাগান্দার দেখা হয়ে গেল নীলিমার সঙ্গে। মেয়েটি জানতে চায়, বেড-টি খাবার অভ্যাস আছে না কি?

—পেলে খুশি হই। না পেলেও চলে যায়।

—কটা নাগাদ পেলে খুশি হন?



উপরে একতলা / নিচে দো-তলা

—কাউকে বিরক্ত না করে যদি হয়, তো ধরুন সকাল ছ'টায়।

—কেউ বিরক্ত হবে না, কারণ আমি ঐ সময় এক কাপ নিজেই বানিয়ে খাই।

ভোররাতে কৌশিকের ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন দরজায় টোকা দিচ্ছে। স্বতঃই নজর পড়ল ঘড়িটার দিকে। ভোর পোনে পাঁচটা। সবে সকাল হচ্ছে। এত সকালে তো সে বেড-টি খেতে চায়নি। কৌশিক উঠে পড়ে। স্নিগারটা পান্নে গলায়। দরজাটা খুলে দিতেই দেখে আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে নীলিমা।

—কি ব্যাপার ? এত ভোরে বেড-টি ?

—আপনি একবার বাইরে আসুন তো—

ওর কণ্ঠস্বরে উৎসাহের আভাস। কৌশিক তৎক্ষণাত্ বার হয়ে আসে। সামনে জগদানন্দের ঘরের দরজাটা খোলা। নীলিমা সে ঘরে প্রবেশ করে। পিছন পিছন কৌশিক। হাত বাড়িয়ে নীলিমা সুইচটা জ্বলে দেয়। খাটের উপর জগদানন্দ নেই। বিছানাটার চাদর কৌচকানো। নীলিমা একটা আঙুল নির্দেশ করে কি-যেন দেখায়। বলে, এর মানে কী ?

ব্যাপারটা বুঝতে পারে না কৌশিক। প্রশ্ন করে, আপনার দাছ কোথায় ?

—দাছ পূজার ঘরে—পূজা করছেন। কিন্তু এটা কী করে হল ?

এক পা এগিয়ে নীলিমা দর্শনীয় বস্তুটার কাছে সরে আসে। এতক্ষণে নজর হয় কৌশিকের। টেবিলের উপর কাল রাত্রে যে কয়টি জিনিস দেখেছিল তার একটা নেই। চামড়ার খাপটা আছে, কিন্তু খাপ থেকে গজদন্তের মুঠটা বার হয়ে নেই অর্থাৎ ছোরাটা অন্তর্হিত !

ক্রুদ্ধিত করে কৌশিক একটি মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে। দ্রুত ঘরের চারদিক দেখে নেয়। তারপর বলে, দাছকে জিজ্ঞাসা করেছেন ?

—না। উনি খুব ভোরে ওঠেন। রোজ এই সময় পূজায় বসেন। আজও তাই বসেছেন। কিন্তু ওর ঘরে ঢুকে হঠাৎ এটা নজরে পড়ল আমার। তাই আপনাকে ডেকে তুলেছি।

—হয় তো ঘর খালি রেখে পূজা ঘরে যাবার সময় উনি ওটা তুলে রেখে গেছেন।

—সেক্ষেত্রে খাপ সমেত ওটা তুলে রাখাই স্বাভাবিক হত না কি ?

বক্তৃাপূর্ণ কথা। কৌশিক বললে, চলুন, প্রথমেই ওঁকে জিজ্ঞাসা করি।

—পূজার সময় কেউ ওঁকে ডাকলে উনি বিরক্ত হন।

কৌশিক সে কথায় কর্ণপাত করে না। পূজা ঘরে গিয়ে হাজির হল ওরা। বুদ্ধ বিরক্ত হলেন যেটা তার চেয়ে নিশ্চিত হলেন বেশি। বললেন, তাই নাকি ? খাপটা আছে অথচ ছোরাটা নেই ? কই চলতো দেপি।

এ ঘরে আবার ফিরে এলেন ওঁরা। বুদ্ধ বললেন, তাজ্জব কাণ্ড। আমি তো সকালে ওটাতে হাত দিই নি। সকালে ওদিকে নজরই পড়ে নি আমার।

কৌশিক বললে, তা কেমন করে হয় ? রাত্রে আপনি যখন ঘরটা বন্ধ করেন তখন আমি স্বচক্ষে দেখেছি—হ্যাঁ স্পষ্ট মনে আছে আমার—হাতের দাঁতের মুঠওয়ালো ছোরাটা ওখানেই ছিল। রাত্রে ঘর তালাবদ্ধ ছিল ভিতর থেকে ! আপনি কখন ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন ?



—বাড়ি দেখিনি। আধঘণ্টা খানেক আগে।

নীলিমা বললে, দাঁড় বখন বার হয়েছেন তখন আমি জেগে। দোতলায় তারপর আর কেউ আসে নি। এলে আমার নজরে পড়ত।

চকিতে কৌশিকের মনে হল—জগদানন্দ খুন হতে পারেন এমন একটা আশঙ্কা গতকাল করেছিলেন বাবু-সাহেব; কিন্তু উল্টোটাও তো হতে পারে? কাল রাত্রে জগদানন্দের বদলে যদি মহেন্দ্রবাবু খুন হয়ে থাকেন? কৌশিক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখল জগদানন্দের দিকে। তাঁর মুখ ভাবলেশহীন। কী ভাবছেন তিনি, বোঝার উপায় নেই। স্থির হয়ে বসে আছেন ইজিচেয়ারে। কৌশিক নীলিমাকে বললে, বাড়ির আর সবাই ঘুমাচ্ছে। কিন্তু আমি এখনই জানতে চাই সবাই স্বস্থ আছে কিনা। আপনাদের কাছে ঐ ঘরগুলোর ডুপ্লিকেট চাবি আছে?

নীলিমাও বোধকরি আন্দাজ করেছে কৌশিক কী ইঙ্গিত করছে। তার মুখটা সাদা হয়ে যায়। অক্ষুটে বলে, আপনি কী আশঙ্কা করছেন—

তাকে কথাটা শেষ করতে দেয় না কৌশিক। বলে, সে সব আলোচনা পরে। প্রত্যেকেই ঘর ভিতর থেকে বন্ধ করে ঘুমাচ্ছেন। আমি জানতে চাই তাঁদের কাল রাত্রে কোনও বিপদ হয়েছে কিনা। আপনাদের কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে? তাহলে কাউকে কিছু না জানিয়ে নিঃশব্দে ঘরগুলো দেখে আসতে পারি।

মেয়েটি অনেকটা সামলেছে। তবু সে কাতর ভাবে একবার তার দাঁড়র দিকে তাকায়। তারপর বলে, আমার কাছে ডুপ্লিকেট চাবির থোকা আছে। আহুন এঘরে।

মেয়েটির পিছন পিছন কৌশিক চলে এল তার শয়নকক্ষে। নীলিমা একটা টানা-ড্রয়ার টেনে খুলল। তারপর বিহ্বল হয়ে তাকালো কৌশিকের দিকে।

—কী হল?—কৌশিক ভ্রূকুটি করে প্রশ্ন করে।

নীলিমার মুখটা ছাইয়ের মত সাদা। তার চোঁট দুটো নড়ে উঠল। কথা বার হল না।

—কী হয়েছে বলুন। অমন আমতা করছেন কেন?

—চাবির থোকাটা এখানেই থাকে। সেটা নেই! চুরি গেছে।

কৌশিক দাঁতে দাঁতে চেপে বলে, অর্থাৎ যে সেটা চুরি করেছে তার কাছে কালরাত্রে সব কটা ঘরই ছিল অবারিত দ্বার—খুনীর স্বর্গ!

নীলিমা জবাব দিল না। বসে পড়ল তার খাটে।

—এবং বাড়িহুদ্র লোককে না জাগিয়ে আমরা কিছু জানতে পারব না।

এবারও নীলিমা জবাব দিল না। হু-হাতে মুখটা ঢেকে সে নির্বাক বসে থাকে।

জগদানন্দ কখন নিঃশব্দে উঠে এসেছেন তা ওরা খেয়াল করে নি। এবার দরজার কাছ থেকে তিনি বলে ওঠেন, না। আমার কাছে একটা মাস্টার কী আছে, তা দিয়ে সবকটা ঘরের দরজা খোলা যায়। তুমি সবগুলো ঘর একবার দেখে এস।

হাত বাড়িয়ে একটি চাবি তিনি কৌশিককে দেন। এগিয়ে এসে নীরবে নাতনির মাথায় একটি হাত রাখেন। সে স্নেহস্পর্শে মনোবল ফিরে পায় মেয়েটি। বলে, চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাব। দাছ তুমি এখানেই অপেক্ষা কর।

তখনও ভাল করে আলো ফোটে নি। কৌশিক আর নীলিমা বার হল তদন্ত করতে। কৌশিক বললে, প্রথমেই মহেন্দ্রবাবুর ঘর। তিনিই—

হঠাৎ তার হাতটা চেপে ধরে নীলিমা। বলে, কী বলছেন! শর মানে দাছ? ঐ আশি বছরের বৃদ্ধ—

কৌশিক দাঁড়িয়ে পড়ে। চাপা আক্রোশে বলে, কেন? শুধু আশি বছরের বৃদ্ধই বা কেন? তাঁর জ্ঞানান নাতনিটি কি ছিলেন না এ বাড়িতে?

নীলিমার মুঠিটা আলগা হয়ে যায়। আর কোনও কথা সে বলে না।

ওরা নেমে আসে একতলায়।

সিঁড়ি দিয়ে নেমেই মহেন্দ্রের ঘরের দরজা। নিঃশব্দে কৌশিক মাস্টার কী-টা লাগিয়ে দেয় চাবির ফুটোয়। ক্লিক করে শব্দ হল। সন্তুর্পণে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল কৌশিক। দ্বারপথে দাঁড়িয়ে রইল নীলিমা—একটা হাত মুখে চাপা দিয়ে—যেন একটা অনিবার্ণ আত্নদাকে এখনই রুখতে হবে তাকে।

তড়াক করে খাটের উপর উঠে বসল মহেন্দ্র। বলল, এর মানে কী?

ধড়ে প্রাণ এল কৌশিকের। বলল, বেড-টি খাবেন? চা হচ্ছে!

মহেন্দ্র প্রথমেই তোশকের নিচে হাত চালিয়ে কি যেন দেখে নিল। তারপর বললে, ইয়ার্কি করার জায়গা পান নি? চা খাবার জন্তে ডাকতে চান তো দরজায় নক করেন নি কেন? দরজা খুললেন কি করে?

কৌশিক বললে, খামকা চেষ্টামেচি করবেন না। চা হয়ে গেছে, মুখে চোখে জল দিয়ে নিন।

বলেই দরজাটা বন্ধ করে দিল। বাইরে বেরিয়ে এসে বললে, কুইক, বিশ্বস্তর উকিল কোন্ ঘরে গিয়েছিল?

নীলিমা আবার কৌশিকের হাতটা ধরে। অক্ষুটে বলে, বিশ্বস্তরবাবু নয়, চলুন, বরং ছোটকাকুর ঘরটা দেখে আসি।

—ছোটকাকু ?

—যোগানন্দ। উইল অলুঘারী যার পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়ার কথা।

খণ্ড-মুহূর্তের জন্ত কৌশিক দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর বলে, ঠিক কথা ! নেস্ট প্রবাবিলিটি বোধহয়—যোগানন্দ !

সিঁড়ি বেয়ে ওরা উপরে উঠে আসে। ততক্ষণে ওদিককার ঘর খুলে বিশ্বস্তর উকিলও বার হয়ে পড়েছেন করিডোরে। সম্ভবতঃ মহেন্দ্রের উচ্চ কণ্ঠস্বর কানে গিয়েছে তাঁর। মহেন্দ্রও দরজা খুলে উকি দিল।

কৌশিক আর নীলিমা উঠে এল দোতলায়। পিছন পিছন বিশ্বস্তর আর মহেন্দ্র। তারা দুজনে নিম্নস্বরে কি যেন বলাবলি করছে। কৌশিক যোগানন্দের ঘরের দরজায় করাঘাত করল। কেউ সাড়া দিল না। সেই অবসরে বিশ্বস্তর আর মহেন্দ্র এসে উপস্থিত হয়েছেন ঐ রুদ্ধ দ্বারের সামনে। জগদানন্দ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ঘরের দ্বারপথে।

কৌশিক ‘মাস্টার কী’ দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল। চারজনেই হড়মুড়িয়ে প্রবেশ করল ঘরে। পরমুহূর্তেই নীলিমার আর্ত চীৎকারে চকিত হয়ে উঠল ডবা মুহূর্তটি। কৌশিক ধমক দিয়ে ওঠে, চুপ করুন। কেউ কেন কিছু স্পর্শ করবেন না। বাইরে, বাইরে আসুন সবাই—

বিশ্বস্তর দুশুটা পিছন থেকে দেখতে পায় নি। বললে, কেন মশাই ? আপনি হুকুম চালাবার কে ?

কৌশিক বললে, আপনি একা এ ঘরে থাকতে চান থাকুন ; কিন্তু পুলিশ এসে পড়ার আগে আমি ঘরটা তালাবদ্ধ রাখতে চাই। বাইরে আসুন মিস্ সেন।

নীলিমা আঁচলে মুখ ঢেকে টলতে টলতে বাইরে বেরিয়ে এল। সেখানে অপেক্ষা করছিলেন জগদানন্দ। তাঁর পাঁজরসর্বস্ব বুকে তিনি টেনে নিলেন নাতনিকে। কান্নায় ভেঙে পড়ল মেয়েটি।

মহেন্দ্রবাবু কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে খাচ্ছিল ঘরের ভিতর। তাকে পিছন থেকে টেনে ধরল বিশ্বস্তর। বললে, থাবদাঁর ! কোন্ কিছু ছোঁবেন না। বাইরে বেরিয়ে আসুন। ওরা আমাদের জড়াতে চাইছে। এখনই পুলিশে খবর দেওয়া উচিত।

হড়মুড়িয়ে বেরিয়ে এল মহেন্দ্র আর বিশ্বস্তর।

জগদানন্দ নাতনিকে বুকে জড়িয়ে দ্বার পথে দাঁড়িয়েছিলেন। এতক্ষণে তাঁর নজর পড়ল ঘরের ভিতর। খাটের উপর উবুড হয়ে শুয়ে আছে তাঁর

নির্বিরোধী ভাইপো—যোগানন্দ। তার পিঠের উপর উচু হয়ে জেগে আছে একটা সোঁখিন ছোয়ার মুঠ—চমৎকার হাতীর দাঁতের কাজ করা। রক্তে ভেসে গেছে খাট আর মেঝে।

পাশের ঘর থেকে তখন শোনা যাচ্ছে কৌশিকের কণ্ঠস্বর ইস্‌ জাট ডবল টু ডবল ওয়ান ডবল-থি ? লালবাজার ?...পুট্‌ মি টু হোমি-সাইড, য়ুনিট, প্রীজ ? ই্যা, খুন হয়েছে !

ছয়

মাত্র সাতদিনে প্রাথমিক তদন্ত শেষ করে মামলাটা ট্রাইং ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গেল এবং আসামীকে তিনি দায়রায় সোপদ করলেন। মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে কেস উঠল দায়রা জজের আদালতে। এতটা তাড়াতাড়ি সচরাচর হয় না। এ ক্ষেত্রে সেটা করতে হয়েছে রাজনৈতিক চাপে। মামলায় একজন সাক্ষী আছেন যিনি বিদেশের নাগরিক। তিনি সমন পেয়েছেন। বার্মিজ কনসুলেট ভারত সরকারকে জানিয়েছেন যে, হয় অবিলম্বে জবানবন্দী নিয়ে তাঁদের নাগরিককে দেশে ফিরে যেতে দিতে হবে অথবা তাঁর ক'লকাতায় অবস্থানের ব্যয়ভার ও খেসারত ভারত সরকারকে বহন করতে হবে। কলে এই তাড়াহুড়া।

তদন্তকারী অফিসার মোটা মুটি নিঃসন্দেহ হয়েছেন অপরাধীর অপরাধ সহজে। পুলিশের বক্তব্য অগ্রযায়ী কেসটা এই—

আসামী জগদানন্দের ভাইপো যোগানন্দ কোন সূত্রে একটি পারিবারিক গোপন রহস্য জেনে ফেলেন। সেই রহস্যটা ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়ে তিনি দীর্ঘদিন ধরে জগদানন্দকে শোষণ করছেন। জগদানন্দ ঐ উপার্জনহীন ভাইপোটিকে এতদিন খোরপোষ দিয়ে যাচ্ছিলেন বিনা প্রতিবাদে। সম্প্রতি যোগানন্দ চাপ সৃষ্টি করায় বৃদ্ধ একটি উইল করে তাঁকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে বারবার লোভ দেখান। উইলটি লেখা হয় এবং সেটা পাওয়াও গেছে। রেজিস্টার্ড উইল নয়। তারপর ঘটনার পূর্বদিন রবিবার, যোগানন্দ এবং তাঁর কাকা জগদানন্দ দীর্ঘসময় কল্কটার কক্ষে আলোচনা করেন। এই সময় নাকি জগদানন্দ বলে উঠেছিলেন, এরা ভেবেছে কি ? নব কটাকে খুন করব আমি ! তারপর ঘটনার দিন সকালে জগদানন্দ তাঁর আলমারি খুলে একটি ছোরা বার করেন। ঘটনার রাতে যোগানন্দ ভিতর থেকে তালি বন্ধ করে ঘরে শুয়ে-

ছিলেন—কিন্তু জগদানন্দের কাছে একটি ‘মাস্টার কৌ’ ছিল, যা দিয়ে সব ঘর বাইরে থেকে খোলা যায়।

পুলিসের মতে, মৃত্যুর সময় বারোটা থেকে সোয়া বারোটা। সময়টা নির্ধারণ করা হচ্ছে শ্রামলের জবানবন্দী থেকে। শ্রামল রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত জেগে বই পড়েছে। তারপর সে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ে; কিন্তু তার ঘুম আসে নি। ঠিক বারোটার সময় সে বাইরের বারান্দায় কার পদশব্দ শুনে পায়। এক তলার কোন বাসিন্দা বাথরুমে যাচ্ছে মনে করে সে আর খেয়াল করে নি। পরে অর্থাৎ মিনিট দশেক পরে তার মনে হল পদশব্দটা মিঁড়িতে হচ্ছে। এতে সে কৌতূহলী হয়ে পড়ে। কারণ, দোতলায় পৃথক বাথরুম আছে। সে প্রয়োজনে মধ্য রাত্রে কাউকে উপর থেকে নিচে অথবা নিচে থেকে উপরে উঠতে হয় না। তাই শ্রামল উঠে পড়ে। ঘরের আলো জ্বালে না; জানলা দিয়ে দেখতে চায়। চাদরে আপদমস্তক ঢাকা দেওয়া একজনকে সে মিঁড়ির মুখে দেখতে পায়। লোকটা তখন উপর থেকে নেমে আসছে। লোকটা মাঝারি উচ্চতার, তার মুখটা সে দেখে নি। শ্রামল সাহস করে দরজা খোলে নি। আবার শুয়ে পড়ার আগে ঘড়িটা দেখেছিল। রাত তখন সওয়া বারোটা।

অটোপ্সি-সার্জনের মতেও মৃত্যুর সময় রাত সাড়ে এগারোটা থেকে সাড়ে বারোটা।

জগদানন্দের বিরুদ্ধে হত্যার মাংসলা দায়ের করা হয়েছে। অবশ্য ঠর সামাজিক মর্যাদা এবং বয়সের কথা বিবেচনা করে তাঁকে জামিন দেওয়া হয়েছে।

বলা বাহুল্য আসামীপক্ষের ডিফেন্স কাউন্সেল পি. কে. বাসু, বার-এ্যাট-ল।

বাসু-সাহেব তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে অহুসঙ্কান চালিয়েছেন যথারীতি। তাতে আবিস্কৃত হয়েছে একটি নতুন ক্ল, যার সন্ধান তাঁকে দিয়েছে জয়দীপ। বাসু-সাহেব ঐ স্মৃতি যাচাই করে দেখে বুঝেছেন খবরটা মিথ্যা নয়।

জয়দীপ ঘটনার দিন সকাল সাতটা নাগাদ দমদমের হোটেল থেকে ফোন করেছিল। তখন এ বাড়িতে ইন্সপেক্টার তদন্ত করছেন। টেলিফোন ধরেছিল কৌশিক। জয়দীপ বলেছিল, একটা জরুরী খবর আছে, শুনুন—

কৌশিক বলেছিল, যত জরুরী খবরই হোক আপনি এখনই চলে আসুন। এখানে একটা বিশী ব্যাপার হয়ে গেছে, কাল রাত্রে।

—কাল রাত্রে! কী ব্যাপার।

—আপনি চলে আসুন—লাইন কেটে দিয়েছিল কৌশিক।

জয়দীপ বেলা নটা নাগাদ এসে পৌঁছায়। তখন পুলিশ চলে গেছে, কিন্তু বাসু-সাহেব এসেছেন। জয়দীপ বলে, আগের রাত্রে দমদম এলাকার লোড-

শেডিং হয়েছিল। হোটেলে এয়ার কন্ডিশনার বা ফ্যান চলে নি। রাত ঠিক বারোটা চল্লিশ মিনিটে পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে ওঠায় জয়দীপের ঘুম ভেঙে যায়। বার তিনেক টেলিফোনটা বাজার পরেই শোনা যায় যু সিয়াঙের ভারি কঠোর।

—হ্যালো !

ইতিমধ্যে জয়দীপ টর্চটা জেলেছে। ডায়েরিটা খুলে তৈরী হয়ে নিয়েছে। শুক রাত্রি, গরমের জ্বালা জ্বালা খোলা। যু সিয়াঙের প্রত্যেকটি কথা সে ন্যষ্ট শুনতে পেয়েছে ঠিক পাশের ঘর থেকে এবং তৎক্ষণাৎ লিখে ফেলেছে। আত্মোপাস্ত কথা সে বলেছে ইংরাজিতে। তার আক্ষরিক অম্ববাদ নিম্নোক্তরূপ :

“হ্যালো !...ই্যা কথা বলছি...কে ?...আমি চিনি না আপনাকে, কী চান ? ...এমন মাঝ রাত্রে বিরক্ত করছেন কেন ?...ই্যা চিনি, মহেন্দ্রবাবুকে চিনি। আপনি তাঁর কে ?...কী ? জোরে বলুন !...ও বুকেছি, সলিসিটার ! এলুম। আমি আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না। পথের কাঁটা দূর হয়েছে মানে কি ? . টেলিফোনে যদি বলা না যায় তবে মাঝ রাত্রে বিরক্ত করছেন কেন ? . আচ্ছা বেশ, আমি সকালে অপেক্ষা করব। . সকাল বারোটা পর্যন্ত। শুভরাত্রি।”

বাসু তৎক্ষণাৎ উঠে পড়েছিলেন। এখানকার সব কাজ ফেলে রেখে সোজা এসে উপস্থিত হয়েছিলেন দমদমের হোটেলে। ওর কার্ড দেখে যু সিয়াঙ বললে, কাল মাঝ রাত্রে আপনিই ফোন করেছিলেন ?

বাসু ই্যা-না এড়িয়ে বললেন, মাঝ রাত্রে ঘুম থেকে উঠে টেলিফোন ধরতে চলে সকলেরই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

যু সিয়াঙ বলেন, থাক, কি বলতে চান বলুন ? মহেন্দ্রবাবুকে সঙ্গে করে আনলেন না কেন ?

বাসু বললেন, মহেন্দ্রবাবুর আসা এখন সম্ভবপর নয়—কিন্তু কালকের সেই কথাটা মনে আছে নিশ্চয়। আপনাদের দুজনেরই পথের কাঁটা দূর হয়েছে।

—পথের কাঁটা ! কী বলছেন আপনি। কে সে ?

—যোগানন্দ সেন। যাকে জগদানন্দ তাঁর উইলে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন। কাল রাত্রে তিনি খুন হয়েছেন !

‘খুন’ কথাটা শুনেই উঠে দাঁড়াল যু সিয়াঙ। বললে, খুন হয়েছেন ! বলেন দী ! কে খুন করেছে ?

বাসু হেসে বলেন, সেটা আর আমার মুখ দিয়ে নাই বা বলালেন।

যু সিয়াঙ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল বাসু-সাহেবের দিকে। তারপর বললে, লুক হিয়ার স্তার! ব্যাপারটা একটা মার্ডার কেস। আপনাকে আমি চিনি না। আপনি মহেন্দ্রবাবুর সলিসিটর কি না তাও আমি জানি না। আপনি কি প্রমাণ করতে পারেন যে, আপনি সত্যিই—

বাধা দিয়ে বাসু বলেন, আমার ভিজিটিং কার্ড আপনি দেখেছেন, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সটাও পরখ করে দেখতে পারেন।—পকেট থেকে বের করেন সেটা।

যু সিয়াঙ বলে, তাতে কী প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয় যে, আপনি ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু, বার-এ্যাট-ল; কিন্তু আপনি যে মহেন্দ্রবাবুর শত্রুপক্ষের ব্যারিস্টার নন তা আমি বুঝব কি করে?

বাসু-সাহেব বাড়িয়ে ধরেন একখানি কাগজ। একটু আগে জয়দীপ বা লিখে দিয়েছে। বলেন, কাল রাত্রি বারোটা চল্লিশ মিনিটে আপনি টেলিফোনে এই কটা কথাই বলেন নি কি? মিলিয়ে দেখে নিন।

যু সিয়াঙ অত্যন্ত সাবধানী। কাগজটা পড়ে বললে, হ্যাঁ বলেছি। কিন্তু তাতেও প্রমাণ হয় না যে, আপনি মহেন্দ্রবাবুর উকিল। এটুকু প্রমাণ হয় যে, গতকাল রাতে আপনিই আমাকে ফোন করেছিলেন। আপনি প্রমাণ দিন আপনি মহেন্দ্রবাবুর সলিসিটর।

বাসু-সাহেব নীরবে উঠে দাঁড়ান। বলেন, আমি একবারও বলিনি যে, আমি মহেন্দ্রবাবুর সলিসিটর। আচ্ছা নমস্কার!

—তার মানে?—হতচকিত যু সিয়াঙ অগতঃ হয়ে যায়।

কোর্টে মামলা ওঠার আগের দিন বাসু-সাহেব জনাস্থিকে ডেকে পাঠালেন নীলিমা আর জয়দীপকে। বললেন, তোমরা দুজন ব'স। কথা আছে তোমাদের সঙ্গে।

জয়দীপ আর নীলিমা বসল পাশাপাশি।

—তোমরা জান যে, পুলিশের মতে যোগানন্দ একটা গোপন পারিবারিক রহস্য অবলম্বন করে ব্র্যাকমেল করছিলেন জগদানন্দকে—

বাধা দিয়ে মেয়েটি বলে ওঠে, কিন্তু সেটা তো একেবারে মিথ্যা।

—যোগানন্দবাবুর ব্র্যাকমেল করাটা মিথ্যা; কিন্তু পারিবারিক রহস্যটার অস্তিত্ব মিথ্যা নয়। বস্তুত: সেই রহস্য নিয়ে মহেন্দ্র এবং যু সিয়াঙ গুঁবে ব্র্যাকমেলিং করছিল। কেন, তোমরা জান না?

নীলিমা বললে, জানি। কিন্তু রহস্যটা কী, তা জানি না। আপনি জেনেছেন

—জেনেছি। সে কথা কোটে অনিবার্ণ ভাবে উঠবে। তাই আগেভাগেই  
তা তোমাদের জানিয়ে রাখতে চাইছি।

—বলুন ?—নীলিমা উৎকর্ণ।

বাস্থ একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, বলছি; কিন্তু তার আগে মনটা প্রস্তুত  
কর নীলিমা। খবরটা তোমার পক্ষে শক্তিং! একটা প্রচণ্ড আঘাত তুমি  
পাবে—উপায় নেই—এ আঘাত সহ্য করার মত মনের জোর তোমার আছে—  
মামি বিশ্বাস করি।

মেয়েটি মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, বলুন আপনি। আমি প্রস্তুত! দাড়া কাউকে  
করেছিলেন?

—না, খুন নয়। তাছাড়া অপরাধটা তিনি করেন নি।

—তিনি করেন নি? তবে তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করছে কি করে ওরা?

—ঐ যে বললাম। পারিবারিক কলঙ্ক! ধর তোমার বাবার নামে, অথবা  
মায়ের নামে কোন কথা। যেটা গোপন রাখতে চান জগদানন্দ।

জু-দুটি কুঁসকে ওঠে নীলিমার। বলে, প্রীজ, যা বলবার এক নিঃশ্বাসে বলে  
কলুন আপনি!

—তোমার বাবার সঙ্গে তোমার মায়ের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয় তার আগেই  
তুমি এসে আশ্রয় নিয়েছিলে তোমার মায়ের দেহে।

মেয়েটি একেবারে পাথর হয়ে যায়।

জয়দীপ চীৎকার করে ওঠে, আমি বিশ্বাস করি না! বাজে কথা।

নীলিমার চোখ দুটি জলে ভরে ওঠে। অশ্রুটস্বরে বলে, তবে কে আমার  
বাবা?

—আমি জানি না নীলিমা। আমরা কেউই জানি না! তোমার দাড়াও নয়!

হঠাৎ উঠে পড়ে মেয়েটি। দ্রুত পায়ে ঢুকে যায় বাথরুমে। মশক  
জাটা বন্ধ হয়ে যায়। জয়দীপ শুক্ক বিন্ময়ে উঠে দাঁড়ায়। বাস্থ বলেন, ইয়াং  
দাম! এক্ষণ্ত যদি নীলিমার জীবন থেকে সরে দাঁড়াতে চাও তাহলে এই  
তামার স্বেচছাং। নিঃশব্দে চলে যাও। এতবড় আঘাতটা যখন ময়েছে,  
খন তোমার দেওয়া আঘাতটাও ও সহিতে পারবে।

জয়দীপ বসে পড়ল চেয়ারে। দৃঢ়স্বরে বললে, মিষ্টার বাস্থ, আপনাকে  
নিবার সময় হয়েছে—আমরা বিবাহিত! নীলিমা আমার স্ত্রী।

এবার চমকে ওঠার পালা বাস্থ-সাহেবের। বলেন, মানে! কবে থেকে?

—দাঁহা যেদিন উইল করলেন তার পর দিন। ম্যারেজ রেজিস্টার আমার  
হিচিতি। বিনা নোটিসে স্বাতরাতি বিয়ে দিতে তিনি আপত্তি করেন নি!



বাসু-সাহেব তাঁর হাতটা বাড়িয়ে জয়দীপের বলিষ্ঠ হাতখানা টেনে নেন বলেন, মাই কনগ্রাচুলেসস !

## সাত

—আদালত যদি অহুমতি করেন তাহলে বাদীপক্ষ একটি সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক ভাষণ দিয়ে এই মামলার উদ্বোধন করতে চান। বাদীপক্ষ আশা রাখেন যে, তাঁরা প্রমাণ করবেন এই মামলার আসামী বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী জগদানন্দ সেন একটি পারিবারিক রহস্য উদ্ঘাটনের হাত থেকে মুক্তি পাবার আশায় সুপরিকল্পিতভাবে তাঁর ভাইপো ব্র্যাকমেলার যোগানন্দকে সহস্র হত্যা করেন আমরা আশা রাখি, প্রমাণ করব যে, এই হত্যা সংঘটিত হয়েছিল রাত বারোটা থেকে সপ্তম বারোটার মধ্যে। যখন নিহত যোগানন্দ জগদানন্দের আশ্রয়ে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছিলেন। আসামীর বয়স এবং মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে এক্ষেত্রে লঘু দণ্ড দান করার প্রস্তাব ওঠে না, যেহেতু হঠাৎ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে এ হত্যাকাণ্ড করা হয় নি—বরং মৃত যোগানন্দকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে লোভ দেখিয়ে নিশ্চিন্ত করে, তাকে ঘটনার রাতে একতলার বদলে দ্বিতলে নিয়ে এসে যেভাবে আসামী সুপরিকল্পিতভাবে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেন, তাতে তাঁকে চরমতম দণ্ড দিয়ে মাননীয় বিচারক এ আদালতের মর্যাদা রক্ষা করবেন বাদীপক্ষ এমনই আশা রাখেন।

সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক ভাষণ দিয়ে পাবলিক প্রসিকিউটর নিরঞ্জন মাইতি আসন গ্রহণ করলেন। আদালতে জনসমাগম বেশ হয়েছে। আসামীর কাঠগোড়ায় একটি চেয়ারে বসে আছেন বৃদ্ধ জগদানন্দ। আসামীর বার্ষিক্য কথা বিবেচনা করে বিচারক এটুকু সৌজস্য দেখিয়েছেন। আসামীর মূর্তি ভাবলেশহীন। তিনি কী ভাবছেন বোঝা যাচ্ছে না।

বিচারক সদানন্দ ভাট্টা এবার প্রতিবাদীদের দিকে ফিরে বললেন, আপনারা কি কোন প্রারম্ভিক ভাষণ দিতে চান ?

সচরাচর বাসু-সাহেব প্রারম্ভিক ভাষণ দেওয়ার বিপক্ষে। আজ কিন্তু তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আদালত যখন অহুমতি করছেন তখন প্রতিবাদী তরফে একটি মাত্র কথাই আমরা বলব : আমরা আশা রাখি, প্রমাণ করব—হত্যার সঙ্গে আসামীর কোনও সম্পর্ক নেই। কে আসামীর স্নেহভাজন ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করেছে তা জানবার জন্য তিনি আমাদের চেয়েও উৎসুক আমরা আশা রাখি, প্রমাণ করব—মৃত যোগানন্দ ব্র্যাকমেলিং করেন নি কোথাও দিনই এবং তাঁর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোন প্রসঙ্গ ওঠে না আসামী

বরফে। থ্যাঙ্ক মি লর্ড! বাদীপক্ষ এবার তাঁদের সাক্ষীদের ডাকতে পারেন।

বাদীপক্ষের প্রথম সাক্ষী গটোল্ড-সার্জেন। তিনি মৃত্যুর কারণ ও সময় প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে যোগানন্দের মৃত্যু হয়েছে রাত পড়ে এগারোটার পরে এবং সাড়ে বারোটার আগে। জগদানন্দের নামাঙ্কিত হাওয়াটিকে তিনি সনাক্ত করলেন।

বাসু-সাহেব তাঁকে আদৌ ক্রশ-এগজামিন করলেন না।

দ্বিতীয় সাক্ষী ইনভেস্টিগেশান অফিসার ইন্সপেক্টর মণীশ বর্মণ। সে তার ক্ষেত্র ঘটনার দিন সকালে এসে যা খা দেখেছে তার বর্ণনা দিল। প্রতিটি ঘণ্টার প্রাথমিক জবানবন্দী যা লিখে নিয়েছে তা পড়ে শোনালো। মহেন্দ্র-বু, বিশ্বম্ভরবাবু, শ্রামল এবং নীলিমার প্রাথমিক এজাহার। কৌশিকের মত উল্লেখ করল না। তারপর দমদমে ভি. আই. পি হোটেলের বাসিন্দা যুগ্ম-এর জবানবন্দী যা নিয়েছে তাও পড়ে শোনালো। মাইতি এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন, আপনার কাছে মিঃ যু সিয়াঙ কি স্বীকার করেছিলেন যে, ঘটনার নসকাল দণ্ডটার সময় বর্তমান মামলায় বাদীপক্ষের কাউন্সেল মিঃ পি. কে. হ দেখা করেন?

বাসু-সাহেব উঠে দাঁড়ান : অবজেকশনে য়োর অনার! বর্তমান মামলায় এ প্রশ্ন সম্পর্ক-বিমুক্ত।

মাইতি একটি বাও করে বলেন, মি লর্ড, এ প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা আগের বর্তী প্রশ্নেই উদ্ঘাটিত হবে—আই এ্যাশিয়োর যু!

—অবজেকশান ওভারকলড!

মণীশ বর্মণ বলেন, ইয়া, স্বীকার করেছিলেন।

—মিস্টার যু সিয়াঙ কি বলেছিলেন যে, প্যারিস্টার মিস্টার পি. কে. বাসু পরিচয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—

আবার উঠে দাঁড়ান বাসু : অবজেকশন মিঃ লর্ড! বর্তমান সাক্ষীর পক্ষে যেক্ষের জগাব হেয়ার-সে। আসামীর অস্থপস্থিতিতে ব্যাবিস্টার পি. কে. র সঙ্গে মিস্টার যু সিয়াঙ-এর কী কথোপকথন হয় বর্তমান সাক্ষীর থেকে তার ওর্ড হ্যাও রিপোর্ট এ মামলায় গ্রাহ্য হওয়া উচিত নয়।

—অবজেকশান শাস্টেইনড!

মাইতি হেসে বলেন, ঠিক আছে। এ ক্ষেত্রে মামলার পারস্পর্য রক্ষাণে সাময়িকভাবে বর্তমান সাক্ষীকে অপসারণ করে মিস্টার যু সিয়াঙকে দ্বিতীয় ডাকতে চাই।

বাসু বলেন, আমাদের আপত্তি নেই। সে-ক্ষেত্রে বর্তমান সাক্ষীকে ক্রশ

করবার অধিকারও আমরা মজুত রাখলাম।

আদালতের অহুমতি পেয়ে মিস্টার যু সিয়াঙ সাক্ষীর মধ্যে উঠে দাঁড়ালেন মাইতি প্রমোত্তরের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করলেন—যু সিয়াঙ জগদানন্দের রেজুনস্ অফিসের ম্যানেজার হিসাবে 1920 থেকে 1940 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চাকা করেছেন। এখন তিনি রেজুনে থাকেন। দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে তিনি সম্প্রতি ভারতবর্ষে এসেছেন। 1940 খ্রীষ্টাব্দের আঠারই মে তারিখে তাঁ চাকরি শেষ হয়। ঐ দিন জগদানন্দের পুত্র তাঁর রেজুনস্ বাবতীয় সম্পর্ক প্রায় একাত্তর হাজার টাকায় বিক্রয় করে দেন। এই প্রসঙ্গে মাইতি জানে চান, সদানন্দ সেন তারপর কবে রেজুন ত্যাগ করেন ?

—20. 5. 40 তারিখে, মারুতি জাহাজ যোগে।

—ঐ সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও কি প্রত্যাবর্তন করেন ?

—হ্যাঁ।

—আপনি কি জানেন, সদানন্দ কোন্ তারিখে বিবাহিত হন ?

—হ্যাঁ জানি। বিবাহে আমার নিমন্ত্রণ ছিল। 13.5.40 তারিখে।

—সদানন্দ কত তারিখে রেজুনে পদার্পণ করেন ?

—10.4.40 তারিখে। আমি জাহাজ-ঘাটায় এসেছিলাম তাকে বিদায় করতে।

—এর আগে সাবালক হবার পর ঐ সদানন্দ সেন কি কখনও ব এসেছিলেন ?

বাসু-সাহেব আপত্তি তোলেন, অবজেকশান ! এ প্রশ্নের জবাব সাক্ষী দি পারেন না। প্রশ্নটি অবৈধ !

জুসাহেব কলিং দেবার আগেই মাইতি বলেন, ঠিক আছে, ঐ আছে। মিস্টার সিয়াঙ, এটা কি স্বাভাবিক যে, আপনার নিয়োগ কত একমাত্র পুত্র রেজুনে যাবেন আর আপনি জানতে পারবেন না ?

—না, স্বাভাবিক নয়। সদানন্দ ইতিপূর্বে রেজুনে এলে আমার তা জ্ঞান কথা।

—আপনার জ্ঞাতসারে সদানন্দ সেন যৌবনে পদার্পণের পরে ঐ 10.4 তারিখের আগে বর্মায় আসেন নি ?

—না, আমার জ্ঞাতসারে নয়।

—আপনি তাঁর স্ত্রীকে কতদিন ধরে চিনতেন ?

—তাঁর বালিকা বয়স থেকে।

—সে-কি বিবাহের পূর্বে ভারতবর্ষে এসেছিল ?

বাসু-সাহেব আসন ত্যাগ করার উপক্রম করতেই মাইতি বলেন, অল রাইট, অল রাইট! আই উইথড্র। আচ্ছা মিষ্টার যু সিয়াঙ, বলুন তো, সদানন্দের স্ত্রী যদি কুমারী বয়সে বর্মা ত্যাগ করে ভারতবর্ষে আসত তা কি আপনার অজানা থাকতে পারত?

—অসম্ভব। কারণ বালিকা বয়স থেকে ও আমাদের বাড়িতেই অল্প দূরত্বে থাকত।

—তার মানে, আপনার জ্ঞাতসারে সদানন্দ সেনের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর প্রথম সাক্ষাৎ 10.4.40-এর আগে কিছুতেই হতে পারে না?

—ই্যা তাই!

—আচ্ছা মিষ্টার সিয়াঙ, এবার বলুন তো—ঘটনার দিন, আই মীন যোগানন্দ সেনের হত্যার দিন, মঙ্গলবার সকাল প্রায় দশটার সময় এ মামলার প্রতিবাদী ব্যারিস্টার মিষ্টার পি. কে. বাসু কি আপনার সঙ্গে দেখা করেছিলেন?

—করেছিলেন।

—তিনি কি নিজেকে মহেন্দ্র বাবুর সলিসিটার হিসাবে পরিচয় দিয়েছিলেন?

সাক্ষী একটু ভেবে নিয়ে বলেন, না। কিন্তু তিনি এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন যাতে আমি মনে করি—তিনি মহেন্দ্রবাবুর সলিসিটার।

—কী ভাবে তিনি সেই পরিবেশ সৃষ্টি করেন?

—উনি তার পূর্ব বাজে রাত ঠিক বারোটা চল্লিশ মিনিটে একটি টেলিফোন করে আমাকে বলেন যে, আমাদের পথের কাঁটা দূর হয়েছে।

আদালতে একটা গুঞ্জন ওঠে বিচারক তার হাতুড়িটা পিটলেন। স্তব্ধতা ফিরে এল আদালতে।

—ঠিক কি কি কথাবার্তা হয়েছিল—মানে ঘটনা আপনার মনে আছে, বলে যান।

সাক্ষী টেলিফোনে কথোপকথনের একটি বিবৃতি দিলেন এবং বললেন কী ভাবে পরদিন ব্যারিস্টার-সাহেবের পরিচয় পত্র পাওয়া মাত্র তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, তিনিই মহেন্দ্রবাবুর সলিসিটার!

—তার মানে আপনি বলতে চান—ঐ দিন রাত বারোটা চল্লিশে প্রতিবাদী ব্যারিস্টার মিষ্টার পি. কে. বাসু জানতেন যে, জগদানন্দ বাবুর বাড়িতে একটা খুন হয়েছে?

বিচারক বাসু-সাহেবের দিকে তাকালেন। তিনি কিন্তু কোন আপত্তি

জানালেন না। সাক্ষী চিন্তা করে জবাবে বলল, তা আমি জানি না। তিনি 'পথের কাঁটা' বলতে কী মীন করেছিলেন, তাও আমি জানি না। তবে রাত বারোটা চল্লিশে ঐ রহস্যময় টেলিফোন-কলে আমি খুব বিস্মিত বোধ করি।

—আপনি কি বোধ করেন, তা আমি শুনতে চাইছি না। আমি জানতে চাইছি—টেলিফোনে ঐ মধ্যরাত্রে আপনাদের যে কথোপকথন হয় তার একটি অঙ্কলিপি কি তিনি আপনাকে পরদিন বেলা দশটায় দেখান?

—হ্যাঁ দেখান।

—যু মে ক্রশ-এগজামিন—আসন গ্রহণ করেন মাইতি।

বাসু-সাহেবের প্রথম প্রশ্ন, মিস্টার সিয়াঙ, আপনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন কি এ মামলায় সাক্ষী দেবার জন্ত?

সিয়াঙ একটু থতমত খেয়ে যায়। সামলে নিয়ে বলে, নিশ্চয় নয়। আমি ভারতবর্ষে এসেছি দেশ দেখতে—আমার পাশপোটেও তাই লেখা আছে।

—কলকাতায় পদার্পণের দিনেই আপনি আপনার প্রাক্তন নিয়োগ কর্তা জগদানন্দের সঙ্গে দেখা করেন. তাই নয়?

—হ্যাঁ তাই।

—আচ্ছা মিস্টার সিয়াঙ, আপনি যখন দেশ দেখতেই এসেছেন তখন কলকাতা শহরটা না দেখে সর্বপ্রথমেই আপনি কেন জগদানন্দ সেনের সঙ্গে দেখা করেন?

—তাকে আমার শ্রদ্ধা জানাতে। হাজার হোক, তিনি আমার মনিব ছিলেন।

—ঠিক কথা। আচ্ছা এবার বলুন তো—মহেন্দ্রবাবুকে আপনি প্রথম কোথায় দেখেন এবং কবে?

—রেঙ্গুনে দেখি। মাস তিনেক আগে।

—ঠিক কত তারিখে?

—তারিখ আমার মনে নেই।

—উনি যেদিন ফিরে আসেন সেদিন আপনি মহেন্দ্রবাবুকে সী অফ করতে বেঙ্গুন এরারপোটে এসেছিলেন, তাই নয়?

—হ্যাঁ।

—সেটা কত তারিখ?

—তা আমার ঠিক মনে নেই।

—এবার বলুন তো মিস্টার সিয়াঙ—তিন মাস আগে ঠিক কত তারিখে আপনার সঙ্গে মহেন্দ্রবাবুর সাক্ষাৎ হয়, ঠিক কোন্ তারিখে তিনি ফিরে

আসেন তা আপনার মনে নেই—অথচ পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার তারিখগুলো আপনার কেমন করে নিখুঁত ভাবে মনে আছে ?

মাইতি আপত্তি জানান। এ প্রশ্নের উত্তর সাক্ষী কেমন করে জানবেন ?

বিচারক মুহু হেসে বললেন, অবজেকশান সাসটেইণ্ড !

বাস্থও হেসে বললেন, প্রশ্নটা তাহলে অশ্রুভাবে পেশ করি। আপনি আগেই বলেছেন—এ মামলায় সাক্ষী দিতে হবে তা আপনি জানতেন না, দেশ দেখতে এসেছেন। সে ক্ষেত্রে আমার সহযোগীর প্রশ্নগুলির উত্তর আপনি কেমন করে দিলেন ? স্মৃতির উপর নির্ভর করে ?

সাক্ষী একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, না, আমার ডায়েরী দেখে তারিখগুলো ঝালিয়ে নিয়েছিলাম আজ সকালে।

—সে ছাট ! কিন্তু দেশ দেখতে আসার সময় ডায়েরিতে পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কতকগুলো ঘটনা আপনি কেন টুকে নিয়ে এলেন ?

সাক্ষীকে নিরুত্তর দেগে মাইতি লাফিয়ে ওঠেন, অবজেকশান য়োর অনার। হু কোশেন ইস ইররেলিভ্যান্ট, ইম্পার্ট্যান্ট অ্যাণ্ড অ্যাবসার্ড।

ভাড়ুড়ী বললেন, অবজেকশান ওভারকলড্। আনসার ছাট কোশেন।

কমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে সাক্ষী বললেন, আই ভোট নো !

—আই নো ! —গর্জন করে উঠলেন বাস্থ। আপনি এসেছিলেন জগদানন্দকে ব্ল্যাকমেল করতে। মহেন্দ্রবাবু আপনাকে ঐ সব প্রশ্ন করেছিলেন, তা থেকে আপনি বুঝতে পারেন এই খবরগুলি দিয়ে জগদানন্দকে ব্ল্যাকমেল করা যায়। তাই কলকাতা পৌঁছেই আপনি ছুটেছিলেন তাঁর বাড়ি। অ্যাডমিট ইট !

সাক্ষী কাঁপতে কাঁপতে শুধু বললে, নো, নো !

বাস্থ এবার আক্রমণের পদ্ধতি বদলে অস্ত্রদিক থেকে শুরু করেন, ঘটনাগ দিন, আই মীন যোগদানন্দকে মৃত অবস্থায় যেদিন সকালে দেখা যায়, সেদিন বেলা দশটার সময় ব্যারিস্টার পি. কে. বাস্থ যখন আপনার সঙ্গে দেখা করেন তখন আপনি তাঁকে প্রথমেই প্রশ্ন করছিলেন—মহেন্দ্রবাবুকে সঙ্গে করে আনলেন না কেন ! ইয়েস অর নো ?

—ইয়েস !

—তার মানে যোগানন্দ খুন হবার পরে মহেন্দ্রবাবুকে নিয়ে তাঁর সলিসিটাতরের পক্ষে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসা আপনার কাছে প্রত্যাশিত ঘটনা।

—না তা নয়, মানে—

—আপনি আপনার সাক্ষ্য এখনই বলেছেন যে, পূর্বরাত্রে টেলিফোনে

‘পথের কাঁটা’ কথাটা শুনে তার অর্থ আপনি বুঝতে পারেন নি, নয় ?

—হ্যাঁ তাই।

—এ ক্ষেত্রে পরদিন যখন ব্যারিস্টার বাহু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তখন আপনি কি তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন ‘পথের কাঁটা’ বলতে পূর্বরাজে তিনি কি মীন করেছিলেন ?

—না করি নি।

—করেন নি, কারণ ‘পথের কাঁটা’ ব্যাপারটা কি, তা আপনি জানতেন, তাই নয় ?

—না না, তা নয়। আমার খেয়াল হয় নি।

—জাটস অল, মি: লর্ড—আমন গ্রহণ করেন বাহু।

মাইতি উঠে দাঁড়ান। একটি বাণ করে বলেন, আমার সহযোগীর জেরা যখন শেষ হয়েছে তখন আমি আদালতকে একটি প্রার্থনা জানাব। বর্তমান নাকীর যে সাক্ষ্য এইমাত্র আদালতে লিপিবদ্ধ হল তার একটি অতুলিপি আমাকে দেওয়ার হুকুম হ’ক। এ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রতিবাদী ব্যারিস্টার রাত বারোটা চল্লিশ মিনিটেই জানতেন যোগানন্দ খুন হয়েছেন ; কিন্তু তিনি সে খবরটা পুলিশে দেন নি। এ নিয়ে আমি বার এ্যাসোসিয়েশানে যুক্ত করতে চাই :

বিচারক একটু চিন্তা করে প্রতিবাদীকে প্রশ্ন করেন, এ সম্বন্ধে আপনার কোনও বক্তব্য আছে ?

—নো, মি: লর্ড ! আদালত বাদীর এ প্রার্থনা গল্প করলে আমাদের কোনও আপত্তি নেই।

তবু কলিং দিলেন না জাস্টিস ভাহুড়ী। একটু ইতস্ততঃ করে বাহু-সাহেবকে পুনরায় বললেন, আই উইশ টু অস্ক যু এ পয়েন্টর্যাক কোশেন কাউন্সেল ! আপনি কি ঘটনার দিন রাত্রি বারোটা চল্লিশে জানতেন যে, একটি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটেছে ?

—নো, মি: লর্ড !

—আপনি কি ঐ সময় কোন ফোন করেছিলেন ?

—নো, মি: লর্ড। আমি ঐ সময় অঘোরে ঘুমাচ্ছিলাম !

মাইতি উঠে দাঁড়ান। কিছু একটা কথা বলতে যান। তারপর বলে পড়েন।

জাস্টিস ভাহুড়ী বলেন, মিস্টার পি. পি. আপনি অতুলিপি পাবেন। ব্লীজ প্রসীড।

পরবর্তী সাক্ষী যোগানন্দের জালিকাপুত্র জামল। সে তার সাক্ষ্য জ্ঞানালো, কী ভাবে রাত বারোটা থেকে সওয়া বারোটার মধ্যে সে একটা ছায়া-মূর্তি দেখেছিল।

মাইতি প্রশ্ন করেন, আপনার একথা কেন মনে হল না যে, কেউ হয়তো বাথরুমে যাচ্ছে ?

না। কারণ দোতলাতে এবং একতলাতে পৃথক বাথরুম আছে। সে প্রয়োজনে বাথরুমে যেতে কাউকে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে হয় না।

—আই নী। আচ্ছা জামলবাবু, এ কথা কি সত্য যে, আপনার মেসো-মশাই যোগানন্দবাবু আপনার সঙ্গে এক সময় নীলিমা দেবীর বিবাহের প্রস্তাব তুলেছিলেন ?

—হ্যাঁ, সত্য কথা।

—তারপর সে বিবাহ-প্রস্তাব কেন ভেঙে যায় ?

—আমি জানি না।

—আপনার আপত্তি ছিল ?

—না।

—নীলিমা দেবীর আপত্তি ছিল ?

—আমি জানি না।

আমার সওয়াল এখানেই শেষ—সহযোগী জেরা করতে পারেন।

বাসু-সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, জামলবাবু, আপনি এইমাত্র বলেন, আপনাদের বাড়িতে রাতে বাথরুমে ঘাওয়ার প্রয়োজনে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে হয় না, তাই না ?

—হ্যাঁ, তাই বলেছি।

—আচ্ছা এবার বলুন তো—দ্বিতল-বাসী কোন বাসিন্দা যদি দ্বিতল-বাসী কোন নিদ্রিত ব্যক্তিকে খুন করতে চান তবে কি সেই প্রয়োজনে তাঁকে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে হয় ?

—অবজ্ঞেকশান য়োর অনার ! আণ্ড'মেটেটিভ !

বাসু বাণ করে বলেন, মিঃ লর্ড ! সহযোগী ডাইরেক্ট এভিডেন্স প্রমাণ করেছেন—দ্বিতলে নিদ্রিত কোনও গৃহবাসী বাথরুমে ঘাবার প্রয়োজনে সিঁড়ির ব্যবহার করেন না, জেরার আমি প্রমাণ করতে চাই, দ্বিতলে নিদ্রিত কোনও গৃহবাসী দ্বিতলে নিদ্রিত অপর কোন ব্যক্তিকে খুন করতে চাইলে তাঁকে সিঁড়ির ব্যবহার করতে হয় না। এতে আপত্তির কি আছে ? হংস যদি ডুবে ডুবে গুলি খেতে পারে, তবে হংসীও তা পারে ! What's sauce for



the gander should be sauce for the goose !

বিচারক মুহূ হেসে বলেন, অবজেকশান ওভারক্লড ।

শ্রামল বললে, না, দ্বিতলবাসী কেউ যদি রাত্রে দ্বিতলবাসী অপর কারও ঘরে ঢুকে খুন করতে চান তাহলে তাঁকে সিঁড়ি ব্যবহার করতে হবে না :

—যেহেতু আসামী এবং যোগানন্দ দুজনেই সে রাত্রে দোতলায় গুয়েছিলেন, ফলে সিঁড়িতে আপনি যাকে দেখেছেন সে খুনী হলে অন্ততঃ আসামী নয় ?

—হ্যাঁ তাই ।

পরবর্তী সাক্ষী মহেন্দ্র বোস । লোকটা মাইতির সওয়ালের জবাব দিতে গিয়ে অদ্ভুত এক আঘাতে গল্প ফেঁদে বসল । স্বীকার করল, সে পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে জগদানন্দের ম্যানেজার ছিল, তারপর তার চাকরি যায় । এরপর সে দীর্ঘদিন অন্তর্ভুক্ত ছিল । মাস ভয়েক আগে তার সঙ্গে ঘটনাচক্রে যোগানন্দের সাক্ষাৎ হয় । যোগানন্দ নাকি বলেন, তিনি তাঁর জালিকা-পুত্রের সঙ্গে নীলিমার বিবাহ দেবার চেষ্টা করছেন । তাহে মহেন্দ্র বলে, যোগানন্দবাবু আপনি কি জানেন, ঐ মেয়েটির জন্ম সম্বন্ধে একটা রহস্য আছে ? যোগানন্দ বিষয় প্রকাশ করেন । তিনি মহেন্দ্রকে যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করতে বলেন । তাঁর নির্দেশে মহেন্দ্র রেডুনে যায় । নীলিমার জন্ম-রহস্য সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ যুগ্মিয়াঙ-এব মাধ্যমে সংগ্রহ করে ফিরে আসে । ইত্যাদি ইত্যাদি ।

সওয়াল শেষ করে মাইতি বাস্ত-সাহেবকে বলেন, আপনি এবার জেরা করতে পারেন ।

বাস্ত-সাহেব বলেন, মহেন্দ্রবাবু, আপনার জবানবন্দী অসুযায়ী ছয় মাস আগেও যোগানন্দ নীলিমার জন্ম-রহস্য বিষয়ে কিছু জানতেন না, কেমন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ ।

—তাহলে আশৈশব, জগদানন্দ যে যোগদানন্দকে আশ্রয় দিয়েছেন, ভরণ-পোষণ করেছেন তার কারণ এ নয় যে, যোগানন্দ একটি গোপন তথ্য জানেন, তাই নয় ?

—আমি স্মার, প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারছি না ।

—পারছেন না বুঝি ? আজ্ঞা বুঝিয়ে বলি । জগদানন্দ তাঁর স্নাতকপুত্র যোগানন্দকে এতদিন যে ভরণ-পোষণ করেছেন তার কারণটা কী ?

—আমি জানি না ।

—অন্ততঃ সে কারণটা এই নয় যে, তিনি যোগানন্দকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে,—জানে আমি ছয় মাস আগের কথা বলছি—যোগানন্দ নীলিমার জন্ম-রহস্য বিষয়ে কোনও ক্যাণ্ডেল ছড়াতে পারত ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তা তো বটেই। কারণ যোগানন্দ এতদিন কিছু জানতেন না।

—তার মানে ছয় মাস আগে পর্যন্ত যোগানন্দের আর্থিক অবস্থা ছিল শূন্য। শুধুমাত্র খাওয়া-পরাই চিন্তা ছিল না। তাঁর নিজস্ব কোন বোজগার ছিল না। ব্যাকমেলিং থেকেও আয় ছিল না। হয়তো জগদানন্দ কিছু হাত খরচ দিতেন। তাই নয়?

—তাই হবে বোধহয়, আমি তা কেমন করে জানব?

—বাস্তবে বাই হোক, আপনার ধারণাটা তাই ছিল। ঠিক নয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার ধারণায় তাই ছিল বটে।

—এবার বলুন তো মহেন্দ্রবাবু, প্লেনে করে রেঞ্জুনে গিয়ে তথ্যটা সংগ্রহ করে জানতে আপনার কত খরচ হয়েছে। আই মীন—রাফ হিসাব। চাব-পাঁচ হাজার টাকা?

—অত নয় শ্রাব। হাজার তিনেক হবে।

—খরচটা কে করল? শ্রীলিকা-পুত্রের বিবাহ-ব্যবস্থার তাগিদে নিঃস্ব যোগানন্দ, না আপনি?

—একটা টোক গিলে সাক্ষী বললে, আজ্ঞে যোগানন্দবাবু নন, আমিই।

—তাই বুঝি! তা নিঃসম্পর্কীয় যোগানন্দের শ্রীলিকাপুত্রের বিবাহ হচ্ছে না দেখে আপনি উত্তলা হয়ে অত টাকা গ্যাটের কড়ি খরচ করে বসলেন কেন?

—সাক্ষী কমাল দিয়ে মুখটা মুছে বললে, যোগানন্দবাবু আমাকে বলছিলেন যে, বিয়েটা হয়ে গেলে তিনি আমাকে ভালমত ঘটক-বিদায় দেবেন। জগদানন্দের অগাধ সম্পত্তি সবই তো পেত এই শ্রীলিকাপুত্র।

—দাম্পত্য একগাল হেসে বলেন, এটা বেকাঁস কথা হয়ে গেল মহেন্দ্রবাবু! গ্যাটের কড়ি খরচ করে যখন আপনি রেঞ্জুন যাচ্ছেন তখন তো আপনি নিশ্চিত জানতেন যে, বিয়েটা হবে না! নীলিমার জন্ম-বহন সন্ধিক্ষণে যোগানন্দের সন্দেহ থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু আপনার তো কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। বস্তুতঃ আপনি তো বিয়েটা যাতে ভেঙ্গে যায়—সেই তথ্যই সংগ্রহ করতে গেলেন। তাই নয়?

—আমি শ্রাব আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পারছি না!

—পারছেন না তার কারণ আপনি শ্রাব সাজছেন। অজস্র মিথ্যা কথা বলছেন!

—কী মিথ্যা বলেছি?

—যোগানন্দের অহুরোধে আপনি গ্যাটের পরমা খরচ করে বার্মা যান নি। গিয়েছিলেন ব্ল্যাকমেলিং-এর রসদ সংগ্রহ করতে। ফিরে এসেই জগদানন্দকে শোষণ করতে শুরু করেছিলেন, স্বীকার করুন ?

—না স্ত্রীর ! আমি... আমি কেন ব্ল্যাকমেলিং করতে যাব ?

বাহু হেসে বলেন, আমি জেরা করব, আপনি উত্তর দেবেন, এটাই আদালতের রীতি। আপনি কেন ব্ল্যাকমেলিং করতে যাবেন সে কৈফিয়ৎ আমার দেবার নয়। যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দিন, তহবিল তছরূপ করেছিলেন বলে আপনার ম্যানেজারী খতম হয়েছিল একদিন ?

—আজ্ঞে না !

—আপনাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে জগদানন্দ যেদিন আপনাকে বাড়ির বার করে দেন সেদিন আপনি তাঁকে শাসিয়ে যান নি যে, এর প্রতিশোধ আপনি নেবেন ?

—না স্ত্রীর, এসব কী বলছেন আপনি ?

—ও ! তবে আপনার চাকরি গেল কেন ?

সাক্ষী একটু ভেবে নিয়ে বলে, সদানন্দ মারা যাবার পর উনি ব্যবসা শুটিয়ে আনেন। তাই ম্যানেজারের দায় কোন দরকার ছিল না।

—তাই বুঝি ! নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনা ! আচ্ছা, এবার বলুন তো মহেঞ্জোদারো—তাইলে জগদানন্দ তাঁর শেষ উইলে আপনাকে কেন তাঁর বসত বাড়িটি দিয়ে যেতে চাইলেন ?

মাইতি আপত্তি জানান। এ প্রশ্নের জবাব নাকি সাক্ষীর দেবার কথা নয়।

—অবজ্ঞেকশান মাসটেইণ্ড !

—ঠিক আছে। আমার জেরা এখানেই শেষ।

বাদী পক্ষের শেষ সাক্ষী জয়দীপ রায়। নাম ধাম পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর মাইতি তাঁকে মাত্র কয়েকটি প্রশ্ন করলেন—আপনি কি নীলিমা দেবীকে বিবাহ করার প্রস্তাব নিয়ে কখনও জগদানন্দের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ?

—হয়েছিলাম।

—আপনি কি নীলিমা দেবীর জন্ম তারিখটা জানেন ?

—হ্যাঁ, জানি। দোশরা সেপ্টেম্বর, 1940।

—কেমন করে জানলেন ?

—আমি ওর জন্ম-পত্রিকা দেখেছি।

—থ্যাটস্ অল মিঃ লর্ড !

বাস্থ কিছু দীর্ঘ জেরা করলেন জয়দীপকে। তাঁর প্রথম প্রশ্ন আপনি কি ঘটনার আগের রবিবার সন্ধ্যায় পার্ক হোটেলের চত্বিশ নম্বর ঘরটা নিজ নামে ভাড়া নেন ?

—হ্যাঁ, নিই।

—আপনার কলকাতায় থাকার জায়গা আছে। তা সত্ত্বেও কেন হোটেলের ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন ?

—ঐ হোটেলের আটত্রিশ নম্বর ঘরে উঠেছিলেন মিস্টার যু সিয়াঙ। তাঁর গতিবিধির উপর নজর রাখবার উদ্দেশ্যে।

—ঐ রবিবার রাত্রি নটা থেকে দশটা পর্যন্ত মিস্টার যু সিয়াঙ একজন দর্শনপ্রার্থীর সঙ্গে রুদ্ধদ্বার কক্ষে কথা বলেছিলেন কিনা তা কি আপনি প্রত্যক্ষজ্ঞানে জানেন ?

—জানি। আমি স্বচক্ষে দেখেছিলাম, মিস্টার মহেন্দ্র বোস এবং তাঁর উকিল গুঁর সঙ্গে ঐ সময় রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনা করতে থাকেন।

—তারপর কি হয় বলে যান—

জয়দীপ তাঁর জবানবন্দীতে বলে যায় পরবর্তী ঘটনা। রাত দশটায় যু সিয়াঙ-এর হোটেল ত্যাগ। পরদিন সোমবার সকাল সাতটায় সেও পার্ক হোটেল থেকে চেক আউট করে চলে যায়। গিয়ে গুঠে দমদমের ভি. আই. পি হোটেলে। রাত বারোটা চত্বিশে সে কিভাবে টেলিফোন-মেসেজটা লিখে নেয় এবং সকাল হলে বালিগঞ্জ সাকুলার রোডে এসে বাস্-সাহেবকে কাগজখানা দেয় সব বিশদভাবে জানায়।

বাস্-সাহেবের জেরা শেষ হবার আগেই আদালত বন্ধ হল।

বিচারক ঘোষণা করলেন—পরদিন স্বথারীতি বেলা দশটায় আদালত বসবে।

আট

কোটি থেকে ফিরে গুঁরা এসে বসলেন বালিগঞ্জ সাকুলার রোডের বাড়িতে। একতলার বৈঠকখানায়। বাস্-সাহেব, কৌশিক, জয়দীপ আর শ্যামল। মহেন্দ্র এবং বিশ্বম্ভর বর্তমানে এ বাড়িতে থাকেন না। তাঁরা হোটেল উঠেছেন। জগদানন্দ দ্বিতলে নিজের ঘরে উঠে গেলেন। এসব আলোচনায় তিনি আজকাল আর থাকেন না।

কৌশিক বললে, আপনার জেরায় আজ বেশ বোঝা গেছে যে, মহেন্দ্র-

লিয়াঙ কোম্পানিই ব্ল্যাকমেলিং করছিল, যোগানন্দ নয়। ফলে জগদানন্দের পক্ষে খুন করার কোনও মোটিভ বালী পক্ষ দেখাতে পারবে না।

বাসু বলেন, তা তো হল ; কিন্তু তাহলে খুনটা কবল কে ? কেন ?

কৌশিক বলে, তা নিয়ে আপনার কেন মাথা ব্যথা ? আসামী খুন করে নি এটুকু প্রমাণ করারই তো দায়িত্ব আপনার !

—আই ডোন্ট এগ্রি। সত্যকে উদ্ঘাটিত করার দায়িত্ব আমার !

নীলিমা একটি স্বগতোক্তি করে, আশ্চর্য, সেই ডুপ্লিকেট চাবির গোছটা আর খুঁজে পাওয়া গেল না !

জয়দীপ বললে, না পাওয়াই স্বাভাবিক। দশটা দিয়েই খুনী ঐ দরজাটা খুলেছে। এতক্ষণে সেটা কলকাতার কোন রাস্তায় স্থায়ীবে চলে গেছে ! সেটা যথাস্থানে রেখে যাবার ঝুঁকি খুনীটা নেবে কেন ?

শ্রীমল বললে, বাসু-সাহেব, আপনি জেরায় আর একটু অগ্রসর হলেন না কেন ? দ্বিতলবাসীর বদলে খুনী যদি একতলার বাসিন্দা হয় তাহলে দ্বিতলবাসীকে খুন করতে হলে তাকে সিঁড়ি ব্যবহার করতে হয়—এ কথাটাও তো আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিতে পারতেন।

—পারতাম। বাট গ্যাস্ট্‌স্ অবভিয়াস্। জাস্টিস ভাহুড়ী জানেন,—দুইয়ে দুইয়ে চার হয়।

কৌশিক বললে, মহেন্দ্র যে বিশ্বস্তরবাবুকে দিয়ে খেসারত বাবদ একটা ড্রাফট তৈরী করেছিল সে প্রসঙ্গ তো তুললেন না ?

—কী লাভ হত কৌশিক ? ওরা সেটা অস্বীকার করে যেত। মহেন্দ্র তো স্বীকারই করছে না যে, তাকে অন্তায়ভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে এই অজুহাতে সে এ বাড়িতে এসেছে !

—আপনি বিশ্বস্তরকে কাঠগোড়ায় তুলবেন না ? সে রাত বারোটা চল্লিশে ফোন করেছিল কি না—

বাসু-সাহেব কি যেন চিন্তা করছিলেন। হঠাৎ দাঁড়ান। বলেন, তোমরা কথা বল, আমি, আমি এখনই আসছি।

উনি উঠে এলেন দ্বিতলে। জগদানন্দের ঘরে ঢুকে দেখেন বৃদ্ধ চুপ করে বসে আছেন ইজি চেয়ারে। বাসু-সাহেবকে দেখে উদাস দৃষ্টি মেলে তাকান। বাসু বসে পড়েন পাশের চেয়ারটায়। বলেন, বলুন তো—আপনি যে আমার মাধ্যমে এ বসতবাড়িটি আপনার নাতনিকে দানপত্র করে দিয়েছেন, এ খবরটা কে কে জানে ?

—আপনি, আমি, কৌশিকবাবু আর যোগানন্দ জানত।

—আর কেউ ?

—হ্যাঁ, নীলিমাও জানে !

—নীলিমা কেমন করে জানল ?

জগদানন্দ বলতে থাকেন। বুধবার দানপত্রটা রেজেষ্ট্রি হয়। পরদিন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তিনি নীলিমা আর জয়দীপকে দানপত্রের কথা গোপন করে উইলটা দেখান। তারপর জয়দীপ চলে যায়। জগদানন্দ নীলিমার খবর এসে দেখেন, মেয়েটা টেবিলে মাথা বেখে কাঁদছে। জগদানন্দ মর্মান্বিত হন। নীলিমা ওকে দেখে বলে, তুমি ছোটকান্নাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে যাচ্ছ এতে আমি খুশি। তুমি বসন্তবাড়িটা আমাকে দিচ্ছ না তাতেও আমার দুঃখ নেই দাছ। কিন্তু তুমি ঐ মহেন্দ্রবাবুকে কেন দিচ্ছ বাড়িটা ? কোন সংকাজে এটা দান করে যাও না দাছ ? তোমার নামে অনাথ-আশ্রম হ'ক, হাসপাতাল হ'ক ! তুমি যখন থাকবে না তখন তো আর ঐ মহেন্দ্র তোমাকে আর ব্ল্যাকমেল করতে আসবে না ?

জগদানন্দ আর স্থির থাকতে পারেন নি। রঙের টেকাটা নীলিমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। বুঝিয়ে বলেছিলেন, মহেন্দ্র কোনদিনই উইলের প্রবেট নিয়ে এ বাড়ি দখল করতে পারবে না—কারণ এ বাড়ির মালিক জগদানন্দ নন, নীলিমা।

বাস্‌ উঠে দাঁড়ান। বলেন, কী আশ্চর্য ! কী অপরিমিত আশ্চর্য ! এবড় খবরটা এতদিন বলেন নি ?

—খবরটা কী এতই গুরুত্বপূর্ণ ?

—আলবৎ ! এ থেকেই যে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যোগানন্দকে কে খুন করেছিল।

জগদানন্দ শুক বিষ্ময়ে তাকিয়ে থাকেন।

বাস্-সাহেবের গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। কাউকে কিছু না জানিয়ে তিনি কোথায় যেন চলে গেলেন।

কৌশিক বৈঠকখানা থেকে উঁকি মেরে দেখে বললে, এ কি ? উনি এমন কাউকে কিছু বলে না চলে গেলেন যে ?

জয়দীপ হেসে বললে, এ থেকে প্রমাণ হয় বাস্-সাহেব একজন জিনিয়াস। জিনিয়াসদেরই অমন মগজের ছ' চারটে জুঁ আলাগা থাকে।

নয়

জগদানন্দের বাড়ি থেকে ফিরে এসে বাসু-সাহেব স্তনলেন তাঁর জ্ঞাত একজন সাক্ষাৎপ্রার্থী নাকি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে। আদালতে এমনিতেই নানারকম ধকল গেছে, সেখান থেকে গিয়েছিলেন জগদানন্দের বাড়িতে, তারপর ক্লান্ত দেহে এতক্ষণে ফিরে এসেছেন নিজের ডেরায়। সন্ধ্যাবেলাটা তিনি কিছুক্ষণ একা থাকেন, কিছুটা জ্বর সান্নিধ্যে গল্পগুজবে কাটান। এ সময় আগন্তকের খামেলা বরদাস্ত হয় না তাঁর। প্রশ্ন করেন, কে লোকটা? কী চায়?

মিসেস বাসু বলেন, নাম বলতে আপত্তি আছে তাঁর। ধৃতি পাঞ্জাবী পরা ভদ্রলোক। বয়স আন্দাজ ত্রিশ। বলেছেন—ব্যাপারটা গোপন।

বাসু-সাহেব জুতার ফিতে খুলতে খুলতে বলেন, ব্যারিস্টারের কাছে সাঁঝের অঙ্ককারে যে দেখা করতে আসে তার ব্যাপারটা গোপনই হয়ে থাকে রান্ন, সেটা কোন সংবাদ নয়। কিন্তু কী করে এসেছে লোকটা? খুন? না তহবিল তছরপ? ?

রানী দেবী হেসে বলেন, তোমার কি ধারণা সে-কথা আমার কাছে স্বীকার করার পরেও ভদ্রলোকের গোপনীয়তা বজায় থাকতো?

—ঠিক আছে। পাঠিয়ে দাও। আমি বাইরের ঘরে বসছি।

একটু পরে ঔর চেয়ারে যে ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন তিনি মোটেই অপরিচিত ব্যক্তি নয়, যদিও তাঁর সাজে পোষাকে একটু অভিনব আছে। খড়া-চুড়া খুলে রেখে নিতান্ত বাঙালী বাবুটি সেজে এসেছেন।

—কী ব্যাপার মনীশবাবু? হঠাৎ এভাবে ছদ্মবেশে শত্রুশিবিরে? বসুন।

মনীশ বর্মন ঔর ভিজিটার্স চেয়ারে বসে বললে, আপনার একটা অভিযোগও কিন্তু টিকছে না বাসু-সাহেব। প্রথমত এটা আমার ছদ্মবেশ নয়, নিতান্তই আমার নামরূপের উপযোগী বাঙালী পোষাক—দ্বিতীয়ত আমি শত্রুপক্ষের লোকও নই। বরং বলব—পাছে আপনি আমার মধ্যে শত্রুপক্ষের আভাস পান তাই পুলিশের সাজ-পোষাক খুলে রেখে এসেছি। সংক্ষেপে আপনার সামনে যে বসে আছে সে ইম্পেক্টার মনীশ বর্মন নয়, মনীশবাবু!

—ভূমিকাটা ভালই হয়েছে—এবার বিষয়বস্তুতে আসা যাক? কী ব্যাপার?

মনীশ কিন্তু সরাসরি বক্তব্যে আসতে পারল না। কোথায় যেন তার বাধছে। একটু ইতস্তত করল, নড়ে চড়ে বসল। শেষে গলাটা সাকা করে শুরু করল : ভূমিকাটা আমার শেষ হয়নি বাসু-সাহেব। মুখবন্ধ হিসাবে

আরও কয়েকটা কথা বলে নিই। না হলে আমি ঠিক সহজ হতে পারছি না।

—বলুন ?

—প্রথমে কিছুটা নিজের কথা বলি। আমার চাকরি আট বছরের। কলেজে পড়াশুনায় ভাল ছাত্র ছিলাম। পুলিশের চাকরিতে উন্নতি হয়েছে বেশ তাড়াতাড়ি। কিন্তু চাকরি জীবনে একটা অভিশাপ থাকে—জানেন নিশ্চয়ই—আমি সেই অভিশাপের খোরাক হয়েছি। যে কেসটায় এখন আপনি আর আমি বিপরীত দিকে দাঁড়িয়েছি—আমি জগদানন্দবাবুর কেসটার কথা বলছি—সে কেসে আমি ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছি। সব কথাই স্বীকার করব—আমার প্রথম থেকেই মনে হয়েছিল, যোগানন্দ-হত্যা মামলায় জগদানন্দকে আসামী করাটা ভুল হচ্ছে। আমি আমার রিপোর্টে প্রথম থেকেই বলে যাচ্ছি যে, যোগানন্দকে জগদানন্দ খুন করেন নি, করতে পারেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার উপরতন কর্তৃপক্ষ আমার সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। কর্তার ইচ্চার কর্ম। উপরওয়ালার নির্দেশ অনুসারে আমাকে কেস সাজাতে হল। আমি মনে মনে জানতাম যে, আপনি জগদানন্দকে নিরপরাধী বলে নিশ্চয়ই প্রমাণ করতে পারবেন। আজকে আদালতে আপনি মায়ালাটাকে যে পর্যায়ে নিয়ে গেছেন তাতে আমার ধারণা যে সত্য সে বিষয়ে গিন্দুমান্দ সন্দেহ নেই। মজা হচ্ছে এই যে, আমার উপরওয়ালার কর্তৃপক্ষ সব বুঝেও তাঁর গৌঁ ছাড়ছেন না।

মনীশ বর্মন হঠাৎ নীরব হল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন দেখলেন ও আর কিছু বলছেন না তখন বাধ্য হয়ে বাস্তব সাহেব বলেন, বুঝলাম। এখন আপনি কী চাইছেন ঠিক করে বলুন তো? আমি কী ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি? ইচ্ছে করে কেসে হারব?

মনীশ শ্রান হেসে বলে, পুলিশের চাকরীতে এই হচ্ছে বিড়ম্বনা মিস্টার বাস্তব। আমি কেসটা হারলে আমার চাকরিতে একটা দাগ পড়বে। সরকারী কাইলে শুধু লেখা থাকবে কেসটা আমি ইনভেস্টিগেট করেছিলাম, আমিই পরিচালনা করেছিলাম এবং এমনভাবে কেসটা সাজিয়েছিলাম, যাতে অভিযুক্তের শাস্তি হয় নি।

বাস্তব সাহেব একটু বিরক্ত হয়েই বলেন, কিন্তু আমি তার কি করব?

—সেই কথাই বলছি স্যার! আমার মনে হল, জগদানন্দ বেকসুর হাড়া পেয়ে যান তো যান, কিন্তু প্রকৃত অপরাধীকে যদি আমরা ধরতে পারি তাহলে এ অবস্থা থেকেও আমি তরাডুবিকে ঠেকাতে পারব। আপনার কৌণ্ট্রি-কাহিনী সবই আমার জানা। আপনার প্রতিটি কেস-হিস্ট্রি খুঁটিয়ে পড়েছি



আমি। তাই ভাবলাম, আপনি কিছুতেই জগদানন্দকে মুক্ত করে আপনার কর্তব্য সমাপ্ত হয়েছে বলে মনে করবেন না। ষোগানন্দকে কে হত্যা করেছে সে রহস্যটা ভেদ না করা পর্যন্ত আপনার বাতে ঘুম হবে না। ঠিক নয়?

বাহু-সাহেব একটা চুরুট ধরালেন।

—তাই আমি আদালত থেকে বাড়ি ফিরে জামা-কাপড় ছেড়ে সোজা আপনার কাছেই চলে এসেছি।

—হুম্। কিন্তু আপনার উপরওয়ালা কি এ তথ্যটা জানেন?

—না। জানেন না। কোনদিন জানতেও পারবেন না। আমি চাই আপনাকে সাহায্য করতে, বরং বলা উচিত আপনার সাহায্যে রহস্যটা ভেদ করতে। আপনি কি রহস্যটার কিনারা করতে পেরেছেন?

—না। তবে কয়েকটা সম্ভাবনার কথা মনে জাগছে।

—আমার মনে হয় আরও কয়েকটি রু, পেলে হয়তো আপনার পক্ষে রহস্যটা ভেদ করা সহজ হবে। সুতরাং সর্বপ্রথমে আমরা আমাদের সংগৃহীত ‘রু’গুলো বিনিময় করি। আপনি কী বলেন?

বাহু-সাহেব বলেন, আমার আপত্তি নেই, তবে আমাদের সন্ধির সর্ব-গুলো তাঁর আগে স্থির হওয়া প্রয়োজন। আপনি ঠিক কী চান, তাই আগে বলুন?

—আমার তরফে একটি মাত্র সত। জগদানন্দকে মুক্ত করেই আপনি থামবেন না, প্রকৃত খুনীকে চিহ্নিত করে দেবেন এবং কী সূত্রে তাকে চিহ্নিত করলেন তা শুধু আমাকেই জানাবেন।

—আমি রাজী! শুধু ও-টুকুই নয়, প্রকৃত অপরাধীকে যাতে আপনিই গ্রেপার করেন সে ব্যবস্থাও আমি করে দেব—যদি আদৌ তাকে ধরতে পারি।

—থ্যাক্স যু স্যার!

এর পর দীর্ঘ সময় ওঁরা নিজ-নিজ সংগৃহীত তথ্যের আদান-প্রদান করতে থাকেন। ইতিমধ্যে কৌশিকও বাসায় ফিরে এসেছিল। তাকেও ডেকে পাঠালেন বাহু-সাহেব। তিনজনে গভীর আলোচনায় ডুবে গেলেন। বাহু-সাহেব বলেন, মনোশবাবু, আপনি প্রথমে বলুন হত্যাকারী হিসাবে কাকে আপনার সন্দেহ হয় এবং কেন?

মনোশ বললে, আমার বিশ্বাস ষোগানন্দকে যে হত্যা করেছে তাকে আপনারা চেনেনই না।

কৌশিক ঠাট্টা করে বলে, যা বাবা! গোয়েন্দা কাহিনীতে তো এমন

হওয়ার কথা নয় মনীশবাবু,—আসল অপরাধীকে ধরতে না পারলেও তার পরিচয় আমাদের পাওয়া উচিত ছিল ।

মনীশ বললে, প্রথম কথা এটা গোয়েন্দা গল্প নয়, বাস্তব ঘটনা । দ্বিতীয় কথা—আমি বলতে চাই যোগানন্দকে যে হত্যা করেছে তাকে না চিনলেও যার নির্দেশে সে হত্যা করেছে তাকে আপনারা চেনেন ।

বাস্থ বলেন, আর একটু পরিষ্কার করে বলুন ।

—আমার ধারণা—এটা পাশা হাতের কাজ । আমেচার নয়, প্রফেশনাল খুনের কাজ । এ কথা মনে করছি যে ‘ক্লু’-টার সাহায্যে সেটা আগে জানাই । সে খবর আপনারদের অজানা । আমি জানি, যু সিয়াঙকে আপনারা মন্দেহজনক ব্যক্তি মনে করে নজরবন্দী করেছেন । কিন্তু যার মাধ্যমে করেছেন সেই জয়দীপ ছোকরা হচ্ছে আমেচার । তাই ‘ক্লু’-টার সন্ধান সে পায় নি । যু সিয়াঙ সম্বন্ধে আমিও খবরাখবর নিয়েছি । আমার সংবাদসূত্র বলছে—যু সিয়াঙ ক’লকাতায় এসে সবপ্রথমই জগদানন্দের দ্বারস্থ হয়নি, সে ক’লকাতার ‘আণ্ডার-গ্রাউণ্ড’ জগতের সঙ্গেই প্রথম যোগাযোগ করে টেলিফোনে । দ্বিতীয়ত জয়দীপের ধারণা যু সিয়াঙ রবিবার সারাদিন একটা টুরিস্ট বাসে শহর দেখে বেরিয়েছে । খবরটা ভুল । লোকটা অত্যন্ত শেয়ানা । সম্ভবত সে বুঝতে পেরেছিল তাকে কেউ হোটেলে নজরবন্দী করে রেখেছে । তাই রবিবার সকালে সে টুরিস্ট বাসে রওনা হলেও এসম্প্রদানেডে নেমে যায় । গুণ্ডাদের গোপন আড্ডায় যায় এবং বিকাল তিনটে নাগাদ টুরিস্ট বাসের প্রোগ্রাম অমুযায়ী আবার অন্তর বাসে চেপে পসে । জয়দীপের ধারণা রবিবার সমস্ত ছপুর সে ঐ টুরিস্ট বাসেই ছিল । তা সে ছিল না । তৃতীয়ত, রবিবার রাত সাড়ে নয়টায় সেই ‘আণ্ডার-গ্রাউণ্ড’ জগতের একজন কুখ্যাত গুণ্ডা-প্রকৃতির লোক পাক হোটেলে আসে । যে সময় ঐ হোটেলে মহেন্দ্র এবং তার উকিল যু সিয়াঙের সঙ্গে দেখা করে প্রায় সেই সময়ই । সে যে ঠিক কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, তা জানি না—তবে আমার অনুমান লোকটা মহেন্দ্র-বিশ্বস্তর পাটির সঙ্গে দেখা করতে আসেনি, এসেছিল যু সিয়াঙের কাছেই ।

—লোকটার নাম কি ?—জানতে চান বাস্থ-সাহেব ।

মনীশ বর্মণ বলে, পিতৃদত্ত নামটা ঠিক কী তা জানি না, পুলিশের খাতায় তার নাম খোকা গুণ্ডা । বার দুই তাকে খুনের মামলায় জড়ানো হয়েছিল , দু বারই পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেছে । তবে ডাকাতির কেসে বছর পাচেক একবার মেয়াদও খেটেছে । লোকটা রীতিমতো দাগী । ভবানীপুর থানায় তাকে প্রত্যহ সন্ধ্যায় হাজির দিতে হয় ।

কৌশিক বলে, ধরা যাক আপনার অল্পমান সত্য। এ খুনটা কোন অ্যাগেচারের হাতে হয়নি, খোকা গুণ্ডাই আসল অপরাধী। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে মধ্যরাত্ৰিতে সে কি করে রক্তস্রাব ঘরের ভিতর ঢুকল ?

—রক্তস্রাব বলতে দুটো দরজা। সদর দরজা আর যোগানন্দের শয়নকক্ষের দরজা। দুটো দরজার কোনটাই ভিতর থেকে ছিটকিনি বা খিল দিয়ে বন্ধ ছিল না—গা-তালা লাগানো ছিল। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, সবকটা দরজার ডুপ্লিকেট চাবির খোকাটাই ঘটনার পূর্বে চুরি গিয়েছিল।

কৌশিক বললে, তা গিয়েছিল ; কিন্তু সে-ক্ষেত্রে যু সিয়াঙকে সন্দেহ করাটা কি স্বাভাবিক ? বহিরাগত যু সিয়াঙ কেমন করে নীলিমা দেবীর দেওয়াল থেকে ডুপ্লিকেট চাবির গোছাটা চুরি করবে ? মহেন্দ্রবাবু সেটা করতে পারে হয়তো—যে-হেতু সে ঐ বাড়িতে ছিল ; কিন্তু আপনিই তো বলছেন খোকা গুণ্ডার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল যু সিয়াঙ, মহেন্দ্র নয়। আর তার চেয়েও বড় কথা—মোটিভ। মহেন্দ্র অথবা যু সিয়াঙ কী কারণে যোগানন্দকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে ভাড়াটে গুণ্ডা লাগাবে তাই বলুন ?

মনীশ বলে, এ বিষয়ে আমার থিয়োরি এই যে, যোগানন্দকে হত্যা করার ইচ্ছা যু সিয়াঙ-এর আদৌ ছিল না। সে ভাড়াটে গুণ্ডা লাগিয়েছিল মহেন্দ্রকে খুন করতে। ভেবে দেখুন—ঐ খাটে মহেন্দ্রই রাত্রে শোওয়ার কথা। যু সিয়াঙ কেমন করে জানবে ওরা ঘর বদলাবে ?

কৌশিক অসহিষ্ণু হয়ে বলে, কিন্তু কে কোন ঘরে রাত্রে শোয় সেটা যু সিয়াঙ জানবে কেমন করে ? সে তো মাত্র ঘণ্টাখানেকের জন্ত একবার ঐ বাড়িতে গিয়েছিল। জগদানন্দের সঙ্গে কথা বলে চলে আসে ! তার পক্ষে কি জানা সম্ভব মহেন্দ্র কোন ঘরে রাত্রে শোয় ?

মনীশ সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বাস্তব-সাহেবকে বলে, আপনি কি বলেন ?

বাস্তব-সাহেব এতক্ষণ নীরবে ধূমপান করে যাচ্ছিলেন। নড়ে চড়ে বসে বলেন, আমি বলি কি ঘরে বসে এসব তত্ত্ব-আলোচনা না করে, চল আমরা একটু সরেজমিনে তদন্ত করে আসি।

—সরেজমিনে তদন্ত ! সে আবার কোথায় ?

বাস্তব বলেন, প্রথম কথা, মনীশবাবু, তুমি এখান থেকে ভবানীপুর থানায় একটা ফোন করে জেনে নাও সেই খোকাবাবু আজ তাঁর হাজিরা দিয়ে গেছেন কিনা। যদি না দিয়ে গিয়ে থাকেন তবে তিনি এলে যেন তাঁকে আটকে রাখা হয়। আমরা রাত নটা নাগাদ ভবানীপুর থানায় যাব। দেখ, তাকে

পাওয়া যায় কিনা।

মনীশ মনে মনে খুশী হল। সে লক্ষ্য করেছে ইতিমধ্যে বাসু-সাহেব 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমেছেন। অর্থাৎ মনীশ বর্মন তাঁর স্নেহের পাশ্বে উন্নীত হয়েছে। সোৎসাহে সে বাসু-সাহেবের টেলিফোনটা টেনে নিয়ে ভবানীপুর থানার সঙ্গে যোগাযোগ করল। ভাগ্য ভাল—থোকা গুণ্ডা এখনও তার হাজিরা দিতে আসেনি। মনীশ থানায় জানিয়ে রাখল, সে এলে তাকে ঘেন আটকে রাখা হয়। বাসু বলেন, প্রয়োজনবোধে থোকাবাবুকে ঘেন আমার আকাউন্টে চা-পান-সিগ্রেট জোগান দেওয়া হয় এটাও বলে রাখ।

মনীশ হাসতে হাসতে বলে, তার প্রয়োজন হবে না। আপনি বিখ্যাত ক্রিমিনাল সাইডের ব্যারিস্টার। অপরাধ জগতের সবাই আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়াটা সৌভাগ্য বলে মনে করে। কিন্তু রাত নটা বাজতে তো এখনও অনেক দেরী। এতক্ষণ কী করব আমরা?

বাসু গাত্ৰোত্থান করেন, ঐ যে বললাম—একটু সরেজমিনে তদন্ত করব। চল পাক হোটেলটা ঘুরে আসি। আটত্রিশ নম্বর কামরাটা একবার স্বচক্ষে দেখে রাখা ভালো।

মনীশও উঠে দাঁড়ায়। বলে, যেতে চান চলুন, কিন্তু একটা কথা বলে রাখি—যু সিয়াঙ ঐ ঘরটা ছেড়ে দিয়েছিল রবিবার রাত দশটায়। সেখানে অ্যাস্ট্রেতে কোনও চুরুটের ছাই অথবা ছেঁড়া-কাগজের ঝুড়িতে কিছুই পাবেন না! ইতিমধ্যে হয় তো একাধিক বোর্ডার ঐ ঘরে বাস করে গেছে!

বাসু-সাহেব আবার চটি-জোড়া খুলে জুতো পায়ে দিতে দিতে বলেন, তা কি আগে ভাগে কেউ বলতে পারে? কবি বলেছেন, 'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ ত'ই, পাইলে পাইতে পার অমূল্য রতন!' কী কৌশিক, যাবে না কি?

কৌশিক দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বললে, নিশ্চয় নয়! এতদিন পরে সেই ঘরটা সার্চ করতে যাবার মত বাসনা আমার আদৌ নেই!

বাসু বললেন, ঠিক আছে। পরে কিন্তু তুমিই পস্তাবে। চল হে মনীশবাবু।

ধূতি-পাঞ্জাবি পরিহিত হওয়া সত্ত্বেও পার্ক-হোটেলের ম্যানেজার মনীশ বর্মনকে চিনতে পারল। ইতিপূর্বেই সে একবার ধড়া-চুড়া পরে তদন্ত করে

গেছে। বললে, বলুন স্ত্রীর, কীভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি ?

মনীশ বাহু-সাহেবের পরিচয় দিয়ে বললে, ইনি একবার ঐ আর্টক্লিশ নম্বর ঘরটা দেখতে চান।

—তাহলে প্রথমেই জানতে হয় ঘরটা অকুপায়েড কিনা।

ম্যানেজার রিসেপশান কাউন্টারে ফোন করে জেনে নিয়ে বললে, ভাগ্য ভাল। ঘরটা এখন ফাঁকা। একটু আগেই খালি হয়েছে। আমিও আপনাদের সঙ্গে আসব ?

বাহু বলেন, কোনও প্রয়োজন নেই। একজন রুম অ্যাটেন্ডেন্টকে শুধু আমাদের সঙ্গে দিন।

হোটেল বয়ের সঙ্গে ওঁরা লিফ্ট-এ করে তিনতলায় উঠে এলেন। ত্রিতলের একক-শয্যা বিশিষ্ট আর্টক্লিশ নম্বর ঘরটা করিডোরেব শেষ প্রান্তে। হোটেল-বয় ঘরের তালি খুলে দিল। বাহু-সাহেব ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখলেন। কী দেখলেন তা তিনিই জানেন। অতি সংক্ষেপে পরিদর্শন শেষ করে এসে বললেন, চল এবার নিচে রিসেপশান কাউন্টারে যাই।

নিচের রিসেপশান কাউন্টারে আবার দেখা হয়ে গেল ম্যানেজার ভক্তলোকের সঙ্গে। তিনি বলেন, কি হল ব্যারিস্টার-সাহেব, পেলেন কিছু ?

বাহু-সাহেব, তা কিছু কিছু পেলাম বইকি। এবার আমি দেখতে চাই আপনাদের হোটেল রেজিস্টারখানা। যদি কোন আপত্তি না থাকে।

ম্যানেজার বলেন, আপত্তি ? বলেন কি ? মিস্টার বর্মণ যখন চাইছেন তখন সব রকম সাহায্যই করব আমরা। আন্তরিক।

ম্যানেজার পরিচয় করিয়ে দিলেন, এ হচ্ছে মিস্ এডনা পার্কার। আমি যদি না থাকি তাহলে এর কাছে যা জানতে চান জেনে নিতে পারেন।

মিস্ এডনা পার্কার রিসেপশান-কাউন্টারে ডিউটি দিচ্ছিল। বছর বাইশ-তেইশ বয়স। দেখতে ষতটা স্নন্দর তার চেয়ে বেশী দেখাচ্ছে উগ্র সাজের চটকে। নীল চোখ, সোনালী চুল। সবিনয়ে বললে, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর য় সার্স ?

বাহু-সাহেব ওর কাছ থেকে হোটেলের রেজিস্টারখানা চেয়ে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন। এক রকমদিনে কয়েকগাতা এগিয়ে এসেছে খাতাটা। পাতা উল্টে খুঁজে বের করলেন উনি। ই্যা, এই তো মিস্ সিয়াঙের হস্তাক্ষর। শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটা দশ-এ সে হোটেল চেক-ইন করে। আর্টক্লিশ নম্বর ঘর। স্থায়ী ঠিকানার ঘরে বর্মার একটি বাড়ির নম্বর। ‘প্রফেশন’-এর ঘরে লিখেছে বিজনেসম্যান, ব্যবসায়ী। বর্মার নাগরিক। পাসপোর্ট নম্বরের উল্লেখও

করতে হয়েছে। রবিবার রাত দশটা পনের মিনিটে সে হোটেলের গাড়ি নিয়েই হোটেল ত্যাগ করে যায়। বাসু-সাহেব ডায়েরিতে সব কিছু টুকে নিলেন। লক্ষ্য করে দেখলেন, পরের পৃষ্ঠাতেই আছে জয়দীপের স্বাক্ষর—সে রবিবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ হোটেলের খাতায় সই করেছিল। অর্থাৎ কৌশিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সে সোজা চলে এসেছিল এই হোটেলে। জয়দীপের এন্ট্রিটাও খুঁটিয়ে দেখলেন বাসু-সাহেব। কত নম্বর ঘরে সে উঠেছিল, কবে, কটার সময় সে হোটেল ছেড়ে দেয়।

খাতাটা বাসু-সাহেব বাড়িয়ে ধরেন ম্যানেজারের দিকে। বলেন, এই রেজিস্টারখানা মামলায় প্রয়োজন হতে পারে। আপনি বরং এটা আপনার নিজস্ব হিন্দুকে তুলে একটা নতুন খাতা এখন, এই মুহূর্ত থেকেই চালু করুন। এতে যু সিয়াঙের সই আছে, নিজ স্বীকৃতি-মত তার স্থায়ী ঠিকানা, পাসপোর্ট নম্বর ইত্যাদিও আছে।

ম্যানেজার বললেন, খাতাটা এখনই কাউন্টার থেকে সরিয়ে ফেলা সম্ভবপর নয়, যে সব বোর্ডার এসেছেন, এখনও হোটেলে আছেন তাদের নামগুলি নতুন খাতায় কপি করে নিতে হবে প্রথমে।

বাসু বলেন, বেশ, এখনই কপি করতে দিন। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে খাতার কোন ফিগার যাতে কেউ টাম্পার না করে সে জ্ঞাত আমি আপনাকে কয়েকটি এন্ট্রিতে গোল চিহ্ন দিয়ে সই দিতে অনুরোধ করব।

ম্যানেজার বলেন, এতে কোন অসুবিধা নেই। আপনি যে যে ফিগারগুলো গোলচিহ্ন দিয়ে দেবেন, আমি তার পাশে পাশে সই দিয়ে দিচ্ছি।

বাসু-সাহেব খাতাখানি টেনে নিলেন। তিন-চারটি এন্ট্রিতে গোল চিহ্ন দিয়ে ফেরত দিলেন। ম্যানেজার তার পাশে পাশে সই দিয়ে গিলেন।

মনীশ কোভুহল সম্বরণ করতে পারে না। বলে, মাপ করবেন মিস্টার বাসু, আমি কিন্তু মাথা মুণ্ড কিছুই বুঝছি না। এ খাতায় গৌজামিল দিতে চাইবে কে? কেন? যু সিয়াঙ তো এখানে মিথ্যা কিছু লেখেনি। তার চেক-ইন টাইম, চেক-আউট টাইম, ক্রম নম্বর, স্থায়ী ঠিকানা, পাসপোর্ট নম্বর সবই তো জেহুইন?

বাসু সংক্ষেপে বলেন, সাবধানের মার নেই। বাই গু ওয়ে, মনীশবাবু, যু সিয়াঙ কলকাতায় এসে থোকা গুণ্ডার সঙ্গে যোগাযোগ করছিল এটা তুমি কোন সূত্রে জানলে? এ ব্যাপারটাও বুঝে নেওয়া দরকার—কারণ যু সিয়াঙ নিজেই বলেছে যে, সে এই প্রথম কলকাতায় আসছে। সে-ক্ষেত্রে তার পক্ষে অমন একটি কুখ্যাত গুণ্ডার সন্ধান পাওয়া বিশ্বয়কর নয়?

মনীশ বললে, আপনার শেষ প্রশ্নটার জবাব জানি না, কিন্তু প্রথম প্রশ্নটার জবাব দিতে পারি। পার্ক হোটেল কর্তৃপক্ষ খুব সাবধানী। হোটেল থেকে কোনও বোর্ডার বাইরে কোন ফোন করলে তা অপারেটরের মাধ্যমে যায়। কোন ঘরেই অটোমেটিক ফোন নেই। এঁদের অপারেটরের কাছে নাখার চাইতে হয়। অপারেটার যোগাযোগ করে দেয়। বোর্ডারকে টেলিফোনের জন্ত আলাদা চার্জ দিতে হয়। তাই অপারেটার খাতায় লিখে রাখে কোন বোর্ডার কটার সময় কত নম্বরে ফোন করছে। সেই সূত্র থেকেই—

মনীশ সাদা বাড়লায় কথা বলছিল এতক্ষণ। এবারে ঘুরে মিস্ এডনা পার্কারকে ইংরাজিতে বললে, আপনাদের সেই টেলিফোনের খাতাটা দেখি ?

খাতাটা থাকে পাশের টেলিফোন অপারেটরের কাছে। মিস্ পার্কার খাতাখানা নিয়ে এল। মনীশ তার পাতা উন্টে দেখালো শনিবার রাতে আটত্রিশ নম্বর ঘর থেকে যু সিয়াঙ একটি টেলিফোন করেছিল সে নম্বরটি চিহ্নিত। অর্থাৎ যে নম্বরে থোকা গুণ্ডার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। বাসু-সাহেব বললেন, এটাও একটা জবর এভিডেন্স। এ খাতাখানাও সেক্ কাস্টডিয়ে সুরিয়ে রাখা ভাল।

খাতাখানা উনি খুঁটিয়ে দেখলেন। আর যে-সব নম্বরে ফোন করা হয়েছে সেই নম্বরগুলিও উনি ডায়েরিতে টুকে নিলেন। কয়েকটি স্থানে কালি দিয়ে গোলচিহ্ন দিলেন। ম্যানেজার-সাহেবকে আবার সই দিতে হল।

রাত প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ গুঁরা বেরিয়ে গেলেন ভবানীপুর থানার দিকে।

ভবানীপুর থানায় তীর্থের কাকের মত বসে আছে থোকাবাবু।

ছিপছিপে গড়ন। হুটপুট মোটেই নয়। কে বলবে লোকটা গুণ্ডা! সাজ পোষাকে রীতিমত ভদ্রসন্তান। সূচ্যগ্র একটি নূর আছে, মাথায় বড় বড় চুল পিছনে ফেরানো। মুখে বসন্তের দাগ। নেহাৎ গোবেচারি ধরণ।

বাসু-সাহেবকে নিয়ে মনীশ ঘরে ঢুকতেই লোকটা তড়াক করে টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বিনীত নমস্কার করে বললে, আবার কি কহুর হল শ্রাব আমার ? এরা আমাকে ঘরে যেতে দিচ্ছে না !

বাসু-সাহেব আসন গ্রহণ করে বললেন, অপরাধ এবার তুমি করনি থোকাবাবু, কিন্তু অপরাধ কেউ না কেউ এখনও তো করছে। তাদেরই একজনকে ধরবার জন্ত তোমার সাহায্য চাইছি। যা জিজ্ঞেস করব সত্য জবাব

দেবে। মিথ্যা বললে তুমিই ফাঁসবে কিন্তু !

—বলুন স্মার ? মিছে কথা আমি কখনও বলি না—মা-ওলাইচণ্ডীর কদম্ !—খোকা গুপ্তা এখনও গকড় পক্ষী।

—‘যু সিয়াঙ’ নামে একজন বমী ভদ্রলোককে চেন ?

—না স্মার ! অমন নাম বাপের জন্মে শুনিনি !

—এত তারিখ, শনিবার রাত্রি নটার সময় তুমি পাক হোটেল গিয়েছিলে ?

খোকা দু-চোখ বুজে অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললে, আজ্ঞে না। সেই শনিবার আমি রাণাঘাটে গেস্লাম স্মার। থানার বড়বাবুর কাছে ছুটি নিয়ে গেস্লাম। শনিবার হাজিরা দিইনি। পেতায় না হয়, বড়বাবুকে শুধোন।

বাসু-সাহেব ধমক দিয়ে ওঠেন, তা থেকে কী প্রমাণ হয় ? তুমি শনিবারে থানায় হাজিরা দাওনি মানে কি তুমি কলকাতায় ছিলে না ?

—ছুটিতে ছিলাম স্মার। রাণাঘাটে ! মা-ওলাইচণ্ডীর দিবা !

—শনিবার রাতে কেউ তোমাকে রাণাঘাটে দেখেছে প্রমাণ করতে পারবে ?

—পারব স্মার ! আমার শালার ছাপরায় ছিলাম। সে শালা সাক্ষী দেবে।

—শালার নাম কি ধর্মপুতুর ?

—আজ্ঞে না, স্মার। যুধিষ্ঠির !

বাসু-সাহেব হেসে ফেলেন। তারপর বলেন, ঠিক আছে। ঠাণ্ডা ধর্মপুত্র তাঁহা যুধিষ্ঠির। তার সাক্ষ্যকে কে অস্বীকার করবে ? এবার বলত খোকাবাবু, হার পরের সোমবার রাতে তুমি কোথায় ছিলে ?

—রাত কটায় স্মার ?

—এই ধর রাত বারোটা নাগাদ ?

—নিষাস্ সত্যি কথা বলব স্মার ? অপরাধ নেবেন না তো ?

—না, বল না। মা ওলাইচণ্ডীর নামে নাহয় একটা সত্যি কথাই বললে !

—কথাটা পাঁচকান হলে আমার ঝগড়া হবে কিন্তু !

—খুব গোপন ব্যাপার নাকি ? তা হোক, বলেই ফেল।

—সৌরভীর ঘরে ছিলাম, স্মার।

—সৌরভী ! কোথায় তার ঘর ?

—হারকাটা গুলি ! দেখবেন স্মার, কথাটা আমার বউয়ের কানে না ওঠে ! রাগী ভীষণ খাওয়ার ! কিছুতেই শালী বিশ্বাস করে না—আমি ও পাড়ায় যাই-ই না !



পরদিন কোর্টে যাবার পথে বাস-সাহেবের গাড়ি এসে থামল বালিগঞ্জ সাকুলার বোডের বাড়িটার সামনে। বেলা পৌনে নটা। আদালতে যাবার জন্য সবাই প্রস্তুত হচ্ছে। বাস গট গট করে উঠে গেলেন দ্বিতলে। জগদানন্দের ঘরে ঢুকে দেখলেন বৃদ্ধ ঠিক কালকের মতই স্থির হয়ে বসে আছেন ইজি চেয়ারে। যেন সারা রাত তিনি ওখানে ওভাবেই বসে আছেন। বাস জানেন, সেটা সত্য নয়—তবু এটাও জানেন ঐভাবে বসে থাকাটাই এখন তাঁর স্বাভাবিক ভঙ্গি। কাছে এগিয়ে এসে বললেন, সেন-মশাই, দোষটা আমার নয়, আপনার! আপনি ভাইটাল ক্লুটা আমার কাছ থেকে গোপন রেখেছিলেন বলেই এতদিন কষ্ট পেলেন!

শ্রী কৃষ্ণন করে জগদানন্দ বলেন, ভাইটাল ক্লু বলতে? ঐ দানপত্র করার খবরটা নীলুকে জানানো?

—একজ্যাস্টিলি! আপনার ক্লু পেয়ে আমি বাকি তদন্তটা করেছি। সমস্ত রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি আজ আপনাকে বেকসুর খালাশ করিয়ে আনব। শুধু তাই নয়, যে আপনার ভাইপোকে হত্যা করেছে আজ তাকে গ্রেপ্তার করা হবে। আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি! আদালতে পুলিশ প্রস্তুত থাকবে।

জগদানন্দের ঠোঁট ছুটি নড়ে উঠল। কিছু বলতে পারলেন না তিনি।

—আপনি তৈরী হয়ে নিন! ভয় কি? আজই তো এ যজ্ঞপার শেষ!

ও ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি টোকা দিলেন নীলিমার ঘরের দরজায়। সে সাজ-পোষাক পালটাচ্ছিল। দরজা খুলে দিয়ে বললে, এ সময়ে আপনি? হঠাৎ?

বাস বিনা-সকোচে ঘরে ঢুকে ড্রেসিং টেবিলের টুলটা টেনে নিয়ে বসলেন। বললেন, নীলিমা, ব'স ঐ খাটে। তোমাকে একটা কথা বলার আছে।

মেয়েটি বসল। তার শুধু এক চোখে কাজল। সে সঙ্কোচ করল না তাই বলে।

—তোমাকে ছুটো কথা বলব। একটা আনন্দের সংবাদ, একটা দুঃখের। কোন্টা আগে শুনতে চাও?

—আনন্দের সংবাদটা।

—আজ আদালতে তোমার দাছ বেকসুর খালাস হ'য়ে যাবেন। প্রকৃত অপরাধী কে তা জানা গেছে।

নীলিমা উঠে দাঁড়িয়ে বলে—বলেন কি! কে সে?

মাথা নাড়লেন বাস, নট নাউ! এবার দুঃসংবাদটা জানাই? আজ

তোমার একটা বিরাট লোকসানের দিন।

নীলিমা বললে, বুঝেছি! কিন্তু তাতে আমার দুঃখ নেই। এ বাড়ির অধিকার যদি না পাই, দাছুর সম্পত্তির কণামাত্র না পাই, তাহলেও আমি দুঃখ করব না। দাছু যে মাথা সোজা করে আজ বাড়ি ফিরে আসবেন এ আনন্দই আমাকে সব দুঃখের হাত থেকে রক্ষা করবে!

বাণ্ড ওর খোঁপাটা নেড়ে দিয়ে বললেন, ভগবান তোমাকে সেই মনোবলই দিন!

এগারো

ঠিক কঁটায় কঁটায় দশটার সময় আদালত বসল।

অসমাপ্ত সাক্ষ্য দিতে উঠে দাঁড়াল জয়দীপ। কোর্ট-পেশ্কার মনে করিয়ে দিল—গতকাল হলপ নেওয়া আছে বলে আজ তাকে হলপ নিতে হচ্ছে না। কিন্তু সে আজ যা বলবে তা হলপ নিয়ে বলা জবানবন্দীই। সাক্ষী বলল, সে জানে!

বাস্তব প্রশ্ন করেন, কাল আপনি আপনার জবানবন্দীতে বলেছিলেন যে, সোমবার সকালে আপনি পার্ক হোটেলে থেকে চেক আউট করে বেরিয়ে যান। ঠিক কটায় চেক-আউট করেন?

জয়দীপ বললে, ঠিক সময়টা আমার মনে নেই। সোমবার সকালের দিকে। সাতটা থেকে নটা।

—থ্যাঙ্ক! আচ্ছা জয়দীপবাবু এবার বলুন, আপনি কি বিবাহিত?

জয়দীপের মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে। মাথা নিচু করে বলে, হ্যাঁ।

—আপনার স্ত্রীর নাম কী?

—মাইতি আপত্তি করেননি। সাক্ষী নিজেই বলে ওঠে, সে প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক!

—সেটা আদালত বুঝবেন, আপনার স্ত্রীর নাম কী?

জয়দীপ বিচারককে সরাসরি প্রশ্ন করে, আমি কি ও প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য?

—অফ কোর্স! যু আর!

জয়দীপ মাথা নিচু করে বললে, নীলিমা সেন!

আদালতে একটা মুহূর্ত গুঞ্জন উঠল। সকলের দৃষ্টি গেল আসামীর দিকে।

—‘নীলিমা সেন’ অর্থে আসামীর নাতনি?

—হ্যাঁ, তাই।

—কবে ও কিভাবে আপনাদের বিবাহ হয়েছে ?

দাঁতে দাঁত চেপে জয়দীপ বললে, ঘটনার আগের শনিবার।

—ঘটনার আগে এবং ঐ শনিবারেরও আগে আপনার হবু স্ত্রী কি আপনাকে জানিয়েছিলেন যে, ইতিপূর্বেই জগদানন্দ একটি দানপত্র যোগে আপনার হবু স্ত্রীকে বসন্তবাড়িটি দিয়ে দিয়েছেন ? ও বাড়ির মালিক আপনার হবু স্ত্রী। হ্যাঁ, না না ?

শাক্তী একটু ভেবে নিয়ে বলল, হ্যাঁ।

—অর্থাৎ ঘটনার দিন আপনি জানতেন যে, উইল মোতাবেক মহেন্দ্রবাবু কোনদিনই ঐ বাড়ির দখল পাবে না। ইয়েস ?

—ইয়েস !

—আপনি একথাও জানতেন যে, উইল মোতাবেক মহেন্দ্রবাবু ছাড়া অন্যান্য বেনিফিশিয়ারি তাদের ভাগ পাবে, অর্থাৎ যোগানন্দ পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবেন ?

—না জানার কি আছে ?

—আপনি আরও জানতেন যে, উইলটা যদি খোয়া যায় তাহলে আপনার স্ত্রী স্বাভাবিক ওয়ারিশ হিসাবে ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবেন ?

মাইতি আপত্তি জানান—এ সব প্রশ্ন নাকি অপ্রাসঙ্গিক। বিচারক সেটা মেনে নিতে রাজী হলেন না। ফলে শাক্তীকে স্বীকার করতে হল, সে সেটা জানত !

—এবার বলুন জয়দীপবাবু, সোমবার আপনি খখন বিকাল পাঁচটায় ঐ বালিগঞ্জ সাকুলার রোডের বাড়ি ছেড়ে চলে যান তখনও আপনি জানতেন না যে, কৌশিকবাবু সে রাত্রে ওখানে থাকবেন—যেহেতু জগদানন্দবাবু আপনার প্রস্থানের পরে কৌশিকবাবুকে ঐ প্রস্তাব দেন ? ইয়েস ?

—হ্যাঁ, তাই।

—তার মানে দাঁড়াচ্ছে—সোমবার বিকালে ঐ বাড়ি ছেড়ে চলে আসার সময় আপনার জানা ছিল না যে, কৌশিকের রাত্রিবাসের প্রয়োজনে মহেন্দ্রবাবু এবং যোগানন্দ ঘর বদলাবে ?

শাক্তী চটে উঠে বলে, আপনি কী বলতে চান ? আমি খুন করেছি ?

বাস্তব শাস্তভাবে বলেন, আমি বলতে চাই না মিস্টার রায়, আমি শুনেছি চাই। আমার প্রশ্নের জবাব স্তম্ভে চাই। বলুন, বলুন ?

—না, আমি জানতাম না, সে রাত্রে কে কোথায় শুচ্ছেন !

—উহু হুঁ ! ওটা তো আমার প্রশ্নের জবাব নয় ! আপনি জানতেন

না' নয়, আপনি 'জানতেন' যে, যে-খাটে যোগানন্দ নিহত হয়েছেন ঐ খাটে মহেন্দ্রবাবুর শয়ন করার কথা ! সোজা হিসাবটা স্বীকার করছেন না কেন !

—বেশ তাই না হয় হল । তাই জানতাম আমি ।

—এবং জানতেন যে, মহেন্দ্রবাবুর বালিশের নিচে রাখা আছে ঐ উইলটা, যেটা খোয়া গেলে আপনার হবু-স্ত্রী, আই বেগ য়োর পার্ডন, ...ততক্ষণে তিনি আপনার স্ত্রী—ওটা সোমবারের ঘটনা, ই্যা, আপনার স্ত্রী পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবেন । স্বামী হিসাবে যাতে আপনারও অধিকার বর্তাবে ।

মাইতি উঠে দাঁড়াল, অবজেকশান য়োর অনার । এ সব কী অবাস্তব প্রশ্ন ! বিচারক হচ্ছে কার ? আসামীর না সাক্ষীর ?

বিচারক দৃঢ়স্বরে বলেন, অবজেকশান ওভারকুলড্ । অনসার জাট !

—না আমি জানতাম না—উইলটা কোথায় রাখা আছে । আমার তা জানার কথা নয় ।

—জয়দীপবাবু এবার স্বীকার করুন, সেদিন রাত প্রায় বারোটায় সময় আপনি ঐ বালিগঞ্জ সাকুলার রোডের বাড়িতে ফিরে আসেন এবং ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে—

চাঁকর করে ওঠে সাক্ষী, ডুপ্লিকেট চাবি আমি পাব কোথায় ?

—পাবেন আপনার স্ত্রীর শয়নকক্ষের ড্রয়ারে । যে-ঘরে একমাত্র আপনারই প্রবেশ-অধিকার ছিল—বাট প্রীজ ডোন্ট ইণ্টারাপ্ট—স্বীকার করুন, রাত বারোটায় ঐ বাড়িতে ফিরে আসেন । ইয়েস অর নো ?

—নো ! অ্যান এম্ফাটিক নো । রাত বারোটায় আমি ওখান থেকে অনেক অনেক দূরে । পনের মাইল ! দমদমের ভি. আই. পি. হোটেলের বাইশ নম্বর ঘরে । রাত বারোটো চম্বিশ মিনিটে যেখানে 'মিস্টার য়ু-সিয়াড-টেলিফোন' ধরেছিলেন তাঁর ঠিক পাশের ঘরে !

—গাটস্ য়োর অ্যালোবাই ! আপনার বজ্রবীধুনি বক্ষাকবচ ! ঘটনার মুহূর্তে আপনি ছিলেন দমদমে । তাই নয় ?

সাক্ষী জবাব দেয় না । জলন্ত দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে প্রশ্নকর্তার দিকে ।

বাসু-সাহেব বিচারকের দিকে ফিরে বললেন, মিঃ লর্ড ! ঘটনার পারস্পর্য রাখতে বর্তমান সাক্ষীকে সাময়িকভাবে অপসারণ করে আমি অপর একটি সাক্ষীর সাক্ষ্য নিতে চাই ।

মাইতির তাতে আপত্তি নেই । বিচারক বললেন, নো অবজেকশান ।

নবীন সাক্ষীর নাম ঘোষণা করল নকীব । সাক্ষ্য দিতে এলেন, এডন। পার্কার । অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ! পার্ক হোটেলের রিসেশ্যন কাউন্টারে কাজ

করেন। বাসু-সাহেব তাঁর নাম ধাম পরিচয় প্রতিষ্ঠা করে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি গত মাসের পার্ক হোটেলের রেজিস্টারটা সঙ্গে করে এনেছেন ?

—এনেছি।

—ওটা দেখে আপনি আদালতকে জানাবেন কি যে, গত অমুক তারিখ, রবিবার ঠিক ক'টার সময় জয়দীপ রায় স্বনামে আপনাদের হোটেলের চম্বিশ নম্বর ঘরটা খুক করেন ?

সাক্ষী রেজিস্টার দেখে বললেন, সন্ধ্যা সাতটায়।

—কবে ক'টার সময় তিনি ঐ ঘরটি ছেড়ে দেন ?

—মঙ্গলবার সকাল সাতটায়।

—জাস্ট এ মিনিট! ঠিক করে দেখে বলুন, সোমবার সকাল সাতটা নয় তো ?

—না! 'মঙ্গলবার' সকাল সাতটায়।

—ঐ তারিখ এবং সময়টা কি লালকালি দিয়ে গোলা দেওয়া আছে ? এবং তার পাশে কি একটি সই দেওয়া আছে ? থাকলে কার সই !

—গোলা দেওয়া আছে, সই দেওয়াও আছে। সইটা আমাদের ম্যানেজারের।

—কেন তিনি ওটা সই দিয়েছেন তা আপনি জানেন কি ?

—জানি। ম্যানেজার সাহেব আমাকে জানিয়েছেন যে, আপনি তাঁকে ঐ রকম অছুরোধ করেছিলেন। হোটেল-রেজিস্টার যাতে টাম্পার না হয় তাই তিনি সাবধান হয়েছিলেন। আমাকে তিনি ঐ রেজিস্টারটা সেফ-কাস্টডিতে রেখে একটি নতুন রেজিস্টার খুলতে বলেন। তিনি আরও বলেন, এ বিষয়ে আমাকে সতর্ক করা হবে—ঐ তারিখ এবং সময় কোন একটি খুনের মামলার গুরুত্বপূর্ণ এভিডেন্স !

—এবার আপনি ঐ গুরুত্বপূর্ণ এভিডেন্সটি আদালতে দাখিল করুন।

এডনা পার্কার সেটা জমা দেবার পর বাসু তাকে পুনরায় প্রশ্ন করেন বোর্ডারদের টেলিফোন কলের বিল তৈরী করবার জন্ত যে রেজিস্টার রাখা হয় আপনি কি সেটাও এনেছেন ?

—এনেছি।

—ওটা দেখে বলুন তো সোমবার, না ইংরাজি মতে মঙ্গলবার রাত বারোটা চম্বিশ মিনিটে ঐ চম্বিশ নম্বর ঘর থেকে দমদম ভি. আই. পি. হোটেলের বি একটা টেলিফোন করা হয়েছিল ?

সাক্ষী কী জবাব দিলেন তা শোনা গেল না। ঠিক তার পূর্ব মুহূর্তে কোর্টের প্রবেশ-পথে কী একটা হাঙ্গামা বেধে গেল। ঐ দিকে একটা 'হৈ টে ছুটোছুটি' শুরু হয়ে গেল। বিচারক বারবার হাতুড়ির শব্দ করলেন, তবু গওগো

খামল না। একজন কোটপেয়াদা ছুটে এসে বিচারকের কানে কানে কি একটা কথা নিবেদন করল। তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে ওঠেন জাঙ্গিস ভাহুড়ী ; বললেন, কোট এ্যাডজর্নড কর হাফ আন আওয়ার !

এতক্ষণে ব্যাপারটা জানা গেল। আদালত থেকে কে একজন সাক্ষী ছুটে পালিয়ে বাবার চেঁচা করছিল। পুলিশ প্রস্তুতই ছিল। আদালতের এক্সিক্যুট্রভুস এলাকা পার হতেই লোকটাকে পুলিশ-ইন্সপেক্টর মনীশ বর্মণ জাপটে ধরে। কিছুটা ধস্তাধস্তি। পরে লোকটা গ্রেপার হয়।

বারো

—শেষ পর্যন্ত জয়দীপ ? এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি—বললে কৌশিক !

জামল বললে, আমিও না। জয়দীপ দাছর ছোরা দিয়ে মেসোকে খুন করবে এ খেন ভাবাই যায় না।

বাসু-সাহেব বলেন, তোমাদের কোথায় ভুল হচ্ছিল জান ? খুন করার পূর্বমুহুর্তে জয়দীপ জানত—সে মহেন্দ্রকেই খুন করছে, যোগানন্দকে নয়। ওরা যে ঘর বদলেছে সে কথা সবাই জানত—জানত না তিনজন—যু সিয়াঙ, আমি আর জয়দীপ। দ্বিতীয় কথা, জয়দীপের খুন করার আসল উদ্দেশ্য শুধু মহেন্দ্রকে হত্যা করা নয়, মহেন্দ্রের বালিশের নিচে যে উইলটা আছে সেটা হস্তগত করা এবং ঐ সঙ্গে জগদানন্দকে ফাঁসীতে ঝোলানো। একটা কথা নিশ্চয় স্বীকার করবে—যোগানন্দের বদলে মহেন্দ্র খুন হলে—ঐ ছোরায় খুন হলে—জগদানন্দ জামিন পেতেন না। বর্তমান মামলায় জগদানন্দের খুন করার কোন মোটিভ বুঁজে পাওয়া যায়নি। জোড়াতালি দিয়ে পুলিশ যে কেসটা সাজিয়েছে সেটা ধোপে ঢিকল না, টেকার কথাও নয়—কিন্তু যোগানন্দের বদলে মহেন্দ্র খুন হলে জগদানন্দকে বাঁচানো প্রায় অসম্ভব হত।

কৌশিক প্রশ্ন করে, তাহলে জয়দীপ পার্ক হোটেল থেকে এসে খুন করার পর রাত বারোটা চল্লিশে দমদমে ফোন করল কেন ?

—ধাপে ধাপে ভেবে দেখ। প্রথমত জয়দীপের প্রথম পরিকল্পনাটা কী ছিল ? মহেন্দ্র নিহত হবে জগদানন্দের ছোরায়। মহেন্দ্রের বিছানার তলা থেকে উইলটা চুরি যাবে এবং জগদানন্দ ফাঁসিতে ঝুলবেন। উইল না থাকায় সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে তার জী—অর্থাৎ সে নিজে। কিন্তু খুন করেই সে নিজের ভুলটা বুঝতে পারল। হয়তো টর্চের আলোয় সে দেখেছিল খুন হয়ে গেল যোগানন্দ। তখন আর কিছু করার নেই। মহেন্দ্র কোন ঘরে শুয়েছে

তা সে জানে না। ফলে দ্বিতীয় খুন করবার মত সাহস তার তখন নেই। সে পালিয়ে গেল পার্ক হোটেলে। পার্ক হোটেলের ঘরটা সে ছাড়েনি, যদিও দমদমের হোটেলেও স্বনামে একটা ঘর নিয়েছিল।

খুব সম্ভব সে একটি অ্যাটাচি কেস নিয়ে এসেছিল, তার ভিতর রক্তাক্ত গায়ের চাদরটা সে লুকিয়ে নিয়ে যায়। সর্বান্ধ চাদরমুড়ি থাকায় তার গায়ে বা জামা-কাপড়ে রক্ত লাগেনি। পার্ক হোটেলে পৌঁছে তার মনে হল, জগদানন্দের পক্ষে ষোণানন্দকে হত্যা করার কোনও হেতু খুঁজে পাওয়া যাবে না। তখনও ষোণানন্দের পক্ষে ব্ল্যাকমেলিং করার আশাটে পরিকল্পনাটা পুলিশ করেনি। ও স্থির করল, ওকে দুটো জিনিস তখনই করতে হবে। প্রথমত নিজের জ্ঞাত একটা মোক্ষম আলোবাই তৈরী করা। দ্বিতীয়ত সন্দেহটা মহেন্দ্র-বিশ্বস্তর পার্টির বাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। তারই ফলশ্রুতি ঐ টেলিফোন। পার্ক হোটেল থেকে সে দমদমে কোন করে যুঁ সিয়াঙের জবাবগুলো লিখে রাখে! আমাদের বলে, সে দমদমে হোটেলে পাশের ঘর থেকে ঐ জবাবগুলো শুনে শুনে লিখেছে।

কৌশিক বললে, তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু আপনি ওকে কেমন করে সন্দেহ করলেন?

—ঐ টেলিফোন কলটা থেকেই। কে ওটা করতে পারে?

—কেন, বিশ্বস্তরবাবু? মহেন্দ্র? যদি ওঁরাই এটা করে থাকেন।

—তুল বলছে কৌশিক। তা কি সম্ভব? প্রথম কথা, ওরাই যদি খুন করে থাকে তবে সেটা ওরা মধ্যরাত্রে কেন জানাচ্ছে বাবে যুঁ সিয়াঙকে? কাজের কথা তো কিছু ছিল না—একমাত্র সকালবেলা একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছাড়া? তার জ্ঞাত ঐ মাঝরাতে ওরা ঐ ভাষায় টেলিফোনে কথা বলবে? ঐ ‘পথের কাঁটা’ দূর করার কথা? দ্বিতীয়ত রাত বারোটার খুন করে, তার চল্লিশ মিনিট পরে কোথা থেকে ওরা কোন করল? বাড়ির কোন নিশ্চয়ই ব্যবহার করবে না। ফোনটা আছে বৈঠকখানায়—তার সামনেই শ্রামল শুয়ে আছে। বলতে পার, ওদের কাছে সদর দরজার ডুপ্লিকেট চাবি আছে। তাতেই বা কি? অত রাত্রে পাবলিক টেলিফোন বৃথ পাবে কোথায়? কোনও পেট্রোল স্টেশন বা গুম্বুথের দোকান থেকে অমন ভাষায় কোন কি ওরা করতে পারে?

—ঠিক কথা। এভাবে আমরা ভাবিনি।

—ফলে কোন করার উদ্দেশ্য আর কিছু। আমার মতঃই মনে হল জয়দীপ ঐ ভাবে প্রমাণ রাখতে চেয়েছে যে, সে রাত বারোটা চল্লিশে দমদমের হোটেলে ছিল। জয়দীপ বুঝিটা করেছিল ভালই—কিন্তু সে একটিমাত্র তুল করে ঘর পড়ে গেল।

—কী ভুল ?

—আমাকে সে চিনতে পারেনি ! সে স্বপ্নেও ভাবেনি যে, পার্ক হোটেলে গিয়ে আমি রেজিস্টার দেখে আসব ।

—নীলিমা বলে, কিন্তু আপনি আমাদের বিয়ের কথাটা কেমন করে জানলেন ? আমি তো বলিনি ।

—না, তুমি বল নি । বলেছিল জয়দীপই । সেটাও তার একটা চালে ফুল হয়েছিল ।

বাসু-সাহেব চলে আসবার আগে নীলিমা তাঁকে জনান্তিকে পাকড়াও করল । বলে, একটা কথা ব্যারিস্টার-সাহেব । আপনি বলেছিলেন --আদালতে আমি প্রচণ্ড একটা লোকসানের মধ্যে পড়ব । ওটা আপনারও ভুল হয়েছিল । প্রেমে আমি এমন কিছু অন্ধ হয়ে যাই নি যে, খুনী জেনেও জয়দীপকে আমি ক্ষমা করব ।

বাসু বললেন, খাংকস্ নীলিমা । বাই ষ্ট ওয়ে, তুমি 'শেখের কবিতা' পড়েছ ?

—হঠাৎ এ প্রশ্ন ?

—শেখের কবিতার শেষ কবিতার মোকদা কথাটা কী বলত ?

—‘পরশুরামে’র মতে—‘উৎকর্ষ আমার লাগি কেহ যদি প্রতিক্রিয়া থাকে, সেই ধন্য করিবে আমাকে !’

—ঠিক কথা ! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—অতঃপর তোমাদের জীবন ‘শ্যামলে জামল’ এবং ‘নীলিমায় নীল’ হয়ে উঠুক !



# মাছের কাঁটা পথের কাঁটা

নারায়ণ সান্যাল

